কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৪৬

রকিব হাসান

সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৪৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

চৌত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-1455-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০২

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-46
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

আমি রবিন বলছি	৫–৪৭
উল্কি রহস্য	৪৮–১১০
নেকড়ের গুহা	১১১–১৭৬

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪১/-

তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩০/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

আমি রবিন বলছি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হলো, বাসে করেই চট্টগ্রাম যাব আমরা। নাইটকোচ। ফিরব ট্রেনে করে। মুসা শুনেছে, ঢাকা থেকে নাইটকোচে করে যাওয়ার মজাই নাকি আলাদা। এবং সেই মজাটা পাওয়ার জন্যেই গোঁ ধরে বসে ছিল সে।

রাত সাড়ে দশটার বাসের টিকেট কিনে আনা হলো ফকিরাপুলে একটা বাস-লাইনের অফিস থেকে। সন্ধ্যার পর থেকেই অপেক্ষা করে রইলাম তিনজনে। সাতটার দিকে বলা নেই কওয়া নেই, ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ ঝরেই থেমে যাবে। কিন্তু থামে না তো থামেই না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মুসা। বারবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। একসময় বলল, 'অলক্ষীটা বোধহয় আমিই! নইলে সারাদিন রোদ থেকে এখন বৃষ্টি শুরু হবে কেন?'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'বৃষ্টিতে কি আর হবে? স্কুটারে করে বাস স্টেশনে চলে যাব। একবার বাসে উঠে পড়তে পারলেই হয়।'

তা-ও তো বটে। চুপ হয়ে গেল মুসা।

তবে ন'টার দিকে ধরে এল বৃষ্টি। পিটির পিটির করে হালকা দু-চারটা ফোঁটা পড়ছে।

দশটায় বাসা থেকে বেরোলাম আমরা। ও, কোন বাসা, তা তো বলিনি। কিশোরের মামার বাসা; সেই যে, মনে নেই, রিটায়ার্ড ডিআইজি আরিফ চৌধুরী সাহেবের কথা? তিনদিন আগে আমেরিকা থেকে ঢাকায় এসে আগের বারের মত ওখানেই উঠেছি আমরা।

কিশোরের মামা-মামী বাড়ি নেই। মামার শরীর খারাপ। সে জন্যে বিশ্বস্ত কাজের লোকের ওপর বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে, তাঁকে নিয়ে সকাল বেলায়ই গাড়িতে করে কক্সবাজার চলে গেছেন মামী। আমরাও যেতে পারতাম, কিন্তু নাইটকোচে যাওয়ার লোভে থেকে গিয়েছি। কেবল চিতাকে তুলে দিয়েছি তাঁদের সঙ্গে। বাসে কুকুর নিতে দেয় না।

যাই হোক, বাসা থেকে বেরিয়েই স্কুটার নিলাম। চলে এলাম বাস স্টেশনে। বেশ কয়েকটা বাস-লাইনের অফিস আছে ওখানে। আমরা যেটাতে যাব তার নাম স্পীডবার্ড। মুসার যে কি হলো সেদিন, কে জানে, শুরু থেকেই খালি খুঁত ধরতে আরম্ভ করল। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'এত বিদেশী নামের ছড়াছড়ি কেন এখানে? ইংরেজি, আরবি···বাংলা নামের কি এতই অভাব?'

'যারা রাখে তাদের কাছে বাংলাটা গালভরা মনে হয় না হয়তো,' জবাব দিল কিশোর।

'কেন হয় না?'

'সেটা আমি কি জানি? যার যার রুচির ব্যাপার। কেউ যদি ইচ্ছে করে নিজের ভাষাকে হেলা করে, কিছু বলার আছে?'

ব্যাগ-সুটকেস হাতে অফিসের দিকে এগোলাম আমরা। বিনীত ভঙ্গিতে এসে দরজা থেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ওয়েইটিং রুমে বসাল টাই পরা, স্মার্ট, তরুণ অ্যাটেনডেন্ট। জানাল, আমাদের বাস এখনও আসেনি। একটু বসতে হবে।

খানিক পর আরেকজন অ্যাটেনডেন্ট এসে খবর দিল, এগারোটার যাত্রীদের বাস এসে গেছে। তাদের গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করল।

ফোঁস করে উঠল মুসা, 'এগারোটা! সাড়ে দশটা আগে না এগারোটা আগে?'

একটা বিদেশী ছেলের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হয়ে তাকাল অ্যাটেনডেন্ট। 'অবশ্যই সাড়ে দশটা,' হাসিমুখে বিনীত স্বরে জবাব দিল সে। 'কোন কারণে ওটা আসতে দেরি হচ্ছে হয়তো।'

'তাহলে আর টাইম ঠিক করে দিয়ে লাভটা কি হলো?' তর্ক শুরু করল মুসা। 'বলে দিলেই হত, টিকিট নিয়ে যান, যখন গাড়ি আসে তখন উঠবেন।'

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরও কয়েকজন যাত্রী খেপে উঠল। একজন তো একেবারে মারমুখো। বেগতিক দেখে খবর নেয়ার ছুতোয় ছুটে পালাল অ্যাটেনডেন্ট। বাস আসার আগে আর ফিরল না। এল এগারোটার পর। হাসিমুখে জানাল, 'সাড়ে দশটার বাস এসে গেছে। আপনারা যান।' সেই সঙ্গে একটা *সুখবর* দিল সে, সাড়ে দশটার বাসটাকে আগে ছাড় দেয়ার জন্যে এগারোটার বাসটাকে আটকে রাখা হয়েছে। পরে যাওয়ার কথা ওটার, পরেই যাবে। অন্যায় তো আর করা যায় না।

চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকাল মুসা। মুখ ফসকে আবার কি বলে বসে মুখপোড়া নিগ্রোটা, সেই ভয়ে তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আবার পালাল অ্যাটেনডেন্ট।

যাক, বাসে তো ওঠা হলো। কিশোর আর মুসা বসল পাশাপাশি। আমি বসলাম ওদের পাশেই অন্য সারির সীটে। ড্রাইভার উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সবগুলো আলো জেলে দিল সেই বাসের অ্যাটেনডেন্ট। তারও টাই পরা। আচার-আচরণ আর কথাবার্তায় শিক্ষিত ছেলে মনে হলো। তবু ভঙ্গিটা কেমন আড়ষ্ট। বাসের সামনের অংশে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দিকে মুখ করে বলতে শুরু করল:

'সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ...'

তার সঙ্কুচিত, কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে খুক করে হেসে ফেলল মুসা। ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর।

মুসার হাসিটা দেখেও দেখল না অ্যাটেনডেন্ট। বলতে থাকল:

'আমরা এখন চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করব। প্রায় দুইশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বাসের চট্টগ্রামে পৌঁছতে পাঁচ ঘণ্টার মত লাগবে। মাঝখানে চোদ্দগ্রামে যাত্রাবিরতি করা হবে একবার। সেখানে নেমে প্রয়োজনীয় নাস্তাপাতি আর বাথরুম সারতে পারবেন আপনারা।

'আপনাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধার দিকে সাধ্যমত নজর রাখার চেষ্টা করব আমরা। কারও কোন কিছুর প্রয়োজন হলে, সঙ্গে সঙ্গে ডাক দেবেন আমাকে।

পানির ব্যবস্থা আছে আমাদের কাছে। দূরযাত্রায় চলেছেন, সময় কাটানোর সুবিধার জন্যে কিছু পত্রপত্রিকাও রেখেছি আমরা। ইচ্ছে হলে নিতে পারেন। আর কয়েক ধরনের প্রয়োজনীয় জরুরী ওষুধের ব্যবস্থাও আছে। কিছু আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা রেখেছি।

'আমরা আপনাদের শুভযাত্রা কামনা করছি।

'ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ।'

উজ্জ্বল আলোগুলো নিভিয়ে দিল সে।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'শুরুর বাচ্চা ধন্যবাদটা কাকে দিল? একবারেই বলে দিতে পারত সবাইকে ধন্যবাদ। এমনিতেই একটা ভারি শব্দ, ও রকম দু-বার বলার দরকারটা কি? নাকি বাংলায় ধন্যবাদ দেবার কায়দাটা ও রকমই?'

'না, ও রকম নয়। এরা বেশি স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে সব গুবলেট করে বসে থাকে। হাস্যকর করে ফেলে,' রেগে গেল পরক্ষণেই, 'ভুল ধরাগুলো একটু বাদ দেবে দয়া করে!'

পানি চাইল একজন যাত্রী।

প্লাস্টিকের বোতলে ভরা পানি নিয়ে এগিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট। ব্যস, শুরু হয়ে গেল হাঁকডাক, 'আমাকে দিন···আমাকে দিন···এই যে এই পানি, এদিকে আসুন···অ্যাই মিয়া পানি···'

মুসাকে আর কি দোষ দেব, কাণ্ড দেখে আমিও হতবাক। এতটা পিপাসা নিয়ে এতক্ষণ চুপ করে ছিল কি করে লোকগুলো? নাকি বোতল দেখে মনে পড়ল? মনে হচ্ছে, পিপাসা পাক আর না পাক, পয়সা উসুল করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পানি সাপ্লাই দিতে দিতে হিমশিম খেয়ে যাওয়ার দশা বেচারা অ্যাটেনডেন্টের।

পানি খাওয়ার পর ম্যাগাজিন চাইল একজন। ব্যস্ত হয়ে গেল আরও অনেকে, হঠাৎ করেই যেন পড়ার নেশায় পেয়ে বসেছে; ডাকল, 'অ্যাই, আমাকে দিন ম্যাগাজিন···আমাকে···'

পত্রিকা নিয়ে সত্যি পড়ছে কিনা ওরা দেখার কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। দেখি, কেউ হাতে নিয়ে বসে আরেকজনের সঙ্গে গল্প করছে, কেউ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে পাতা ওল্টাচ্ছে, পড়ায় কারও মন আছে বলে মনে হলো না।

বাস ছাড়ল। কয়েক গজ যেতে না যেতেই মাথার ওপর খড়খড় করে ফুল ভলিউমে বেজে উঠল স্পীকার। চমকে গেলাম। প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল যেন মাথায়। মুসা তো কানেই আঙুল দিয়ে ফেলল। অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'এ সব কি?'

বিনীত গলায় বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে শুরু করল অ্যাটেনডেন্ট, 'আপনি কোন ধর্মাবলম্বী জানি না, এটা কোরাণ তেলাওয়াত···'

'ধর্ম নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। আমিও মুসলমান, কোরান তেলাওয়াতও জানি···আমি বলছি কান ফাটিয়ে ফেলতে চান নাকি? আস্তে বাজান।'

ভলিউম কমিয়ে দেয়া হলো।

কোরান তেলাওয়াতের পর শুরু হলো হিন্দি গান। ভলিউম বাড়িয়ে দিল আবার বাসের হেলপার। বাস ততক্ষণে শহর এলাকা পেরিয়ে এসেছে। ছুটছে তীব্র

গতিতে। বাইরে গভীর হচ্ছে রাত, নীরব, নির্জন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠছে। দু-পাশে সরে যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ। তার ওধারে পড়ে পড়ে যেন ঘুমাচ্ছে গাছপালায় ঘেরা গ্রামগুলো। সুন্দর পরিবেশ। ভাল লাগত, খুব ভাল, যদি খালি ওই গানের অত্যাচার থেকে বাঁচা যেত। বুঝলাম, এটাই হলো আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। এই যদি হয় আনন্দ, তাহলে ভয়াবহ যন্ত্রণা কোনটা, বিশেষ করে নাইটকোচে? এখন হলো মানুষের ঘুমানোর সময়, এখন কি এই চিৎকার চেঁচামেচি ভাল লাগে?

শেষে কিশোরও আর সহ্য করতে না পেরে অ্যাটেনডেন্টকে ডাকল। বুঝিয়ে বলল, 'ভাই, এটা বন্ধ করে দিলে হয় না? মজার চেয়ে তো কষ্টই বেশি দিচ্ছেন।'

বুঝল লোকটা। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যাওয়ার সময় আরেক সীট থেকে ডাকল আরেকজন, বলল, 'গান বন্ধ করবেন না।' ভঙ্গি দেখে মনে হলো কিশোর প্রতিবাদটা করাতেই তার গান শোনার আগ্রহটা প্রবল হয়ে উঠল। জোরাজুরি করার, নিজের ইচ্ছেটা খাটানোর এক অদ্ভুত প্রবণতা প্রায় সবার মাঝেই লক্ষ করছি। সবাই কেবল নিজের কথা ভাবছে, অন্যের অসুবিধের দিকে সামান্যতম নজর দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করছে না। অবাক লাগল। রাতের বেলা বাসে উঠে এই পচা গান শুনতে চায় ওরা, বাড়িতেও কি এই কাণ্ডই করে নাকি?

কিশোরের কাছে ফিরে গেল অ্যাটেনডেন্ট। হাত উল্টে নিরাশার ভঙ্গি করে বলল, 'আপনি বলছেন বন্ধ করতে, উনি বলছেন চালাতে, কোনটা করি বলুন?'

'ঠিক আছে, আস্তে বাজান। যাতে সহ্য করা যায়।'

বাস চলছে। অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে ভলিউম। বাংলা গানের ক্যাসেট বাজছে, গান আর অতটা বিরক্তিকর লাগছে না এখন। গান বন্ধ করতে যে নিষেধ করেছিল, সে অনেক আগেই নাকডাকানো শুরু করেছে। কিসের আর গান শোনা। অহেতুক একটা জোর খাটানো। ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছে না আর কেউ। পুরো বাসের ভেতরটা অন্ধকার। নরম সীটে আরাম করে মাথা এলিয়ে দিয়ে উপভোগ করছি বাংলাদেশের রাতের নেশাধরানো সৌন্দর্য। কিন্তু হঠাৎ দিল সবকিছু নষ্ট করে আমার সামনের সীটের ভদ্রলোক। পড়ার শখ চাগিয়ে উঠল তার। মাথার ওপরের রীডিং লাইটটা জ্বেলে দিয়ে অ্যাটেনডেন্টকে ডাকল। ম্যাগাজিন আনতে বলল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

চাহিদা পূরণ করল অ্যাটেনডেন্ট।

পত্রিকার পাতায় বড় জোর মিনিট দশেক চোখ বোলাল ভদ্রলোক, তারপরই শখ খতম, ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে পাশের সীটে বসা তার সঙ্গীর সঙ্গে বকবক শুরু করল। আলোটা নেভানোরও প্রয়োজন বোধ করল না। অনেকক্ষণ বিরক্ত করার পর মাথা এলিয়ে দিয়ে হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল দু-জনেই। আলোটা জ্বলাই রইল। সরাসরি চোখের পাতায় আলো পড়ছে, তাতেও তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না বিন্দুমাত্র। আশ্চর্য! কোন কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না ওদের।

কি আর করব। উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে আমিই নিভিয়ে দিলাম আলোটা।

ভাবতে লাগলাম, পানি, গানবাজনা, ম্যাগাজিন, সবই তো গেল। বাকি আছে ওষুধ। দেয়ার জন্যে কোন সময় কে ডেকে বসবে কে জানে। মানুষগুলোর ভাবটা এমন—সুযোগ যখন দেয়া হয়েছে, কাজে লাগুক আর না লাগুক, নিতেই হবে।

গাটের পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে ওঠা হয়েছে, যতটা সম্ভব উসুল করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধে বেশি হলেও পরোয়া নেই।

ফেরি পার হলো বাস। তারপর থেকে অবশ্য আর তেমন কোন অসুবিধে হলো না, কারণ যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মুসাও ঘুম। জেগে আছি আমি আর কিশোর। আর জাগছে ড্রাইভার ও তার অ্যাটেনডেন্ট।

চোদ্দগ্রামে এসে আবার সব আলো জেলে দিল অ্যাটেনডেন্ট। দুই মিনিট বক্তৃতা দিয়ে জানাল, কোথায় এসেছে, কতক্ষণ দাঁড়াবে, ইত্যাদি। হোটেলগুলোর ভীষণ ব্যস্ততা দেখলে মনেই হয় না এখন রাত দেড়টা বাজে। গরম গরম পরোটা আর ডিম ভাজতে দেখে মুসা আর থাকতে পারল না। বলল, 'কিশোর, চলো, খেয়ে আসি। খিদে পেয়েছে।'

নামলাম আমরা। ভেবেছিলাম, এতরাতে ভাল লাগবে না; কিন্তু দারুণ লাগল পরোটা আর ডিমভাজা। দুটো ডিম আর দুটো করে পরোটা খেয়ে, চা খেয়ে ফিরে এলাম বাসে।

বাস ছাড়ল, কিন্তু যতক্ষণ থামবে বলেছিল অ্যাটেনডেন্ট, তার প্রায় দ্বিগুণ দেরি করে।

কিছুটা এগোতেই সামনে দেখা গেল রাস্তা ভেজা। তারমানে একটু আগে এখানেও বৃষ্টি হয়েছে। তবে মেঘ কেটে গেছে। আকাশে হলদে চাঁদ। ধূসর, কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে রাস্তার দু-পাশের জমিগুলো। সেই সঙ্গে বাসের ইঞ্জিন আর বাতাসের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ, সত্যি, আশ্চর্য ভাল লাগছে! মাত্র দু-তিন ঘণ্টা আগের সেই যে বিরক্তিকর কাণ্ডকারখানা, সব ভুলে বসে আছি। মনে হচ্ছে অত্যাচারগুলো হয়েছিল বহু যুগ আগে, অন্য কোনখানে!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমারও চোখ লেগে এসেছিল কখন। হঠাৎ আবার ভেঙে গেল। একপাশে পাহাড় আর রেললাইন চোখে পড়ল। অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, পাহাড়তলীতে পৌঁছেছে বাস। চট্টগ্রাম যেতে আর এক ঘণ্টাও লাগবে না।

শহরে ঢুকল বাস। কয়েক মিনিট পরই গন্তব্যে পৌঁছবে। আরেক দফা বক্তৃতা দিল অ্যাটেনডেন্ট।

স্টপেজে থামল বাস। তখনও বেশ রাত। কক্সবাজারের বাস ছাড়বে সকালে। দেরি আছে। অ্যাটেনডেন্ট কিশোরকে বলল, এখন নামাটা নিরাপদ না, ছিনতাইকারীর ভয় আছে। ভাবলাম, বসেই যখন থাকতে হবে, খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।

সকালবেলা বাস থেকে নেমে স্কুটারে করে গেলাম আরেক বাস স্টপেজে, যেখানে কক্সবাজারের বাস ছাড়ে। পাশেই রেস্টুরেন্ট। নাস্তা সেরে বাসে উঠে পড়লাম।

বাস ছাড়ল। শহর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল যেতেই শুরু হলো খারাপ রাস্তা, খুবই খারাপ। মেরামত করা হচ্ছে।

প্রায় অর্ধেকটা পথই খারাপ চলার পর ভাল রাস্তা পাওয়া গেল। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে কখনও উঁচু হয়ে গেছে পথ, কখনও নিচু হয়ে। একটু পর পরই বাঁক।

সে-সব জায়গাতেও গতি কমাতে চাইছে না ড্রাইভার, খারাপ রাস্তার পর ভাল রাস্তায় এসে যেন খেপে উঠেছে। প্রায় একটানা হর্ন বাজাতে বাজাতে সরু রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বাস। উল্টো দিক থেকে আসা বাস কিংবা ট্রাক যখন ভয়াবহ গতিতে পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন তো আঁতকে উঠি, এই বুঝি লাগল বাড়ি। কিন্তু লাগে না। আশ্চর্য দক্ষতায় কাটিয়ে নিয়ে যায় ওস্তাদ ড্রাইভার।

বারোটা নাগাদ কক্সবাজার পৌঁছুলাম আমরা।

দুই

পর্যটনের একটা মোটেলে রুম নিয়ে রেখেছেন চৌধুরী আংকেল। বেশিদিন ওখানে থাকলে কটেজই ভাড়া নিতেন, সাগরের পাড়ে পর্যটনের কটেজও আছে। কিন্তু ওখানে আমরা মাত্র একরাত থাকব, পরদিন সকালেই রওনা হয়ে যাব আলীকদমের উদ্দেশে। চট্টগ্রাম থেকে যে পথে এসেছি আমরা, সেই পথ ধরেই ফিরে যেতে হবে। চকোরিয়া থেকে আরেকটা রাস্তা চলে গেছে আলীকদমের দিকে। সেখান থেকে আরও প্রায় তিরিশ কিলোমিটার ভেতরে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে গেলে পড়বে একটা গ্রাম, অশোক তরু।

পুলিশের চাকরি করার সময় কি একটা জরুরী তদন্তের কাজে এই গভীর পাহাড়ী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল চৌধুরী আংকেলকে। পাহাড়ের কোলে গ্রামটা দেখে ভারি পছন্দ হয়ে যায় তাঁর। নামটাও সুন্দর। বহুকাল আগে অশোক তরু নামে এক জমিদার বাস করত এই গাঁয়ে, তার নামেই নাম রাখা হয় গ্রামটার। পাহাড়ের কোলে পরিত্যক্ত একটা কটেজ দেখে ভারি পছন্দ হয়ে যায় আংকেলের। জায়গাটা ছিল জমিদারের সম্পত্তি। তার বংশের কেউ আর তখন থাকে না সেখানে, কেউ চলে গেছে চিটাগাঙ, কেউ ঢাকায়। কটেজটার মালিককে খুঁজে খুঁজে বের করলেন আংকেল। নামমাত্র দামে কিনে নিলেন ওটা, মাঝে মাঝে গিয়ে ছুটি কাটানোর জন্যে। চাকরি জীবনে তো আর ব্যস্ততার জন্যে যেতে পারেননি, এখন বছরে অন্তত দু-একবার যান, কয়েক দিন থেকে শরীর-মন ঝরঝরে করে ঢাকায় ফেরেন। একজন কেয়ারটেকার রেখে দিয়েছেন কটেজটা দেখাশোনার জন্যে।

লম্বা জার্নি করে এসেছি। নাদিরাআন্টি, অর্থাৎ কিশোরের মামী তো আমাদের দেখেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। একরাতের জার্নিতেই নাকি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছি আমরা। তাঁর তাগাদায় তাড়াতাড়ি গোসল সেরে এসে খেয়ে নিলাম। তারপর বিছানা।

বিকেল চারটেয় উঠে চা খেয়ে চিতাকে নিয়ে সৈকতে বেড়াতে গেলাম আমরা তিন বন্ধু। বঙ্গোপসাগরের সৈকত, পৃথিবীর বৃহত্তম সৈকত, দেখার ইচ্ছেটা অনেক দিনের। কিন্তু দেখে নিরাশই হলাম। এত নোংরা কেন? ঘোলা পানি, ভেজা সৈকত, কালির মত কালো কালো কি যেন ছড়িয়ে আছে। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, পাহাড়ী ঢলে নাকি ময়লা পানি এনে ফেলে ও রকম নোংরা করে দিয়েছে সৈকতটাকে।

এটা ট্যুরিস্ট সীজন নয়, তাই লোকের ভিড় তেমন নেই। প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুর

ওপর তুলে নেমে গেলাম পানির কাছাকাছি, হাঁটতে লাগলাম। চিতার মহাআনন্দ। ভেজা বালিতে এখানে ওখানে পড়ে আছে তারামাছ। জোয়ারের সময় পানিতে ভেসে এসেছিল, আর যেতে পারেনি, আটকে গেছে। ওগুলোকে গিয়ে খোঁচাতে লাগল সে। একধরনের ছোট ছোট কাঁকড়া গর্ত থেকে বেরিয়ে দৌড় দেয়। তাড়া করলে গিয়ে সুড়ুৎ করে লুকিয়ে পড়ে অন্য গর্তে। সেগুলোকে তাড়া করে ফিরতে লাগল কুকুরটা। গর্তে ঢুকে গেলে নখ দিয়ে খুঁড়ে কাঁকড়া বের করার চেষ্টা করে দেখল, একটাকেও পেল না। অবাক লাগল আমারও। গিয়ে আমিও বের করার চেষ্টা চালালাম। পারলাম না। দেখাই পেলাম না। মনে হয় যেন বালিতে মিশে হারিয়ে যায়। আসলে দ্রুত গর্ত করে করে নেমে যায় আরও নিচে। সে জন্যেই পাওয়া যায় না।

ঝাঁকিজাল নিয়ে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছে জেলেরা। ছোট ছোট জাল পেতে গলদা চিঙড়ির বাচ্চা ধরছে অনেক জেলে। শুধু এর ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে অনেক পরিবার।

সূর্য ডুবল। লাল, হলুদ আর বেগুনী রঙে কিছুক্ষণ মাখামাখি হয়ে রইল পশ্চিমের আকাশটা। তারপর হঠাৎ করে মুছে গেল সব রঙ।

মৃদু নিম্নচাপ চলছে বোধহয়, প্রচুর বাতাস থাকলেও গরম লাগছে। ফুলে উঠতে লাগল সাগর। ঢেউয়ের গর্জন বাড়ছে! সাগরটাকে প্রথম দেখে যেমন একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল এই দেখতে এত দূর থেকে ছুটে এসেছি!—সেটা আর এখন নেই। বরং ভাল লাগছে। অনেকেই বলে বঙ্গোপসাগরের সৈকতে বেশিক্ষণ থাকলে নাকি নেশা হয়ে যায়, আরও থাকতে ইচ্ছে করে, আসতে মন চায় না আর ওখান থেকে; মনে হতে লাগল, কথাটা বোধহয় সত্যি।

চাঁদ নেই, কৃষ্ণপক্ষ, উঠতে দেরি হবে। ঘন অন্ধকার নামল সৈকতে। আকাশে বড় বড় তারা। আমরা যেখানে রয়েছি তার প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে সাগরের পাড়ে একসারি দোকান। চায়ের দোকান আছে দু-তিনটে, বাকিগুলোতে নানা রকম বাহারি জিনিস, তারমধ্যে ঝিনুকের তৈরি ঘর সাজানোর জিনিসই বেশি।

সাড়ে আটটা নাগাদ মোটেলে ফিরলাম আমরা।

সকাল সকালই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে উঠেই রওনা হতে হবে আবার। একঘুমে পার করে দিলাম রাতটা।

পরদিন সকালে অশোক তরু রওনা হলাম আমরা। এবার আর বাসে করে নয়, আংকেলের গাড়িতে। একটা টয়োটা মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছেন তিনি। আমাদের সকলের জায়গা হয়ে আরও বেশি হয়ে গেল। বাসে আসার মজাটা টের পেয়েছে মুসা, ন্যাড়া আর বেলতলায় যেতে রাজি হলো না।

রাস্তা মোটামুটি ভাল এদিকের। আলীকদম পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। তবে এরপর কাঁচা রাস্তায় পড়েই শুরু হলো যন্ত্রণা। শীতকালে এলে বোধহয় এতটা অসুবিধে হত না। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, ফলে রাস্তার অবস্থা কাহিল। সেই পথ ধরেই ধুলো উড়িয়ে আর ঝাঁকুনি খেতে খেতে অশোক তরুতে এসে পৌঁছলাম আমরা।

সত্যি, পছন্দ করার মতই জায়গা বটে! আংকেল শুধু শুধু মজে যাননি

জায়গাটা দেখে। পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে যে এসে ঢুকেছিলেন জমিদার অশোক তরু, তারও কারণ নিশ্চয় এই সৌন্দর্য। পাহাড়ের পর পাহাড় উঠে গেছে এদিক ওদিক, ঢালের কোথাও ঘনবন, কোথাও হালকা ঝোপঝাড়। সরু একটা পাহাড়ী নদী দেখা গেল উপত্যকা ধরে বয়ে যেতে। অপূর্ব!

কটেজটা ভেবেছিলাম পাকাবাড়ি হবে, তা নয়। বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি চমৎকার একটা বাড়ি। ওপরে খড়ের ছাউনি। নতুন রঙ করা হয়েছে। বাড়ির সামনে সুন্দর ছোট্ট একটা বাগান। রাশি রাশি ফুল ফুটে আছে। পাহাড়ের কোলে বাড়িটাকে ছবির মত লাগছে দেখতে।

আমরা আসছি, এ খবর আগেই পেয়ে গেছে কেয়ারটেকার। তৈরি হয়ে আছে। গাড়ির সাড়া পেয়ে ছুটে এল। মাঝবয়েসী, হালকাপাতলা একজন মানুষ। চামড়ার রঙ প্রায় কালোই বলা চলে। পানখাওয়া লাল বড় বড় দাঁত। খোঁচা খোঁচা কিছু গোঁফ আর থুঁতনিতে কয়েক গোছা দাড়ি। নাম ছমির আলি। সব কিছু মিলিয়ে কুৎসিতের পর্যায়েই ফেলা চলে, কিন্তু সুন্দর ব্যবহারের কারণে আর কুৎসিত মনে হয় না। মুহূর্তে আপন করে নেয় মানুষকে। আমাদের তিনজনের সঙ্গে এমন করে কথা বলতে লাগল, যেন তার কতকালের চেনা। কুত্তাটাকেও অবহেলা করল না।

আমাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সব ব্যবস্থা করে রেখেছে ছমির আলি। আমরা হাতমুখ ধুয়ে এসেই শুনলাম, টেবিলে খাবার দেয়া হয়ে গেছে। খাবারের চেহারা আর গন্ধই বলে দিল চমৎকার রান্না। খেতে বসে গেলাম। সকালে পেট ভরে নাস্তা খেয়েছি, তবু মনে হচ্ছে কতকাল যেন খাইনি। মোচড় দিচ্ছে পেটের ভেতর। এখানকার আবহাওয়াই বোধহয় ও রকম, শরীর-মন সব তাজা করে দেয়, খিদে বাড়ায়।

খাওয়ার পর বিশ্রাম নিতে বেডরুমে ঢুকে গেলেন আংকেল আর আন্টি। আমরা ঠিক করলাম, ঘুরতে বেরোব। অচেনা জায়গা। সাহায্য চাইলাম ছমির আলির কাছে।

ছমির আলির চাচাত ভাই আমির আলি, বয়েসে অনেক ছোট, রিকশা চালায়। তাকে ডেকে আনল সে। আমাদের ভার তুলে দিল ভাইয়ের ওপর। আমির আলিই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেখাবে এলাকাটা।

এক রিকশায় তিনজন চাপলাম আমরা। কাঁচা রাস্তা ধরে চলল আমির আলি। পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। যেখানে বেশি উঁচু, টেনে তুলতে কষ্ট হয়, সে-সব জায়গায় রিকশা থেকে নেমে গেলাম আমরা, পেছন থেকে ঠেলা দিয়ে তাকে সাহায্য করলাম। অন্য আরোহীরাও দেখলাম তাই করে। এ রকম অঞ্চলে রিকশা চালানো বেশ কঠিন। তবু চালায় ওরা, পেটের দায়ে, আর কোন কাজ পায় না বলে।

রিকশা তেমন জোরে চলে না। খুব সহজেই সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারছে চিতা। গর্ত দেখলেই ছোঁক ছোঁক করছে, গিয়ে শুঁকছে নাক নামিয়ে।

মুসা হেসে বলল, 'ব্যাটা খরগোশ খুঁজছে।'

'এখানে মনে হয় খরগোশ নেই,' কিশোর বলল। 'এতক্ষণে একটাকেও দেখিনি।'

আমির আলিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, একেবারেই নেই তা নয়, তবে খুব

কম। ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায় একআধটাকে। গর্তগুলো বেশির ভাগই শেয়ালের। বেজি আর গোসাপ আছে প্রচুর। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপরের বন থেকে নেমে আসে হাতি আর বুনোশুয়োর, ফসলের খুব ক্ষতি করে।

গ্রামটা ছোট, কিন্তু খুব সুন্দর, সাজানো গোছানো। মানুষ কম। ট্যুরিস্ট আসে বোঝা যায়, কারণ আমাদের দিকে খুব একটা নজর দিচ্ছে না কেউ, যার যার কাজে ব্যস্ত। নিজেরা নিজেরা যখন কথা বলে, আঞ্চলিক ভাষায়, বাংলা হলেও আর বাংলা মনে হয় না ভাষাটাকে, কিছুই বুঝতে পারি না, এমন কি কিশোরও পারে না। তবে বাইরের কারও সঙ্গে বলার সময় বেশ পরিষ্কার বাংলা বলে, পুরোপুরি শুদ্ধ না হলেও বোঝা যায়। অধিবাসীরা বেশির ভাগই কৃষক, পাহাড়ের ঢালে কিংবা উপত্যকায় ধান চাষ করে ওরা। ধানের সময় যখন থাকে না, তখন শাকসব্জীর চাষ করে। এখন তরমুজের সময়। প্রায় সবগুলো খেতেই অসংখ্য তরমুজ হয়ে আছে। এ দিকের মানুষের বোধহয় পড়ালেখার প্রতি ঝোঁক আছে, কারণ চট্টগ্রাম ছাড়ানোর পর থেকেই অনেক প্রাইমারি আর হাই স্কুল দেখেছি। এই যে এত গভীরের পাহাড়ী গ্রাম, এখানেও একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। আমির আলির সঙ্গে কথা বলেও বোঝা গেল, একেবারে নিরক্ষর নয়, কিছু পড়াশোনা সে-ও জানে।

সামনে অনেক বড় একটা পাহাড় দেখা গেল। চূড়াটা যেন মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেছে। কেমন নীল নীল ধোঁয়া জমে আছে ওখানটায় মনে হয়।

পাহাড়টার নাম কি জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নীলাম্বরী পর্বত,' আমির আলি জানাল। 'ছোট করে নিয়ে আমরা বলি নীলা পর্বত।'

বিড়বিড় করল কিশোর, 'আরও সুন্দর হয়, যদি নীল পাহাড় বলা যায়!' আচমকা প্রশ্ন করল, 'এ রকম কেন নামটা? কোন কারণ আছে নাকি? জানেন?'

'পূর্ণিমার রাতে নীলাম্বরী শাড়ি পরা এক সুন্দরী মহিলাকে নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ওই পাহাড়ে। সে জন্যেই ও রকম নাম।'

'খাইছে! ভূত! আমি বাপু ওই পাহাড়ের ধারেকাছে যাচ্ছি না,' দু-হাত নেড়ে বলল মুসা।

আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। মুসার কথাকে পাত্তাই দিল না। আমির আলিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি দেখেছেন কখনও?'

'না। তবে অনেকেই নাকি দেখেছে। পাহাড়টা নিয়ে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কিংবদন্তী আছে।'

'কি কিংবদন্তী?'

'আমি তো অত কিছু জানি না, এই দিন কয়েক হলো চিটাগাং থেকে এসেছি। ওখানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। সারাদিন গাধার খাটনি খাটাত, বেতনও দিত না ঠিকমত। ছমির ভাইই নিয়ে এসেছে। বলে, কিসের বেগার খাটিস, চাষবাস কর এখানে, বাকি সময় রিকশা চালা। খারাপ কাটবে না।' নীলা পর্বতের কিংবদন্তীতে কিশোরের আগ্রহ দেখে আমির আলি বলল, 'তবে একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি, গাঁয়ের সবচেয়ে বয়েসী লোক, নিরু চাকমা। অনেক গল্প জানে বুড়ো। যাবেন?'

'এক্ষুণি!'

তিন

ঘরের বাইরে কাঠের বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে ঝিমাচ্ছিল নিরোদ বিহারী চাকমা। বয়েসের ভারে কুঁজো। চোয়াল বসা। হাত আর গলার রগ সব দড়ির মত ফোলা। রিকশার ঘণ্টা শুনে চোখ মেলে তাকাল। তার বাড়ির সামনে রিকশাটা থামতে দেখে সোজা হয়ে বসল। আমির আলি ডেকে বলল, 'দাদু, ওরা আমেরিকা থেকে এসেছে। তোমার গল্প শুনতে চায়।'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা। খুশি হয়ে ওদেরকে বসতে বলল নিরু চাকমা। জানা গেল, বুড়োর ছেলে, নাতিপুতিরা সব শহরে থাকে। কিন্তু সে একলা পড়ে আছে এখানে, আর কোথাও যেতে মন চায় না বলে। একটা কাজের লোক রেখে দিয়েছে, রান্না থেকে শুরু করে তার সেবাযত্ন, ওই লোকটাই সব করে। টাকার অসুবিধে হয় না, শহর থেকে ছেলেরা পাঠায়।

স্বাগত জানানো আর আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ হলে বুড়ো বলল, 'তাহলে আমার গল্প শুনতে এসেছ তোমরা। কি গল্প শুনতে চাও, বলো?'

'নীল পাহাড়,' কিশোর বলল।

ভুরু কুঁচকে তাকাল বুড়ো। 'কি পাহাড়?...ও, নীলা পর্বতের ওই নাম রেখেছ তুমি...ভাল, বুদ্ধি আছে। সুন্দর নাম।'

রিকশা রেখে আমির আলিও এসে বারান্দায় বসল, বুড়োর গল্প শোনার লোভে।

'অনেক অনেক কাল আগে...' এমনভাবে শুরু করল বুড়ো, হতাশ হয়ে গেলাম। ভাবলাম, শুরু হবে সেই পরী কিংবা ভূতের গল্প, বহুবার শোনা রূপকথা।

কিন্তু ভুল করেছি। আজব এক গল্প শোনাতে লাগল বুড়ো। নীল পাহাড়ের ভেতরটা নাকি ফোঁপরা!

'খাইছে! বলেন কি?' চোখ বড় বড় করে মুসা বলল, 'তাহলে তো ওপরের মাটির চাপে ধসে পড়ার কথা। না, দাদু, এ হতে পারে না।' সে-ও আমির আলির মত করেই বুড়োকে দাদু ডাকতে আরম্ভ করেছে। বুঝে গেছে, এ দেশে আমেরিকার মত মিস্টার চাকমা, কিংবা শুধু নাম ধরে চাকমা ডাকাটা বেমানান, লোকে খারাপ ভাবে নেয়।

হাসল বুড়ো। কুতকুতে চোখেও ছড়িয়ে পড়েছে হাসি। 'কেন পারে না? ভূগোল পড়োনি? পাহাড়ের নিচে গুহা থাকে না?'

'তা তো থাকে। কিন্তু ওগুলোর ওপরে মাটি অনেক পুরু বলে ধসে পড়তে পারে না।'

'নীলা পর্বতেরও হয়তো পুরু, সে জন্যে পড়ে না।'

তা বটে, চুপ হয়ে গেল মুসা।

বুড়ো বলল, 'বিশাল ওই গুহায় নাকি খুব সুন্দর একটা শহর ছিল একসময়। খুব উন্নত, সুন্দর শহর। বহুদূরের কোন এক দেশ থেকে নাকি—কোন দেশ জানা

যায় না—একদল যাযাবর মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছিল ওখানে। তারপর হঠাৎ করেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একদিন। হয়তো কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, ঝড়-তুফান কিংবা ভূমিকম্প…'

বাধা দিল কিশোর, 'এ দিকে ভূমিকম্প হয়?'

'হয়। তবে খুব কম। জোরও বেশি না। তোমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার মত না।'

'তাহলে ভূমিকম্পে বিলীন হবে কি করে?'

'তখন হয়তো হয়েছিল জোরেই। কিংবা প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির সময় ভূমিকম্প হয়েছিল। যে ভাবেই হোক, পাহাড় ধসে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল পাতালশহরে ঢোকার মুখ। শহরটাও নিশ্চয় মাটি চাপা পড়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

পাতালেও শহর থাকে! এ তো ফ্যান্টাসি! দারুণ রোমাঞ্চকর! তন্ময় হয়ে গিলতে লাগলাম যেন বুড়োর আধুনিক রূপকথা!

'লোকে বিশ্বাস করে এ সব কথা?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, করে না। বলে, সব গাঁজা!'

কি জানি কি বুঝল চিতা, আমির আলির পাশে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'খোক!'

'বা-বা, তুমিও ব্যাটা গল্প শুনছ মনে হয়, হেসে বলল মুসা।

সবাই হেসে ফেলল। বুড়ো বলল, 'রসবোধ আছে।'

আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'আচ্ছা, নীলাম্বরী শাড়ি পরা একটা মেয়েকে নাকি পূর্ণিমার রাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়?'

'ওটা গুজব। ভূত বিশ্বাস করি না আমি। পাহাড়ের ওপরে মেঘ কি ভাবে জমে থাকে দেখেছ? দিনের বেলাতেও যদি কেউ ওখানে ভূত দেখেছে বলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। ও কিছু না, চোখের ভুল।'

একমুহূর্ত চুপ করে কি ভাবল কিশোর। তার ভাবভঙ্গিতে মনে হতে লাগল, রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে। আচমকা প্রশ্ন করে বসল, 'রহস্যময় একটা জাতি বাস করত পাহাড়ের নিচে, সত্যি এ কথা বিশ্বাস করেন আপনি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বুড়ো। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বললে হয়তো পাগল ভাবতে পারো আমাকে। কিন্তু তবু বলব, আমি বিশ্বাস করি।'

'আর কেউ করে এ গাঁয়ে?'

'শুধু করে না, নিজেকে ওই যাযাবরদেরই বংশধর বলে প্রচার করে একজন। পাহাড়টা ধসে পড়ার সময় দু-একজন নাকি ছিল গাঁয়ের বাইরে। বেঁচে যায়। বিয়ে করে পাহাড়ী উপজাতির মেয়েদেরকে। তাদেরই বংশধর নাকি সে।'

'তার কথা বিশ্বাস হয় আপনার?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে বলল বুড়ো, 'তার চেহারা দেখলে তোমাদেরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে। এখানকার মানুষের সঙ্গে মেলে না।'

'কি নাম তার?' উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোর, তার কথা শুনেই বুঝতে পারছি।

পায়ের কাছ থেকে বলে উঠল আমির আলি, 'হারাণ মুচি। একটা পাগল।'

চুপ করে রইল নীরু চাকমা। কোন মন্তব্য করল না।

হারাণ মুচির সঙ্গে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। বুড়োকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল। রিকশায় উঠে আমির আলিকে বলল, মুচির

বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

গাঁয়ের বাইরে, পাহাড়ের কোলে গাছপালায় ঘেরা হারাণ মুচির বাড়ি। কুঁড়ের সামনে বসে জুতো সেলাই করছে সে। সত্যি, তার চেহারার সঙ্গে এখানকার মানুষের চেহারার অনেক অমিল। এমনকি গায়ের রঙেও। ছাই ছাই বাদামী চামড়ার রঙ, চৌকো মুখ, নাকটা থ্যাবড়া, গোল চোখ, নীলচে মণি, যা এ দেশে একেবারেই চোখে পড়ে না।

আমাদের দেখে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার কাজে মন দিল মুচি। বাইরের লোক দেখলে যেমন আগ্রহ জাগার কথা, তার কিছুই হলো না।

আমির আলি গিয়ে আমাদের পরিচয় দিল, কি জন্যে এসেছি, জানাল। বুড়ো হাসল না, মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না, শান্তকণ্ঠে বলল, 'আমি তো এখন ব্যস্ত, কথা বলতে পারছি না। দাঁড়াও, মনিকাকে ডেকে দিই, সে-ই সব বলতে পারবে তোমাদের। নীলা পর্বতের কথা সব জানে সে। ওকে সব বলেছি আমি।' ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল, 'মনি, মনি, দেখে যা। ওরা তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

ঘরের ভেতর থেকে নয়, পেছনের সজি বাগান থেকে বেরিয়ে এল ফ্রক পরা বারো-তেরো বছরের একটা মেয়ে। বুড়োর মতই গায়ের রঙ, কিন্তু বেশ মিষ্টি চেহারা। অনুমান করলাম, বুড়োর নাতনী হবে। তবে বুড়োর মত আমাদের দেখে চেহারাটাকে ভাবলেশহীন করে রাখতে পারল না। আমরা কোথা থেকে, কেন এসেছি, আমির আলির মুখে শুনে আরও অবাক হলো। বলল, 'বাইরে থেকে যারা আসে, সবাই কিন্তু আসে দেশটাকে দেখতে, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরতে। নীলা পর্বতের গল্প শুনতে আজ পর্যন্ত কেউ আসেনি আমাদের কাছে, দাদুকে তো পাগলই ভাবে। তোমরাই এলে প্রথম।' ওর কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, লেখাপড়া করে।

আমাদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার চমৎকার সজি বাগানের এককোণে ঘাসের ওপর বসাল। বেশ কয়েক ধরনের শাকসজি করেছে। মাঝে মাঝে লাগিয়ে দিয়েছে কলা আর পেঁপে। বড় বড় প্রচুর পেঁপে হয়ে আছে। গাছ থেকে ইয়াবড় একটা পাকা পেঁপে ছিঁড়ে এনে কেটে দিয়ে মেহমানদারী করল। খুব ভাল লাগল তাকে আমাদের।

খেতে খেতে আসল কথায় এল কিশোর। জিজ্ঞেস করল নীল পাহাড়ের কথা।

বড় বড় নীলচে চোখ মেলে তাকাল মনিকা। পাহাড়টার কথা শুনেই যেন কোন স্বপ্নের জগতে চলে গেছে। অনেকক্ষণ সেই জগতে ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল আমাদের কাছে। 'কি জানতে চাও, বলো?'

নীরু চাকমার কাছে যা যা জেনেছে, বলল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা নাকি তাদের বংশধর?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা। 'দাদু তো তাই বলে।'

'নিশ্চয় দূরের কোন দেশ থেকে আসা যাযাবর ছিল ওরা, তারা কোন জাতির লোক বলতে পারো?'

'হবে হয়তো জিপসিদের মত কেউ,' এই পাহাড়ী এলাকার ছোট্ট একটা মেয়ের মুখে জিপসিদের কথা শুনে অবাকই হলাম। পড়াশোনা মেয়েটা ভালই করে। 'না,

জাতিটার নাম কেউ জানে না। তবে আমি একটা নাম রেখেছি, নীল চোখ।'

'চমৎকার নাম, ভাল নাম!' প্রশংসা করল কিশোর। 'একেবারে মানিয়ে গেছে! কি কি জানো, তাদের সম্পর্কে বলো তো? তারা কেমন লোক ছিল, কি কাজ করে খেতো···শিকারী ছিল, নাকি চাষী, সব বলো।'

কিশোরের বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, সত্যিই যেন ছিল নীল চোখেরা। মনিকা, তার দাদু আর নীরু চাকমার মতই যেন বিশ্বাস করে বসেছে, পাহাড়ের ভেতরে ছিল ওই প্রাচীন যাযাবর জাতি, রহস্যময় কারণে যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

'দাদু তো বলে শিকারীই ছিল। অত আগে এই পাহাড়ে শিকার করা ছাড়া আর কি করে বাঁচবে? চাষবাস তো শুরু হয়েছে অনেক পরে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বনজঙ্গল তখন নিশ্চয় আরও অনেক বেশি ছিল। অত আগে অবশ্য পৃথিবীর সমস্ত বুনো মানুষের খাবার জোগাড়ের প্রধান উপায় ছিল শিকার।'

চিতার দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা। ওর খাওয়া দেখছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'কুত্তাটাকে দেখে একটা কথা মনে হলো।'

'কি কথা?' জানতে চাইল মুসা।

'নীল চোখেরাও কুত্তা পালত। শিকারের সময় কুত্তা অনেক কাজে লাগে। তবে তাদের কুত্তাগুলো নাকি ডাকতে পারত না। স্বরই বেরোত না গলা দিয়ে। বোবা ছিল সব।'

এতবার কুত্তা কুত্তা শুনে চিতা ভাবল, তার কথাই বলা হচ্ছে। বলল, 'খোক!'

মুসা বলল, 'দূর ব্যাটা, তোকে বোবা বলা হচ্ছে না। তুই তো একটা বাচাল, সব ব্যাপারেই কথা বলা চাই।' মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুত্তা আবার বোবা হয় কি করে? তাজ্জব ব্যাপার!'

'কি জানি,' হাত ওল্টাল মনিকা, 'তা তো জানি না। দাদু বলেছে, আমি শুনেছি। দাদুও বাপ-দাদার মুখে শুনেছে, ও রকম বোবা কুত্তা তো আর চোখে দেখেনি।'

'কিন্তু চিৎকারই যদি করতে না পারল, ওগুলোকে শিকারে নিয়ে গিয়ে কি ফায়দা হত নীল চোখদের?'

'হত নিশ্চয় কিছু, নাহলে কি আর নিত।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। বহুদূর থেকে বাস্তবে ফিরে এল যেন তার দৃষ্টি, 'হুঁ, তাহলে এমন কুকুরও ছিল তাদের, যেগুলো ডাকতে পারত না। আর কি জানো?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের কোনো সর্দার-টর্দার ছিল না? যদ্দূর শুনেছি, উপজাতিদের সর্দার থাকে, কিংবা রাজা···'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা। 'ছিল। তবে রানী।'

'বাহ্,' মুচকি হাসল মুসা, 'মিশর আর ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ও সব জায়গা থেকে আসেনি তো ওরা? চোখও নীল···'

'তা জানি না। রানীর নামও ছিল অদ্ভুত। থেইয়া।'

'আফ্রিকার কোন অঞ্চলের না তো?' প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দিল কিশোর,

'হতেও পারে, বুঝলে। যাযাবর, গায়ের রঙ···সব মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। আর নীল চোখের ব্যাপারটা শঙ্কর প্রজাতির কারণে হতে পারে। আরবদের ধরে আনা ক্রীতদাসীর সন্তান। মানুষ বেচাকেনার মত ঘৃণ্য কাজগুলো তো আরবরাই শুরু করে প্রথমে, ভারতের উপকূলেও হরদম আসত ওদের পালতোলা জাহাজ, ডাউ। তাতে করে নানারকম পণ্য আর ক্রীতদাস নিয়ে আসত ওরা। ওরাই হয়তো নীল চোখদের নিয়ে এসেছিল এ দেশে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম মনিকাকে, 'শহরটার নাম কি ছিল?'

'তেমুলকা।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'থেইয়া, তেমুলকা, নাম শুনেই ভিড়মি খাওয়ার জোগাড়। মানে কি এর? কোন ভাষা?'

মাথা নাড়ল মনিকা, 'তা তো বলতে পারব না।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'নীল চোখদের ব্যাপারে আর কি জানো?'

হাসল মনিকা, 'সবচেয়ে মজার কথাটাই পরে বলব বলে রেখে দিয়েছিলাম।' সবার মুখের দিকে তাকাল এক এক করে। আমির আলি পর্যন্ত গলা বাড়িয়ে আছে সামনে। মেয়েটা খুব চালাক। যখন বুঝল, সবারই আগ্রহ জাগাতে পেরেছে, তখন বলল, 'নীল চোখেরা লোহাকে সোনা বানাতে জানত।'

চার

সোনা বানাতে জানত! চমকে গেলাম আমরা তিনজনেই।

মুসা বলল, 'খাইছে! সোনা বানাতে পারত!'

'হ্যা,' মনিকা বলল, 'পারত। সোনা দিয়ে রানী থেলিয়ার একটা মূর্তিও নাকি বানিয়েছিল। তাকে দেবী মানত নীল চোখেরা, কারণ রানীর একটা সাংঘাতিক ক্ষমতা ছিল—যে কোনো কঠিন রোগও নাকি সারিয়ে দিতে পারত।'

আশ্চর্য! ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে গল্পটা। এমন করে বলছে মনিকা, যেন সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। ওর কথা বিশ্বাস না করে আর পারছি না। মনে হচ্ছে, এ রকম কিছু ঘটাটা অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'পূর্ণিমার রাতে নাকি নীল শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায় একটা ভূত, এ ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?'

'এই একটা কথা আমি বিশ্বাস করি না,' জোর দিয়ে বলল মনিকা। 'দাদুও করে না। ভূত বিশ্বাস করি না আমরা কেউ। ও সব লোকের বানানো কথা।'

'কেন?' মুসা বলল, 'রানী থেলিয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলছ। সে কোনভাবে ভূতের রূপ ধরে হাজির হতে পারে না?'

'না, পারে না। মানুষ মরে গেলে আবার অন্য রূপে হাজির হয়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

মেয়েটার ওপর ভক্তি বাড়ল আমার। এই অজপাড়াগাঁয়ে যে একটা কিশোরী এতটা কুসংস্কার বর্জিত হতে পারে, ভাবতে অবাক লাগল। মনে হলো, আসলে অসাধারণ একটা জাতির রক্ত বইছে তো তার শরীরে, সে জন্যেই এমন

মানসিকতার অধিকারী হতে পেরেছে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'আচ্ছা, মনিকা, তোমার পূর্বপুরষদের গুহাগুলো কখনও আবিষ্কার করতে যাওয়ার ভাবনা তোমার মাথায় ঢোকেনি?'

'ঢুকেছে। কিন্তু একা যেতে সাহস হয়নি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারি না আমি, কেমন যেন বোকা বোকা লাগে ওদের কথাবার্তা, চালচলন। কাকে নিয়ে যাব?'

'তোমার দাদু? কখনও যাওয়ার চেষ্টা করেনি?'

'নাহ্। বললে বলে, গিয়ে কি লাভ? ওদের তো আর ফেরত পাব না।'

'কিন্তু শিওর তো হতে পারব, 'বললাম, 'যে নীল চোখ নামে একটা জাতি ছিল?'

'দাদু এমনিতেই শিওর। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে আমরা নীল চোখদের বংশধর।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল। চিতা কি বুঝল কে জানে, সে-ও লাফিয়ে উঠে তার পিছে পিছে ঘুরতে লাগল। যেন একটা ভাঁড়। হাসি পেল আমাদের।

খানিক দূরে চুপ করে বসে আছে আমির আলি, আমাদের কথা শুনছে।

হঠাৎই আবার মনিকার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'আচ্ছা, আমরা যদি গুহাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি?'

'অসুবিধে কি?' জ্বলজ্বল করতে লাগল মনিকার চোখ। 'উপত্যকায় যাওয়ার একটা শর্টকাট পথ আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি। বেশি দূরে না।'

আর কি দেরি করি? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমরা। আমির আলিকে কিশোর বলল, 'তুমি চলে যাও। আমরা হেঁটেই যেতে পারব।'

আমাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আমির আলির, কিন্তু চাপাচাপি করল না। ঘাড় কাত করে সায় জানিয়ে চলে গেল।

দাদুর কাছে এসে মনিকা বলল, 'দাদু, আমি এদেরকে উপত্যকা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।'

একমনে কাজ করে চলেছে হারাণ মুচি, যেন ধ্যানমগ্ন এক ঋষি, দুনিয়ার কোনদিকে খেয়াল নেই। নাতনীর কথায় সামান্য একটু মাথা দোলাল কেবল। 'সাবধানে থাকিস,' কথাটা বলারও প্রয়োজন মনে করল না যেন।

গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়ারও পথ আছে। সেদিক দিয়ে গেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের পিছু নিতে পারে, ওদেরকে এড়ানোর জন্যে তাই একটা বুনো পথ ধরল মনিকা। বন থেকে বেরোতে পাওয়া গেল গরু-ছাগল চলাচলের পথ। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে পথের পাশে জন্মে থাকা কয়েকটা বুনো ফুল ছিঁড়ে নিল সে।

মহারাজা বনে গেছে যেন চিতা। যেদিকে খুশি ছুটে বেড়াতে পারছে, ফড়িঙ তাড়া করছে। একজায়গায় একটা বেজি দেখে তেড়ে গেল। কিন্তু ওটা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। একছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল গর্তে।

পাহাড়ের ঢালে কোথাও তৃণভূমি, গরু-ছাগল চরছে তাতে, কোথাও বা ফসলের জমি। চলতে চলতে নিজের কথা জানাল আমাদেরকে মনিকা। বাপ-মা মরা এতিম, এক দাদু ছাড়া দুনিয়ায় আপন বলতে আর কেউ নেই। ক্লাস ফাইভে পড়ে। সব ক্লাসেই ফার্স্ট হয়। অত্যন্ত মেধাবী। পড়াশোনায় ভাল বলে স্যারেরাও আদর করেন। প্রাইমারিতে পড়তে এখন আর টাকা লাগে না, তারপরেও স্কুলের স্বল্প ফান্ড থেকে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে তাকে। খুব গরীব ওরা। দাদু জুতো মেরামত করেন। গাঁয়ের মুচি, কজনেই বা আর জুতো পায়ে দেয়, কাজেই আয়ও সামান্য। বাড়ির পেছনে যে ফল আর সব্জি বাগান করেছে মনিকা, সে-সব বেচে সে-ও কিছুটা আয় করে। দু-জনের আয়ে কোনমতে চলে যায় সংসারটা। হাই স্কুলে পড়ার খুব ইচ্ছে মনিকার, তারপর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়···কিন্তু তার জন্যে শহরে যেতে হয়। অনেক খরচ। টাকা কোথায়? বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

বেশি উঁচু নয় পাহাড়টা। তবু সেটুকু উঁচুতে ওঠারও একটা কষ্ট অবশ্যই আছে, হাঁপাতে লাগলাম আমরা।

চূড়া থেকে চারপাশের দৃশ্য চোখে পড়ে। চমৎকার প্রকৃতি। বাংলাদেশে যে পাহাড়-বনানীর এত সুন্দর দৃশ্য আছে, কল্পনাই করতে পারিনি। ঢেউ খেলানো পাহাড় দিগন্তের কাছে গিয়ে মিশেছে, চূড়াগুলো ধোঁয়াটে। পড়ন্ত রোদে কোথাও আলো, কোথাও ছায়া, সবকিছু কেমন রহস্যময়। পাহাড়ের ঢালে বন। দূরে উপত্যকা ধরে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী।

স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা। তার এই স্বপ্ন ভঙ্গ করতে ইচ্ছে হলো না আমার, কিন্তু মুসা বড় বেরসিক, জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ, কিশোর?'

'উঁ,' মুখ ফেরাল কিশোর। 'না, ভাবছি, জায়গাটা এত সুন্দর বলেই এখানে বাস করতে এসেছিল নীল চোখেরা। ভাবছি, তাদের একজন হয়ে যেতে পারলে মন্দ হত না!'

হেসে উঠল মনিকা। 'তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলো।'

'আচ্ছা, তেমুলকার মানে কি, কিছুই জানো না তুমি?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না।'

'এখানে এমন কেউ আছে, যে বলতে পারে?'

একমুহূর্ত ভাবল মনিকা। 'একজন পারতে পারেন, আমাদের ইংরেজির স্যার। খুব বই পড়েন উনি।'

'কি নাম তাঁর? কোথায় থাকেন?'

'রফিক আহমেদ। গাঁয়েই থাকেন। রিকশাওলাকে বললেই নিয়ে যাবে তাঁর বাড়িতে।'

'গুড। কালই দেখা করতে যাবে তার সঙ্গে।' নিচের উপত্যকাটার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'তোমার কি ধারণা, এখানকার পাহাড়ের মধ্যেই বাস করত তোমার পূর্বপুরুষরা?'

'দাদু তো তাই বলে।'

'একদম শিওর?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আর দেরি করা যায় না। বাড়ি ফিরে চললাম আমরা।

রাতে খাবার টেবিলে রহস্যময় উপজাতিদের নিয়ে কথা উঠল, অবশ্যই কিশোর তুলল কথাটা। শুনে চৌধুরী সাহেব তেমন গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, 'বাংলাদেশের সবখানেই তো কিংবদন্তীর ছড়াছড়ি। পোড়ো বাড়ি থাকলে জিন-পরী, আর বড় দীঘি হলে পরী কিংবা শেকলওলা সিন্দুকের গল্প...'

তর্ক শুরু করল কিশোর, 'কিন্তু মামা, এটা সে রকম অবাস্তব গল্প নয়, একেবারে অন্য রকম। হারানো একটা উপজাতির কাহিনী। অবিশ্বাস করার কিংবা হেসে উড়িয়ে দেয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তা ছাড়া ওই বুড়ো আর তার নাতনীর চোখের মণি নীল হওয়ার কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি?'

দিতে পারলেন না চৌধুরী আংকেল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'তারমানে একটা রহস্য পেয়ে গেছিস তুই, সেটার সমাধানে নামতে চাস, এই তো? নাম গিয়ে, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু লাভ হবে না, এটা বলতে পারি। ও রকম কোন উপজাতির বাসস্থান থাকলে এতদিনে সেটা বের করতে পারল না কেন লোকে?'

'চেষ্টা করেনি তাই পারেনি।'

নীল চোখদের নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর শুতে গেলাম আমরা। সারাদিনে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি, শরীর ক্লান্ত, তাই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন নাস্তা সেরেই আমির আলির রিকশায় করে চলে এলাম আহমেদ স্যারের বাড়িতে। অমায়িক মানুষ তিনি। খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। নীল চোখের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ দেখে হাসলেন। বললেন, 'আমিও তেমন কিছু জানি না ওদের সম্পর্কে। তোমরা তো প্রায় সবই জেনে এসেছ; বোবা কুকুর, সোনা বানানোর কাহিনী, রানী থেইয়ার অসাধারণ ক্ষমতা...নতুন আর কিছু বলার নেই আমার। তবে তেমুলকার মানে বলতে পারি। শব্দটা এসেছে সম্ভবত বৃটেনের কোন প্রাচীন উপজাতির কাছ থেকে, পর্তুগীজ কিংবা ওলন্দাজরা এনেছে এখানে, ইংরেজরাও এনে থাকতে পারে। এর মানে হলো গর্জনশীল স্রোতধারা।'

'তেমুলকা, মানে, গর্জনশীল স্রোতধারা,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল আহমেদ সাহেবের দিকে, 'কিন্তু স্যার, উপত্যকায় তো কোন নদী দেখলাম না। ওদিকে যেটা আছে, সেটা বহুদূরে।'

'আমার কি মনে হয় জানো? অবশ্যই এটা আমার অনুমান, সত্যি যদি কোন উপজাতির বাস থেকে থাকে, তাহলে নদীটাও ছিল, আর সেটাও ছিল পাহাড়ের ভেতরে। পাতালনদী যাকে বলি আমরা। গুহাবাসী ওই মানুষেরা সে জন্যেই নিজেদের পাতালশহরের নাম রেখেছিল তেমুলকা। এ ছাড়া আর তো কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না।'

আহমেদ সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিশোরের নির্দেশে বাড়ি ফিরে চললাম আমরা। বলল, তেমুলকার মানে 'গর্জনশীল স্রোতধারা', একটা বড় সূত্র। প্রথমে গুহা খুঁজতে শুরু করব আমরা। গুহা পেলে তার ভেতরে ঢুকে খোঁজ লাগাব সেই

পাতালনদীর। ওটা পেলেই আর ঠেকায় কে আমাদের, নীল চোখদের বাসস্থান খুঁজে বের করবই।

কটেজে এসে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরি করে দিতে বলল মামীকে কিশোর। গুহায় ঢুকতে যাচ্ছি আমরা, এ কথা চেপে গিয়ে বলল পাহাড়ে পিকনিক করতে যাচ্ছি।

আবার বেরোলাম। যতদূর রিকশা যায় ততদূর আমাদের এগিয়ে দিল আমির আলি। তারপর ফিরে গেল। এরপর থেকে হেঁটে চললাম আমরা। ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম পাহাড়ে। আজ আর ফুল, প্রজাপতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি নজর নেই আমাদের। একটাই লক্ষ্য, কোথায় গুহা আছে খুঁজে বের করতে হবে, যেটা আমার কাছে প্রায় অসম্ভবই মনে হচ্ছে। চিতার অবশ্য কোনো পরিবর্তন নেই, ফড়িঙ দেখলেই তেড়ে যাচ্ছে।

ঘুরতে লাগলাম আমরা। রোদ তেমন কড়া নয়, তবু গরমটা খুব বেশি। ঘাম বেরিয়ে আর শুকাতে চায় না, চটচটে হয়ে লেগে থাকে চামড়ায়। খুব অস্বস্তিকর।

এ ভাবে ঘুরে ঘুরে গুহা খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব মনে হতে লাগল আমার কাছে। হাতে কোনো সূত্র নেই, কিছুই নেই, কি করে খুঁজে বের করব? এই বিশাল পাহাড়ের কোথায় আছে গুহামুখ, কি করে জানব?

এক জায়গায় একটা ঝোপের পাশে কথা শুনে এগিয়ে গেলাম। ঘুরে অন্যপাশে আসতেই দেখি দু-জন তরুণ বসে কথা বলছে। আমাদের দেখেই চমকে উঠল। অথচ চমকানোর মত কিছু করিনি আমরা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

একজন লম্বা, আরেকজন তারচেয়ে অনেক খাটো। একজনের লম্বা চুল, আরেকজনের ছোট করে ছাঁটা। আঠারো-উনিশের বেশি বয়েস হবে না কারোরই। দেখে স্বভাব-চরিত্র ভাল বলে মনে হলো না।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে লম্বাজন তার সঙ্গীকে আঞ্চলিক ভাষায় যা বলল তার শুদ্ধ করলে দাঁড়ায়, 'ফটিক দেখ্, কাণ্ড দেখ্, তিনটা তিন জাতের চিড়িয়া! কোত্থেকে এল এগুলো?'

ফটিক নামটাকে বিকৃত করে বলল ফইটকা।

ট্যুরিস্টদের মুখ খারাপ করে গাল দিল তার সঙ্গী। *ওদের জ্বালায় যে শান্তি নেই*, সেটাও বলল।

ওর কথার ভঙ্গিতেই রাগ লাগল আমার। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে। মুসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, হাত মুঠো করে ফেলেছে। ওরও ভাল লাগেনি।

গম্ভীর হয়ে সরে আসতে চাইল কিশোর, পথরোধ করল লোকগুলো। বেঁটেটা, অর্থাৎ ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'এই, কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

'সেটা আপনাদের বলতে যাব কেন? সরুন।'

ফটিক বলল, 'ডাঁট দেখেছিস, জলিল? ইচ্ছে করছে কান দুটো ছিঁড়ে দিই!' সে-ও জলিলকে বলল জইল্লা। নামকে বিকৃত করে বলার এই প্রবণতা কেন এখানে বুঝতে পারলাম না। ছমির আলিও তার ভাইকে আমির না বলে ডাকে আমিরা। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আবার ফটিক, 'এখানে কি জন্যে এসেছ?'

‘সেটাও আপনাদের শোনার দরকার নেই,’ বলল কিশোর।

লোকগুলো আসলেই খারাপ, আর কোন সন্দেহ রইল না আমার।

কিশোরের দিকে হাত বাড়াল জলিল। হয়তো কান চেপে ধরারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু চিতার জন্যে পারল না। ঘাউ করে চেঁচিয়ে উঠে লাফ দিয়ে এসে পড়ল সে। সমস্ত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল দু-জনেই। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে চিতার দিকে।

ফটিক বলল, ‘এই কুত্তা, খেপিস কেন? কিছু তো করছি না।...জলিল, চল্...যে কুত্তার কুত্তা, কামড়েই দেবে!’ কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই, তোমরা এদিকে ঘোরাঘুরি করবে না?’

‘কেন করব না? আপনার জায়গা?’ সাফ জবাব দিয়ে দিল কিশোর।

জ্বলে উঠল ফটিকের চোখ। কিন্তু চিতার জন্যে কিছু করার সাহস পেল না। বিড়বিড় করে বোধহয় গাল দিতে দিতেই ওখান থেকে সরে গেল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বাঁকের ওপাশে।

‘ব্যাটারা কারা?’ মুসার প্রশ্ন।

‘কি জানি,’ হাত ওল্টাল কিশোর। গুণ্ডাপাণ্ডা হবে আরকি, মাস্তান।...দূর, ওদের পরোয়া কে করে, এসো, আমাদের কাজ করি।’

সারাটা দুপুর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে গুহামুখ খুঁজে বেড়ালাম আমরা। কিছুই চোখে পড়ল না। এ ভাবে পড়ার কথাও নয়। তাহলে এই এলাকার লোকে অনেক আগেই দেখে ফেলত।

‘সারাজীবন খুঁজলেও পাব না,’ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল কিশোর, ‘অনেক বড় পাহাড়। কোথায় আছে কে জানে।’

আমার মনে হলো, খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছি আমরা। সে কথা বললাম।

তবে অত সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয় কিশোর। লোকগুলো যেদিকে গেছে সে-দিকটায় খোঁজা হয়নি, ওরা গেছে বলেই এতক্ষণ যাইনি আমরা। এখন সেই দিক দেখিয়ে সে বলল, ‘চলো, ওদিকটায় খুঁজে দেখি।’

ওপাশের ঢাল বেয়ে পাঁচশো গজ নামতে না নামতেই একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল মুসা। হাত তুলে দেখাল আমাদের। দেখলাম, ঝোপের গোড়ার কয়েকটা গাছ ভাঙা। আপনাআপনি কোনো গাছ এ ভাবে ভাঙতে পারে না, হয় বড় কোন জানোয়ারের কাজ, নয়তো মানুষের।

‘ছাগলে ভেঙেছে,’ মুসার অনুমান।

মাথা নাড়ল কিশোর, ‘মনে হয় না। ছাগলে হলে ভাঙার আগে পাতা মুড়িয়ে খেতো। দেখো, একটা পাতাও খাওয়া নয়। মানুষ গেছে। কিন্তু মানুষ ওই ঝোপে ঢুকতে গেল কেন? লুকানোর জন্যে নয়তো?’

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই গিয়ে ঝোপের কাছে বসে পড়ল মুসা। দু-হাতে ডাল সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল, ‘খাইছে! কিশোর, একটা গুহামুখ!’

দৌড়ে গেলাম আমরা।

‘নিশ্চয় তেমুলকায় যাওয়ার পথ!’ মুসা বলল।

'আরে না,' কিশোর বলল, 'অত সহজ হলে কবেই ঢুকে যেত লোকে। বের করে ফেলত শহরটা। আমার মনে হয় এটা সাধারণ গুহা।'

প্রশ্ন তুললাম, 'গাছগুলো ভাঙল কে?'

'হুঁ, এটা আমারও প্রশ্ন। হয় কোনো জানোয়ার ঢুকেছে, নয়তো মানুষ। চিতাবাঘ-টাঘ তো নেই এদিকে, শুয়োরেরাও এ রকম বদ্ধ গুহায় বাস করে না, তারমানে মানুষই হবে। কোনো ছেলেটেলেও হতে পারে, রাখাল, গরু চরাতে এসে গুহা দেখে ঢুকে পড়েছে।'

'তাহলে আমরাই বা ঢুকছি না কেন?' মুসা বলল, 'ঢুকে দেখলেই তো পারি, কি আছে?'

গুহায় ঢোকার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছি আমরা, সঙ্গে টর্চ আছে। আগে আগে ঢুকে গেল মুসা।

বেশ বড় একটা গুহা। এককোণে টর্চের আলো ফেলেই থমকে গেল সে। 'খাইছে!'

মুসা কি দেখেছে দেখার জন্যে তার ঘাড়ের ওপর দিকে মুখ বাড়িয়ে তাকালাম আমি আর কিশোর। গাদা করে রাখা হয়েছে নানা রকম চামড়া।

ভাল করে দেখার জন্যে আরেকটু এগোলাম। চিনতে পারলাম চামড়াগুলো কিসের: শেয়াল, গোসাপ, বেজি আর অজগর সাপের। একধারে পাথুরে মেঝেতে পড়ে আছে নানারকমের ফাঁদ, কোঁচ, দড়িদড়া আর আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস।

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে কিশোর বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম, ব্যাটারা আমাদের দেখে চমকে গিয়েছিল কেন। ওরা পোচার। বেআইনী ভাবে জানোয়ার মেরে চামড়া পাচার করে।'

'কিন্তু ওরাই যে করে কি করে জানছি?' প্রশ্ন তুললাম। 'অন্য কেউও তো হতে পারে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, ওরাই, আমি শিওর। ওদের হাবভাবই বলছিল, খারাপ কাজে জড়িত ওরা...'

আলো ফেলে ফেলে গুহাটা দেখতে লাগলাম আমরা। প্রবেশপথটা ছাড়া আর কোনদিকে যাওয়ার অন্য কোনো পথ দেখলাম না। দেয়ালের একজায়গায় একটা চিড় দেখা গেল, কিন্তু এতই সরু, বড় জোর একটা ইঁদুর ঢুকতে পারে। ওখান দিয়ে মানুষ ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না।

পুরো গুহাটা দেখে শেষও করতে পারলাম না, খসখস শব্দ হলো আমাদের পেছনে। ঝট করে ঘুরে তাকালাম। সেই দু-জন এসে ঢুকেছে। নিশ্চয় আমাদের ওপর নজর রাখছিল।

জলিল বলল, 'কি ফটিক, বলেছিলাম না, স্পাইগিরি করছে? আমাদের পেছনেই লেগেছে? তুই তো বিশ্বাস করলি না। এখন?'

'আমি এখনও করছি না। এরা এখানকার লোক নয়। আগে কখনোই দেখিনি। বেড়াতে এসেছে। আমরা কি করছি না করছি জানার কথা নয়।'

'তাহলে ঢুকল কি করে এখানে?'

'বেশি ছোঁক ছোঁক করার স্বভাব আরকি।'

'আমার মনে হয় না। এ কথা গলা কেটে বললেও আমি বিশ্বাস করব না। আমাদের পেছনে না লাগলেও অন্য কিছুর পেছনে যে ওরা লেগেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ থেকেই তো ওদের কাণ্ড দেখলাম। নিশ্চয় কিছু খুঁজছে।'

এ ভাবে ওরা এসে ঢুকে পড়বে, কল্পনাও করিনি আমরা। আমাদের চমকের প্রথম ধাক্কাটা কাটার আগেই দ্রুত গিয়ে একটা কোঁচ তুলে নিল জলিল। ফটিক পকেট থেকে বের করল একটা ছুরি। গরগর করে উঠল চিতা। ধমক দিয়ে জলিল বলল, 'কুত্তাটাকে সামলাও! নইলে পেট ফুঁড়ে দেব! দেখছই তো, জানোয়ার মারা কিচ্ছু না আমাদের জন্যে।'

বিশ্বাস করলাম তার কথা। ভয় লাগল, ভাবছি, নিজেদের বিপদ দেখলে মানুষও কি মারতে পারবে ওরা?

চিতাকে আটকে রাখল মুসা।

ফটিক বলল, 'এখানে বেড়াতে এসেছ তোমরা, না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'যা যা দেখলে পুলিশকে বলে দেবে?'

কি ভেবে কিশোর বলল, 'না। চুরি করে কে চামড়া পাচার করছে সেটা দেখতে আসিনি আমরা।'

'তাহলে কি জন্যে এসেছ?'

'বেড়াতে।'

বিশ্বাস করল না জলিল, ধমক দিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা। কিছু একটা খুঁজছ যে তোমাদের ভাবসাব দেখেই বুঝেছি। নইলে কি আর পেছনে লেগে থাকি?' কোঁচ দিয়ে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল, 'কেন এসেছ জলদি বলো!'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। বোধহয় ভাবছে, থেইয়ার সোনার মূর্তি খুঁজতে এসেছে এ কথা বলবে কিনা লোকগুলোকে। তারপর আচমকা বলে দিল, 'তেমুলকা শহর খুঁজতে। ওই যে, হারানো একটা জাতি ছিল...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না জলিল। হা-হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'শুনলি ফটিক, হারানো শহর খুঁজতে এসেছে! গাধা নাকি এগুলো! কে কোন কিচ্ছা বলল, আর সেটা শুনে চলে এল খোঁজার জন্যে। যেন সত্যিই ছিল।'

ফটিক হাসল না। বলল, 'হারানো শহর ওদের যত ইচ্ছে খুঁজুক, আমাদের কি। আমি সে-কথা ভাবছি না, ভাবছি, চামড়াগুলো তো দেখে ফেলল। পুলিশকে গিয়ে যদি বলে দেয়?'

মুখচোখ কঠোর করে ফেলল জলিল। আমাদের দিকে তাকিয়ে হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'এই বলবে নাকি? তাহলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব! এদিকে আর আসবে না। যাও, বেরোও!'

কি আর করব? অস্ত্রধারী দু-জন লোকের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই আমাদের। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হলো।

কিছুক্ষণ থেকেই রোদ আর মেঘের খেলা চলছিল। এখন বেরিয়ে দেখি মেঘে ঢেকে যাচ্ছে আকাশ। গরম যা পড়েছে, তাতে মনে হলো ঝড় হতে পারে। বৃষ্টি যে নামবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপাতত এই পাহাড়ে আর কিছু করার নেই

আমাদের। বাড়ি ফিরে চললাম।

পাঁচ

আমরা কটেজে ফিরতে না ফিরতেই শুরু হলো ঝড়বৃষ্টি।

রাতে খাবার টেবিলে পোচারদের কথা চৌধুরী আংকেলকে বললাম আমরা। তিনি বললেন, সকালেই পুলিশকে জানানোর জন্যে লোক পাঠাবেন। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না। সারারাত ধরে বৃষ্টি হলো। ভোররাতের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গা-টা কেমন যেন গোলাচ্ছে; সেই সঙ্গে কাঁপুনি, বিচিত্র একটা অনুভূতি! তবে বোধটা চেনা চেনা লাগল। কোথায় যেন ঝনঝন করে কিছু পড়ল।

অন্ধকারে মুসার গলা শোনা গেল, অন্য বিছানা থেকে বলছে, 'কিশোর, ভূমিকম্প হচ্ছে!'

এতক্ষণে বুঝলাম, কেন চেনা লাগছিল। ঘুম ভেঙে ওঠায় চট করে বুঝতে পারিনি। লস অ্যাঞ্জেলেসে তো প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, হলে কেমন অনুভূতি হয় জানি। খুব সামান্য সময়ই থাকল ভূমিকম্প, তবে ঝাঁকুনি কম না।

রান্নাঘরে ছমির আলির হই-চই শোনা গেল। ভূমিকম্প থেমে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দৌড় দিলাম, আমরা ভাবলাম ঘরটর বুঝি ধসে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম, ওসব কিছু না। দেয়াল ধসেনি, ভূমিকম্পে কাঠের বেড়ার কোন ক্ষতি হয় না। আগের মতই আছে। তবে তাকের অনেকগুলো বাসন-পেয়ালা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

চেঁচামেচি শুনে আংকেল-আন্টিও উঠে এলেন।

পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো তুলতে দেরি হলো না, ছমির আলি একাই তুলে ফেলল। আমরা আবার আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। ভূমিকম্প আমাদের অনেক দেখা আছে, এটা কোন ঘটনাই না, ঝড়-বৃষ্টির মতই স্বাভাবিক; কিশোর আর মুসা ঘুমিয়ে পড়ল আবার। আমার আর ঘুম এল না। শুয়ে থেকে অন্ধকারে কান পেতে শুনতে লাগলাম মুষলধারে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আর বাতাসের গর্জন।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিশোরের ডাকে জেগে গেলাম।

উঠলাম বিছানা থেকে। বাইরে তখনও অঝোরে চলছে বর্ষণ। রেডিওতে আবহাওয়া অফিসের বিবৃতি শোনা গেল: *বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। যে কোন সময় বিপুল বেগে আঘাত হানতে পারে উপকূলে।*

বুঝলাম, সারাদিনই চলবে এই অবস্থা, বাইরে আর বেরোতে পারব না। মনটা খারাপই হয়ে গেল। কতক্ষণ বসে থাকা যায় ঘরের মধ্যে!

আমাদের নাস্তা শেষ হলে ছাতা নিয়ে বেরোল ছমির আলি। গাঁয়ের বাজারে যাবে, ডিম, শাকসজি আর কিছু টুকটাক জিনিস কিনে আনতে। ফিরে এসে সে জানাল, ভূমিকম্পে স্কুলবাড়িটার একটা ধার নাকি ধসে পড়েছে। গাঁয়ে ওটাই একমাত্র পাকা বাড়ি। তারমানে স্বল্পস্থায়ী হলেও কাঁপুনিটা বেশ জোরালই হয়েছিল।

সারাটা সকাল বসে বসে কাটালাম। গল্প করা আর তাস-কেরম খেলা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না। গল্প যা করলাম, তার বেশির ভাগটাই পাতালশহর

তেমুলকাকে নিয়ে।

কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিলেন চৌধুরী আংকেল। তাঁর পুলিশ জীবনের নানারকম রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। ওই সময়টায় আন্টি রইলেন রান্নাঘরে, বিরিয়ানি রান্নায় ব্যস্ত।

দুপুরের ভুঁড়িভোজনটা চমৎকার হলো। কিছু করার নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসে উঠলাম বিছানায়। বিকেলবেলা উঠলাম ঘুম থেকে। বাদল দিনের সন্ধ্যা, অবেলাতেই ঘনিয়ে এসেছে। গরম গরম পাঁপর, পিঁয়াজু, বেশি করে পিঁয়াজ-মরিচ দিয়ে মুড়মুড়ে করে ভাজা মুড়ি আর চা দিয়ে বৈকালিক নাস্তাটা চমৎকার জমল।

বারান্দা থেকে তাকিয়ে রইলাম নীল পাহাড়ের দিকে। ঘোলাটে, কেমন অবাস্তব লাগছে চূড়াটা, মনে হচ্ছে যেন আকাশে ভাসছে ওটা। বাতাস আর বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। বার বার আবহাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে রেডিও, সাবধান করছে, ক্রমেই এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়।

এই রাতেও সকাল সকাল বিছানা নিলাম। ভোরের দিকে কমে এল বাতাস। মোড় নিয়ে আরেক দিকে চলে গেছে ঘূর্ণিঝড়। সকাল বেলা বৃষ্টি আর বাতাস দুটোই বন্ধ হয়ে গেল। দশটার দিকে রোদও উঠল। আর কি ঘরে বসে থাকা যায়? বেরিয়ে পড়লাম।

গন্তব্য একটাই, সেই গুহা। দুই চোরাশিকারী সেদিন ঢুকে পড়ায় ভালমত দেখতে পারিনি গুহাটা, সম্ভব হলে আরেকবার খুঁটিয়ে দেখতে চায় কিশোর, যদি জলিলরা কাছাকাছি না থাকে।

দু-দিন ধরে ভিজেছে, ভেজা প্রকৃতি, কড়া রোদে সবকিছু থেকে বাষ্প উঠছে। অল্পক্ষণেই ঘেমে আঠা হয়ে গেল শরীর। অনেক ফড়িঙ আর প্রজাপতি বেরিয়েছে। চিতার আনন্দ দেখে কে। কেবল তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওগুলোকে।

সাবধানে গুহার সামনের ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। আসার পথে কোথাও চোখেপড়েনি লোকদুটোকে, এখানে এসেও দেখলাম না। ভেতরে নেই তো?

কিশোর বলল, 'এখানে পাহারায় থাকতে হবে একজনকে। ওরা এলে সাবধান করে দিতে হবে।'

মুসা জানতে চাইল, 'কে থাকবে?'

'তুমিই থাকো চিতাকে নিয়ে।'

তাতে আপত্তি নেই তার। বলল, 'যদি ওরা ভেতরে থেকে থাকে?'

'তাহলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে আসব।'

কিশোর আর আমি গুহায় ঢুকলাম, খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে। গুণ্ডা দুটোর সাড়া পেলেই বেরিয়ে চলে আসার জন্যে তৈরি। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। টর্চের আলো ফেলল কিশোর। একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠল। আমিও দেখলাম, গুহাটা শূন্য। চামড়া আর জিনিসপত্র যা ছিল, সব নিয়ে গেছে পোচাররা। নিশ্চয় পুলিশের ভয়ে। আমরা গিয়ে বলে দিলে পুলিশ আসবে, এই জন্যে যত তাড়াতাড়ি পেরেছে সরিয়ে ফেলেছে।

প্রশ্ন করলাম, 'নিল কোথায়?'

'গুহার কি আর অভাব আছে এখানে?' জবাব দিল কিশোর। 'ওরা এই অঞ্চল

ভাল করেই চেনে। অন্য কোন গুহায় সরিয়ে ফেলেছে।'

'ভালই হয়েছে আমাদের জন্যে। এসে আর বাগড়া দেবে না।'

গুহাটায় কোন পথ আছে কিনা খুঁজতে শুরু করলাম। আরেকবার অবাক হতে হলো। সেই যে সরু চিড়টা, সেটা ফাঁক হয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। সহজেই মানুষ ঢুকতে পারবে এখন। নিশ্চয় ভূমিকম্পের কারণে হয়েছে এটা। বহুবার দেখেছি, আমরা কোন কেস হাতে নিলে একসময় না একসময় ভাগ্য আমাদের সহায় হবেই, এবারও তাই ঘটল।

ফাঁকটার ভেতর একবার আলো ফেলেই নিশ্চিত হয়ে গেলাম, সুড়ঙ্গ আছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'মুসাকে ডেকে নিয়ে এসো। আর পাহারার দরকার নেই। লোকগুলো আসবে না।'

চিতাকে নিঁয়ে ভেতরে এল মুসা। ফাঁকটা দেখে সে-ও অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'কি করবে? ঢুকবে নাকি?'

'ঢুকব না মানে!' কিশোর বলল, 'এতবড় একটা সুযোগ পেয়ে গেছি কপালগুণে, ঢুকে তো দেখবই। মনে হচ্ছে, তেমুলকা আবিষ্কার আমাদের কপালেই ছিল!'

সারি বেঁধে এগিয়ে চললাম আমরা। চিতাকে দিলাম আগে। সামনে কোন বিপদ থাকলে সে টের পেয়ে যাবে, যেটা আমরা পাব না। তার পেছনেই রয়েছে কিশোর।

এ রকম করে যে সুড়ঙ্গ পেয়ে যাব, কল্পনাই করতে পারিনি আমরা। তাই আর কেউ টর্চ আনিনি, কিশোরের একটা টর্চই যথেষ্ট ভেবেছি। এখন মনে হতে লাগল, ভুল করেছি। আমাদেরও আনা উচিত ছিল।

চলতে চলতে মুসা বলল, 'সুড়ঙ্গটাও ভূমিকম্পে হয়েছে নাকি?'

কিশোর বলল, 'না, ভূমিকম্পে কেবল মুখটা খুলে গেছে। সুড়ঙ্গটা আগে থেকেই ছিল।'

কিছুদূর এগিয়ে বাঁ পাশের দেয়ালে আরেকটা ফোকর দেখতে পেলাম। ভেতরে আলো ফেলে বোঝা গেল, ওটাও সুড়ঙ্গমুখ, খুব ছোট। সোজা হয়ে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না, তবে হামাগুড়ি দিয়ে সম্ভব। কিশোর বলল, যেটা দিয়ে চলেছি সেটা ধরে গিয়ে কিছু না পেলে ফিরে এসে সরুটাতে ঢুকব।

কিছুদূর এগিয়েই দাঁড়িয়ে যেতে হলো। সামনে দেয়াল, যাওয়ার পথ বন্ধ।

ফিরে আসতেই হলো। আরেকটা অসুবিধে দেখা দিল, ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে কিশোরের টর্চের। নতুন ভরেনি, টর্চে পুরানো যা ভরা ছিল সেগুলো নিয়েই চলে এসেছে। আলো ছাড়া সুড়ঙ্গে ঢোকা সম্ভব নয়, সুতরাং সেদিনকার মত ফিরে আসতে হলো আমাদের। তবে বেরোনোর আগে ছোট মুখের সামনে পাথর ফেলে এমন ভাবে বন্ধ করে দিয়ে এলাম যাতে মুখটা আর কারও নজরে না পড়ে। ফটিক আর জলিলের কথা ভেবেই এই কাজ করেছি। বলা যায় না, ওরা এসে কৌতূহলী হয়ে ঢুকে পড়তে পারে। আমাদের আগেই অন্য কেউ পাতালশহর আবিষ্কার করে ফেলবে, এটা সইতে পারবে না কিশোর।

বাইরে বেরোতেই চোখে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল দিনের আলো। সইয়ে

নিতে সময় লাগল।

দুই গুণ্ডাকে কোথাও দেখলাম না। ধরে নিলাম, ওরা কেটে পড়েছে, আর আসবে না। কিন্তু কিশোরের সন্দেহ গেল না। তার ধারণা, ওরা আমাদের ওপর চোখ রাখবেই।

এই কথা শুনে মুসা বলল, 'মনে হয় তোমার কথাই ঠিক!'

'কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

ডানে, বিশ গজ দূরের একটা ঝোপ দেখিয়ে বলল মুসা, 'ওই ঝোপটাকে নড়তে দেখেছি। চিতাও ওটার দিকে তাকিয়ে গরগর করছিল। আমি ভেবেছি কোন বুনো জানোয়ার হবে, তাই পাত্তা দিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...'

'লুকিয়ে থেকে চোখ রাখছিল আমাদের ওপর?' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর। 'চলো তো, দেখি?'

ঝোপটায় ঢুকলাম আমরা। কেউ নেই ভেতরে। তবে ছিল যে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বৃষ্টিতে ভেজা মাটিতে খালি পায়ের নতুন ছাপ পরিষ্কার ভাবে বসে আছে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'হুঁ, নজরই রাখছিল! ব্যাটারা আমাদের পেছনে লেগেছে, কি করি দেখতে চায়। আরও সাবধান থাকতে হবে আমাদের!'

ছয়

কটেজে ফিরলে পোচারদের খবর জানতে চাইলেন চৌধুরী আংকেল। ওরা যে পালিয়েছে, এ কথা জানাল কিশোর। এমন করে বলল, যাতে পুলিশকে জানানোর ব্যাপারে আগ্রহ হারান আংকেল। কিশোর চায় না, এখনই পুলিশ আসুক, এসে আমাদের পাতালশহর আবিষ্কারে বাধা দিক। ফাটলটার কথাও কিছু বলল না।

সাধারণ দু-জন পোচারকে নিয়ে আংকেলও আর মাথা ঘামালেন না। ভাবলেন, ফেরার পথে কাছাকাছি যে পুলিশ ফাঁড়িটা পড়বে, সেখানে থেমে খবরটা দিয়ে যাবেন পুলিশকে। ওরা যা করার করবে তখন।

পিকনিকের কথা বলে, খাবার প্যাকেট করে নিয়ে পরদিন আবার বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আজ তৈরি হয়েই চলেছি। কিশোরের ব্যাগে টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র সব সময়ই মজুদ থাকে। চক আর এক বান্ডিল নাইলনের শক্ত সুতো নিল সে পকেটে। তিনজনেই তিনটা টর্চ নিলাম, আর বাড়তি নতুন ব্যাটারি।

নেয়ার সময় মুসা জিজ্ঞেস করেছে, 'চক দিয়ে কি হবে?'

কিশোরের জবাব, 'ভেতরে সুড়ঙ্গের অনেক শাখাপ্রশাখা থাকতে পারে। দেয়ালে দাগ দিয়ে দিয়ে যাব। ফেরার পথে ওই চিহ্ন দেখে ফিরব, পথ হারানোর ভয় থাকবে না।'

'আর সুতো?'

'তেমন প্রয়োজন দেখলে ঢোকার মুখে কোন কিছুতে একমাথা বেঁধে বাকিটা ছাড়তে ছাড়তে এগোব, ওটা ধরেই যাতে আবার ফিরে আসতে পারি।'

'কেন, চকের চিহ্ন দেখে ফিরতে অসুবিধে কি?'

'দেখার জন্যে আলো দরকার। সুতো ধরে চললে আলো লাগবে না, অন্ধকারেও ফিরতে পারব।'

'আলোর অসুবিধে কোথায়? টর্চ তো রয়েছেই।'

'হাত থেকে পড়ে টর্চ ভেঙে যেতে পারে।'

হেসে ফেলল মুসা, 'বড় বেশি সাবধানী তুমি।'

'মরার চেয়ে সাবধান থাকা ভাল না?'

'তা বটে।'

পাহাড়ের ঢালে গুহামুখের কাছে আসার আগেই আশপাশটা ভালমত দেখে নিলাম আমরা। কিন্তু পোচারদের ছায়াও চোখে পড়ল না। অনেক ঝোপঝাড় আছে, ওগুলোর কোনটাতে লুকিয়ে থাকলে দেখতে পাব না। ভরসা করলাম চিতার ওপর, সে ওদের গন্ধ পেলে জানান দেবে। কিন্তু সে-রকম কিছু করল না সে। তারমানে সন্দেহজনক কিছুর অস্তিত্ব টের পায়নি, শত্রুপক্ষ ধারেকাছে নেই।

ঢুকে পড়লাম গুহায়। আগের দিনের মতই নির্জন। সেই সরু সুড়ঙ্গমুখটার কাছে এসে পাথর সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। আগে আগে চলল চিতা।

ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঁচু হয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের ছাত। দু-পাশে দেয়াল অবশ্য একই রয়েছে। গজ পঞ্চাশেক এগোনোর পর এতটাই উঁচু হয়ে গেল, উঠে দাঁড়াতে পারলাম। হেঁটেই এগোলাম তখন। খানিকটা যেতেই দু-পাশের দেয়ালও চওড়া হয়ে এল।

কিশোর বলে উঠল, 'আরেকটা গুহা!'

'খাইছে! দেখো!' বদ্ধ দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল মুসার কণ্ঠ। দেয়ালে আলো ফেলে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে।

আমরাও হাঁ হয়ে গেলাম। এ রকম দৃশ্য দেখতে পাব, আশা করিনি। গুহার দেয়ালে ছবি আঁকা!

'গুহাচিত্র!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

তাজ্জব হয়ে দেখতে লাগলাম ছবিগুলো। নানা রকম জন্তু আর পাখির ছবি। বর্শা দিয়ে হরিণ আর চিতাবাঘ শিকারের দৃশ্যও রয়েছে। দক্ষ শিল্পীর আঁকা নিখুঁত ছবি।

কিশোর বলল, 'মুখগুলো দেখেছ? হারাণ মুচির চেহারার সঙ্গে সাংঘাতিক মিল। নীল চোখদের বংশধর সে, মিথ্যে বলে না বুড়ো।'

'তারমানে পাতালশহর পেয়ে গেছি?' প্রশ্নটা করলাম অনেকটা নিজেকেই।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। তবে হারাণ মুচির কথা যে সত্য তার প্রমাণ পেয়েছি।'

গুহাটা থেকে আর কোন পথ বেরিয়েছে কিনা খুঁজতে শুরু করলাম। পেতে দেরি হলো না। দুটো পথ আছে। একটা পথ আমরা যে মুখটা দিয়ে বেরিয়েছি তার কাছে। আরেকটা উল্টো দিকের দেয়ালে, মনে হলো পাহাড়ের গভীরে চলে গেছে।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটা দিয়ে যাব?'

'ওটা,' উল্টো দিকেরটা দেখিয়ে বলল সে।

ঢুকে পড়লাম। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ। বেশিদূর এগোতে পারলাম না, একটা মোড় নিতেই দেখলাম সামনে দেয়াল। পথ বন্ধ। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো। খানিকটা নিরাশ যে হলাম না তা নয়। পাহাড়ের গভীরে যে পথটা গেছে সেটাই বন্ধ, বাকি যেটা আছে সেটা দিয়ে গেলে কি হবে কে জানে!

কিশোর অবশ্য কোন ব্যাপারেই এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হয় না, হালও ছাড়ে না। ফিরে এসে দ্বিতীয় পথটা দিয়ে ঢুকলাম।

কিছুদূর এগিয়েই লেজ নাড়তে নাড়তে প্রায় দৌড়ে চলল চিতা। ব্যাপারটা শুভলক্ষণ বলে মনে হলো।

ঠিকই অনুমান করেছি। আবিষ্কারটা অনেকটা চিতাই করল। আরেকটা বিশাল গুহায় আমাদেরকে নিয়ে এল সে। গুহাটা প্রাকৃতিক নয়, মানুষে খুঁড়ে তৈরি করেছে। একধারে দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করেছে একটা পাথরের বেদি। ওটার সামনে কিছু পাথরের বেঞ্চ রাখা। মনে হলো, এটা কোন ধরনের ধর্মশালা। ওই বেদিতে উঠে হয়তো বলিটলি দিত যাজক।

দেয়ালের গায়ে পাথরের তাকে দেখতে পেলাম কিছু পাথরের লণ্ঠন।

দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'আর কোন সন্দেহ নেই, পুরানো সেই জাতিটা সত্যি বাস করত এখানে। দেবতার পূজা করত ওরা, বোঝা যায়।'

চিতা কি বুঝল কে জানে, যেন কিশোরের কথায় সায় দিয়েই সে বলল, 'খোকা!' এগিয়ে গেল বেদিটার কাছে।

আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখতে পেলাম। বেদির আড়ালে লুকানো। সেটাই দেখাতে নিয়ে এসেছে বুদ্ধিমান কুকুরটা।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'যাবে এর ভেতরে? আমার পেট তো শেষ, নাড়িভুঁড়িও হজম হয়ে গেছে।'

আবার বলল চিতা, 'খোক!' যেন সায় জানাল মুসার কথায়।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'হ্যাঁ, খাবার সময় হয়েছে। চলো।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল আমাদের, প্যাকেটগুলোকে অহেতুক বোঝা মনে করে মূল সুড়ঙ্গে ফেলে এসেছি। খাওয়ার জন্যে ফিরে যেতে হবে ওখানে।

প্যাকেটগুলো যে ভাবে যেখানে রেখেছি, সে ভাবেই পড়ে আছে। কিশোর বলল, 'চলো, বাইরে গিয়ে খাই। এখানে আর ভাল্লাগছে না।'

অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে থেকে আমি আর মুসাও হাঁপিয়ে উঠেছি। খোলা বাতাসের জন্যে আইঢাই করছে প্রাণ। অবাক হয়ে ভাবলাম, এই পাহাড়ের নিচে কি করে বছরের পর বছর বাস করেছে নীল চোখেরা!

বাইরে বেরিয়ে এলাম। কি সুন্দর রোদ। কি হাওয়া! প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। ঝোপের ছায়ায় খেতে বসলাম আমরা। তারপর একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়লাম ওখানেই।

কখন যে ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ, বলতেই পারব না।

ঘুম ভাঙলে দেখি চারটে বাজে। কিশোর আর মুসা তখনও ঘুমাচ্ছে। সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ঘুরে খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম, তারপর ভরপেট খাওয়া, এবং তার ওপর আরাম পেয়ে বেহুঁশের মত ঘুমিয়েছি। ওদেরকে ডেকে তুললাম।

আফসোস করতে লাগল কিশোর। সেদিন আর সুড়ঙ্গে ঢোকার সময় নেই। তাহলে কটেজে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, চিন্তা শুরু করে দেবেন আন্টি।

আমার আর মুসার কোন আফসোস নেই। ছুটি কাটাতে এসেছি, যতটা সম্ভব আরাম আর আনন্দে থাকতে পারাটাই আসল কথা, সেটাই থেকেছি।

সুড়ঙ্গে ঢুকে সরু প্রবেশপথটাকে আবার পাথর দিয়ে ঢেকে রেখে বেরিয়ে এলাম। ফিরে চললাম কটেজে।

পরদিন সকালে আবার বেরোলাম তেমুলকা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে।

পথে দু-জন লোকের সঙ্গে দেখা। চিনি না ওদেরকে, আগে দেখিনি। জলিল আর ফটিকের বয়েসীই হবে। কথা বলতে বলতে আসতে লাগল আমাদের পেছনে। ওদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলো। চিতাও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'আমাদের পেছনেই লেগেছে মনে হয়। গুহার দিকে যাব না।'

মোড় নিয়ে আরেকদিকে, গুহাটার উল্টোদিকে চললাম আমরা। লোকগুলো এল না। আমাদের যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে চলে গেল। ফিরেও তাকাল না।

মুসা বলল, 'অহেতুক সন্দেহ করেছি।'

কিন্তু কিশোর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'গেল তো ওদিকেই।'

'তাতে কি? ওদিকে আর কারও কাজ থাকতে পারে না নাকি?'

'তা পারে। তবে কাজটা কি জানতে পারলে ভাল হত।'

'দূর,' হাত নাড়ল মুসা, 'অহেতুক সন্দেহ করছ। ওরা ওদের কাজে গেছে। চলো, আমরাও যাই।'

'দাঁড়াও, আরেকটু পরে। লোকগুলো একেবারে চলে যাক।'

এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আবার গুহার দিকে ফিরলাম আমরা।

কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সাবধানে তাকাল আশপাশের ঝোপগুলোর দিকে। কেউ লুকিয়ে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু তা কি আর বোঝা যায়?

ঢুকে পড়লাম গুহায়। সেই বেদিওয়ালা ঘরটায় এসে বেদির পেছনের সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকলাম। বিশ মিটার মত এগিয়ে দুই ভাগ হয়ে দু-দিকে চলে গেল ওটা। কোনটা দিয়ে যাব? কিশোর বলল, দুটোই দেখবে। তাই প্রথমে ডানেরটায় ঢুকে পড়লাম।

বহুদূর পর্যন্ত এঁকেবেঁকে এগোল সুড়ঙ্গটা। কোথাও ঢালু হয়ে, কোথাও খাড়া। আশা হতে লাগল আমাদের, এর ওপাশে কিছু না কিছু পাবই।

কিন্তু হতাশ হতে হলো। শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। কিছু নেই।

আমাদের উৎসাহ দিতে লাগল কিশোর, ভেঙে যাতে না পড়ি সে জন্যে আশার কথা শোনাতে লাগল। বার বার বলতে লাগল, তেমুলকা আবিষ্কার না করে সে ছাড়বে না। চিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই চিতা, কিছু বুঝতে পারছিস?'

নিরুত্তাপ স্বরে জবাব দিল কুকুরটা, 'খাউ!' অর্থাৎ, না।

ফিরে এলাম আবার সুড়ঙ্গমুখে। বাঁয়েরটাতে ঢুকলাম। এই পথটা আরও

লম্বা। উঁচু-নিচু তো হচ্ছেই, দু-পাশের দেয়ালও কোথাও সরু, কোথাও চওড়া।

একটা মোড় নিতেই সামনে দেখা গেল হঠাৎ করে অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে পথ। ছাতও উঁচুতে। আশা হলো আমাদের, এবার নিশ্চয় কিছু পাব। উত্তেজনায় আগে চলে গেল মুসা।

আরও একটা মোড়। থমকে দাঁড়াল মুসা। প্রচণ্ড নিরাশায় প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'খাইছে! নেই তো!'

সুড়ঙ্গের মাথায় পাথরের দেয়াল।

বললাম, 'আমাদের অ্যাডভেঞ্চার এখানেই শেষ!'

ধপ করে বসে পড়ল মুসা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করল, 'কি করবে? ফিরে যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু করার দেখি না।'

'এত সকালেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, পরাজয় মেনে নিতে পারে না সে। 'এই পাহাড়ের নিচে যে একটা জাতি বাস করত, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তারমানে এখানেই কোথাও আছে তেমুলকা। ঠিক পথটা পাচ্ছি না বলে শহরটা পাচ্ছি না। পথটা খুঁজে পেলেই আর কোন অসুবিধে নেই।'

কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে মুসা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কান ঠেকিয়ে দাঁড়াল একপাশের দেয়ালে। যেন ওপাশে কি হচ্ছে শোনার চেষ্টা করছে। তার কানের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি। ও যা শোনে, আমরা অনেক সময় সেটা শুনি না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে। চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে তার। হাত নেড়ে ডাকল, 'শুনে যাও!'

আমি আর কিশোরও গিয়ে দেয়ালে কান পাতলাম।

'শুনছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'পানি! পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ!'

চমকে গেলাম। মনে পড়ল, তেমুলকা—গর্জনশীল স্রোতধারা!

'এই দেয়ালের ওপাশেই আছে সেই প্রাচীন শহর!' হাসি ফুটেছে কিশোরের মুখে। 'আর কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'তো, এখন কি করা?' জিজ্ঞেস করলাম। 'এই দেয়ালের ওপাশে যাব কি করে? পাথর ভাঙা কি সম্ভব?'

'নিরেট পাথর নিশ্চয় নয়। তাহলে শব্দ শুনতে পেতাম না এ ভাবে। কোন না কোন পথ নিশ্চয় আছে।'

মেঝেতে বসে পড়ে দেয়ালে হেলান দিল মুসা। 'ওসব পরে ভাবলেও চলবে। এসো, আগে খেয়ে নিই।'

বললাম, 'এখানে বসে ব্যাটারি নষ্ট করার চেয়ে চলো বাইরে যাই। খেয়েদেয়ে আবার আসব।'

'ভাল কথা বলেছ,' কিশোর বলল। 'ব্যাটারি যা আছে, তাতে আর বেশিক্ষণ চলবে বলে মনে হয় না। ওপাশে যাওয়ার রাস্তা বের করতে করতে ফুরিয়ে গেলে পড়ব বিপদে। নতুন ব্যাটারি নিয়ে আসতে হবে।'

'দূর!' হাত নাড়ল মুসা, 'এ ভাবে ফিরে ফিরে যেতে ভাল লাগে না। কাল একেবারে একবাক্স নিয়ে আসব।'

সাত

বাইরে বেরিয়ে দেখি, রোদ উধাও। আকাশ মেঘে ঢাকা। তাড়াতাড়ি কটেজে রওনা হলাম। দেরি করে ভেজার কোন মানে হয় না।

বিকেল থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হলো, সারাটা রাত ধরে চলল। পরদিন সকালেও থামাথামি নেই। বেরোতে পারছে না বলে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে কিশোর। শেষে আর থাকতে না পেরে বলল, ছাতা নিয়েই যাবে। পাহাড়ের কাছে যাবে আমির আলির রিকশায় চড়ে, তারপর থেকে ছাতা।

তবে তার প্রয়োজন আর হলো না। এগারোটা নাগাদ ধরে এল বৃষ্টি। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হলো, রোদও উঠতে পারে।

আন্টির কাছ থেকে খাবারের প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আংকেল জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের অগ্রগতি কতদূর? কিশোর বলে দিয়েছে, জানানোর মত এখনও তেমন কিছু পায়নি। আসলে পুরোটা আবিষ্কার না করে কিছু বলতে চায় না সে, আগে থেকেই সব বলতে থাকলে শেষ মুহূর্তে চমকে দেয়ার মজাটা আর পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে আর মনিকার সঙ্গেও দেখা করিনি আমরা। সময়ও পাইনি অবশ্য। তাছাড়া সব আবিষ্কার করে এসে তাকেও চমকে দেয়ার ইচ্ছে কিশোরের। তবে মনিকা বা তার দাদু চমকাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার, কারণ ওরা নিশ্চিত, পাহাড়ের নিচে কোথাও পাতালশহরটা আছেই। এতখানি বিশ্বাস যাদের, তাদের চমকে দেয়া কঠিন।

পারতপক্ষে গাঁয়ের পথ এড়িয়ে চলি আমরা, লোকজনের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। অত কৌতূহলী দৃষ্টি ভাল লাগে না। মনিকা যে নির্জন পথটা দেখিয়েছে সেটা দিয়েই চলাফেরা করি। সেটা ধরেই চলে এলাম পাহাড়ের ঢালে। কেউ পিছু নিল না আমাদের। গুহা থেকে চামড়াগুলো সরিয়ে ফেলার পর ফটিক আর জলিলেরও আর দেখা নেই। এদিকে আসেই না বোধহয় ওরা আর।

নিরাপদেই গুহায় ঢুকলাম আমরা। বেদিঘর পার হয়ে চলে এলাম সুড়ঙ্গের শেষ মাথায়, আগের দিন যেখান থেকে ফিরে গেছি। কিশোরের নির্দেশে পাথর দিয়ে ঠুকতে লাগলাম তিনজনেই দেয়ালের গায়ে। ফাঁপা কোথায় আছে বের করার চেষ্টা চালালাম।

বের করতে সময় লাগল না। কিন্তু পাথরের এই কঠিন দেয়াল ভাঙব কি দিয়ে?

নানা ভাবে ভেবে দেখলাম আমরা, কোন উপায় বের করতে পারলাম না। মুসা পরামর্শ দিল, গাঁইতি এনে কুপিয়ে ভাঙার। সেটাই করব, প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমরা, এই সময় নিতান্ত কপালগুণেই আমাদের কাজ অনেক সহজ করে দিল চিতা। একটা ইঁদুর তাড়া করে গিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল দেয়ালের পাশে একটা জায়গায়। মাটিতে তার নাকের চাপ লাগতেই খুট করে একটা শব্দ হলো। তারপর ঘড়ঘড় শব্দ। হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে কপাটের মত একপাশে খুলে

গেল পাথরের একটা দরজা!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

সবার আগে কথা বলল মুসা, 'খাইছে, এ তো আলিবাবার সিসেম ফাঁক!'

ঢোকার জন্যে দৌড় দিতে গেল সে। হাত চেপে ধরল কিশোর, 'দাঁড়াও! কি করে খোলে, ভাল করে দেখে নিই। ফাঁদও হতে পারে। ওপাশে গেলেই যদি বন্ধ হয়ে যায়, আর না খোলে, মারা পড়ব।'

চিতা যে জায়গাটায় চাপ দিয়েছিল, সেখানে সামান্য চাপ দিতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আবার চাপ দিলে খুলে গেল। বার বার করে দেখলাম এ রকম। চমৎকার মেকানিজম, এত শত বছর পরেও ঠিক আছে। নিখুঁত কাজ করে।

কিশোর বলল, 'আমি ওপাশে যাচ্ছি। যদি দরজা লেগে যায়, খুলতে না পারি, এ পাশ থেকে খুলে দিও। আয় চিতা, একলা যেতে ভয় লাগছে।'

ওপাশে চলে গেল সে। কিন্তু দরজা বন্ধ হলো না। বন্ধ করা যায় কিনা তার চেষ্টা চালাল। এ পাশের মতই ওপাশেও একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে চাপ দিয়ে দরজাটা খোলা আর বন্ধ করা যায়। আর কোন অসুবিধে নেই। আমি আর মুসাও ঢুকে পড়লাম।

ওপাশেও চওড়া সুড়ঙ্গ। যতই এগোলাম বাড়তে লাগল পানির গর্জন। বেশ কিছুক্ষণ এঁকেবেঁকে এগিয়ে মোড় নিল পথ। ওপাশে বেরোতেই চোখে পড়ল উপত্যকা। পাহাড়ের মধ্যে পাহাড়!

এক অদ্ভুত দৃশ্য! থ হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা। জুলভার্নের সেই যে পাতাল অভিযানের গল্প, পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে যায় একদল দুঃসাহসী অভিযাত্রী, সেই জায়গাটার সঙ্গে এই জায়গার আশ্চর্য মিল। বেশ লম্বা একটা উপত্যকা, তেমন চওড়া না, সরু। টর্চ জ্বালার দরকার পড়ছে না, অনেক ওপর থেকে হালকা নীলাভ আলো আসছে। বিচিত্র কোন পথে বাইরের আলোই আসছে বুঝলাম, কিন্তু ঠিক কোন পথে আসছে সেটা বুঝলাম না। নানা অলিগলি বেয়ে যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে দিনের আলো। ভেতরের সবকিছু কেমন নীলচে করে দিয়েছে। দেখা যায় পরিষ্কার।

বাঁয়ে পাথুরে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত। বদ্ধ জায়গায় অনেক বেশি করে কানে বাজছে তার গর্জন। নিচে পড়ে নদী তৈরি করে বয়ে চলেছে পানি।

আস্তে আস্তে কানে অনেকখানি সয়ে এল সেই শব্দ। চিৎকার করে কথা বললে এখন শোনা যায়। কিশোর বলল, 'যাক, খুঁজে পেলাম অবশেষে কিংবদন্তীর সেই তেমুলকা!'

এ রকম একটা আবিষ্কার করতে পেরে তিনজনেই বিস্মিত যেমন হয়েছি আমরা, খুশিও হয়েছি।

উপত্যকাটাকে দু-ভাগ করে দিয়ে বাঁ থেকে ডানে বয়ে যাচ্ছে পাতালের নদী। আমরা যে পাশে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে কেবল পাথর আর পাথর, নদীর কিনারে সরু বালির চরা। ওপারে অদ্ভুত কিছু বাড়িঘর। গোল, অনেকটা টাওয়ারের মত করে তৈরি। প্রাচীন ধাঁচের দরজা-জানালা।

'নীল চোখেরা তো অনেক উন্নত ছিল!' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'বিশ্বাস

হচ্ছে না, বুঝলে, মনে হচ্ছে টারজানের গল্প! সেই যে, যে সব হারানো নগরী আবিষ্কার করে টারজান…'

'চলো,' কিশোর বলল, 'কাছে থেকে দেখি।'

সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। পাথর ডিঙিয়ে চরা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম পানির কিনারে। স্রোত যে কতটা তীব্র, কাছে আসার আগে বুঝতে পারিনি। যাব কি করে ওপারে?

বাঁয়ে জলপ্রপাত আর পাহাড়ের বাধা, ডানে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। যতই নেমেছে ঢালু বেয়ে, আরও তীব্র হয়েছে স্রোত, বজ্রের গর্জন তুলে ঢুকে যাচ্ছে একটা বিশাল সুড়ঙ্গের মধ্যে। টগবগ করে ফুটছে যেন পানি।

'বাপরে বাপ, কি স্রোত!' মুসা বলল। 'আমি ভেবেছিলাম পাতালের নদী, কি আর এমন হবে, বড়জোর একটা খালটাল; কিন্তু এ তো ভয়ানক নদী! পেরোব কি করে?'

'তোমার মত সাঁতারুই এ কথা বলছ?' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

'সাঁতারে কাজ হবে না এখানে। একটানে কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই সুড়ঙ্গে, তারপরই টুপ। বাঁচতে হবে না আর।'

'তাহলে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'নীল চোখেরা পেরোত কি করে? নৌকা দিয়েও তো সুবিধে হবে না এখানে। মনে হয় কোথাও কোন ব্রিজটিজ আছে।'

কিনারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, আহ্, নদীটা যদি বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে বইত, তাহলেও তো হত, কিংবা এপারে থাকত যদি ওগুলো।

জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। বুঝতে পারছি, প্রবল গতিতে চলছে তার মগজ। উপায় বের করার চেষ্টা করছে। এত কাছে রয়েছে বাড়িগুলো, অথচ আয়ত্তের বাইরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে যেন অন্য কোন গ্রহে।

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, 'পেয়েছি! বুঝে গেছি!'

আমি আর মুসা দু-জনেই জানতে চাইলাম, কি বুঝেছে।

'কি করে পার হত নীল চোখেরা, বুঝেছি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এসো আমার সঙ্গে।'

কিছুই না বুঝে তার সঙ্গে সঙ্গে এগোলাম আমরা দু-জনে।

জলপ্রপাতের একেবারে গোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। তারপর আমাদের দিকে ঘুরে, দু-হাত মুখের কাছে জড় করে, প্রপাতের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে যা বলল, তার মানে হলো, ওপর থেকে যখন ঝরে পড়ে জলপ্রপাত, দেয়াল বেয়ে পড়ে না, পাহাড়ের দেয়াল আর পানির চাদরের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক থাকে। সরু ওই ফাঁকা দিয়ে পার হয়ে যাওয়াটা তেমন কঠিন কাজ না।

শোনার পর আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। দৌড় দিল পাহাড়ের দেয়ালের দিকে। কিশোরের কথাই ঠিক। সত্যি ফাঁক আছে। নিচে পাথর, ক্রমাগত ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে। পা হড়কে দিয়ে প্রপাতের নিচে পড়লে মহাবিপদ, তবে সাবধান থাকলে পড়ার ভয় নেই।

সরু জায়গাটায় উঠে পড়ল সে। দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলল।

আমি, কিশোর আর চিতাও উঠে পড়লাম ওই পথে। মিহি বৃষ্টির মত পানির ছিটে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগল গা। কেয়ারই করলাম না। সাঁতরেই তো নদী পেরোতে চেয়েছিলাম, সেই তুলনায় এই ভেজা কিছু না।

বেশি চওড়া না প্রপাতটা। পেরোতে সময় লাগল না আমাদের।

শুকনো জায়গায় পৌছে ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ফেলতে লাগল চিতা। আনন্দে হা-হা করে হেসে উঠলাম আমরা। সফল হয়েছি অবশেষে।

কিশোর বলল, খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়া উচিত।

এই সময় মুসার মনে পড়ল, খুব খিদে পেয়েছে তার। মনে পড়ল আমাদেরও। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ খুলতে দেরি হলো না। খেতে বসে গেলাম। গোগ্রাসে গিলে শেষ করলাম খাবারগুলো। সঙ্গে পানির বোতল আছে, তবু নদীর পানি খেয়ে দেখলাম। খুব মিষ্টি আর শীতল।

কিশোর বলল, 'মিষ্টি হবেই। পাহাড়ের গভীর থেকে উঠে আসছে তো।'

খেয়েদেয়ে, বিশ্রাম নিয়ে আবার পুরোপুরি চাঙা হয়ে উঠলাম আমরা। দেখতে চললাম বাড়িগুলো।

এপারের বালির চরা ওপারের চেয়ে অনেক চওড়া। নিশ্চয় এদিক দিয়েও বাইরে থেকে ঢোকার পথ আছে, এবং সেটাই আসল পথ। সহজ রাস্তা থাকতে জলপ্রপাতের নিচের বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে সচরাচর চলাফেরা করতে চাইবে না কেউ।

ওপার থেকে যতটা কাছে মনে হয়েছিল, আসলে তত কাছে নয় বাড়িগুলো। আলোর কারসাজিতেই অমন মনে হয়েছিল। যাই হোক, প্রথম বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। অনেক বড় গোল একটা টাওয়ার যেন, উচ্চতার চেয়ে বেড়টাই বড়। পাথর কেটে বড় বড় ফলক তৈরি করে চমৎকার কায়দায় জুড়ে দেয়া হয়েছে সুড়কি দিয়ে। এত পুরানো, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে না ভেঙে পড়ার কোন ভয় আছে।

আজব বাড়িটাতে ঢুকলাম আমরা। দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। ভয় যতটা না, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা। কোন আসবাবপত্র নেই, নেই চেয়ার, টেবিল কিংবা বিছানার ধ্বংসাবশেষ। মনে হয় মেঝেতেই ঘুমাত ওরা।

মুসা বলল, 'চাষবাস একেবারেই করত না নাকি ওরা? ফলগাছ, শাকসব্জি…' মাথা নেড়ে নিজেই জবাব দিল, 'না, সূর্যের আলো ঢোকে না তো। গাছপালা জন্মানোর কথা না এখানে।'

'ওরা শিকারী জাতিই ছিল,' কিশোর বলল। 'মাংস ছাড়া অন্য খাবারও আনত বাইরে থেকে। কি কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওরা বোধহয় বুঝতে পারছি।'

'কি কারণে?' জানতে চাইলাম।

মাটির দিক দেখিয়ে বলল কিশোর, 'দেখো, মনে হচ্ছে কাদা শুকিয়ে আছে। বন্যার পর যেমন পলিমাটি পড়ে অনেকটা তেমনি। আসার সময়ও লক্ষ করেছি ব্যাপারটা। নদীর দুই তীরে সবখানে একই ধরনের মাটি। এটার একটাই কারণ হতে পারে, পাহাড়ী ঢলে কিংবা অন্য কোন কারণে সাংঘাতিক ফুলে উঠেছিল নদী,

দু-কূল উপচে দিয়েছিল। ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বেচারা মানুষগুলোকে। প্রবল স্রোতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল সুড়ঙ্গের খাদে।'

'হুঁ,' একমত হয়ে বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ, কিশোর। জাতিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার এটাই কারণ।'

'কি সাংঘাতিক কাণ্ড!' কেঁপে উঠল মুসা, 'একদিনেই এতগুলো মানুষ শেষ হয়ে গেল!'

'এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও রকম করেই মরে মানুষ।'

'কিন্তু বাইরে এত জায়গা থাকতে এখানে এই পাহাড়ের মধ্যে এসে ঢুকেছিল কেন ওরা?'

'বাইরে হয়তো অনেক শত্রু ছিল ওদের। এখানে বাস করাটাই নিরাপদ মনে করেছিল।'

চুপ করে বহু বছর আগের সেই প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের কথা ভাবতে লাগলাম।

অবশেষে মুসা বলল, 'অনেক হয়েছে। চলো, আজ বাড়ি ফিরে যাই।'

আরও দেখার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো। কাল আবার আসব। শাবল-কোদাল নিয়ে আসব এবার।'

কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করবে?'

'মাটি খুঁড়ে দেখব কি পাওয়া যায়। নীল চোখদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র পাওয়া যাবেই যাবে।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে, 'বিরাট একটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করে ফেললাম আমরা।'

আট

রাতে খাবার টেবিলে চৌধুরী আংকেল জানতে চাইলেন আমাদের অগ্রগতি কদ্দূর। এড়িয়ে গেল কিশোর। কোনমতে একটা দায়সারা জবাব দিয়ে দিল, অনেকটাই এগিয়েছি। মনে হচ্ছে, নীল চোখদের শহর আবিষ্কার করে ফেলা যাবে। একটা কিংবদন্তীকে যে সত্য প্রমাণ করে ফেলতে যাচ্ছি আমরা, শুনে অবাক হলেন তিনি। করতে পারলে একটা ফাটাফাটি ব্যাপার হয়ে যাবে, বললেন। পোচারদের কথা জানতে চাইলেন, ওদের আর কোন খবর আছে কিনা। নেই, জানাল কিশোর।

পরদিন সকালে ছমির আলির কাছে একটা শাবল আর একটা কোদাল চাইল কিশোর। অবাক হলো সে, কিন্তু এ ক'দিনে আমাদের অস্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোন প্রশ্ন করল না। দিয়ে দিল যা চাইছি।

নির্জন বুনোপথটা দেখিয়ে দিয়ে একটা কাজের কাজই করেছে মনিকা। নইলে গাঁয়ের লোকের সামনে দিয়ে যেতে মহা অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম। হাতে শাবল-কোদাল নিয়ে আমাদের যেতে দেখলে অবাক হতই ওরা, কৌতূহল চাপতে না পেরে পিছু নিত ছেলেছোকরার দল, আমাদের গুহা আবিষ্কারের ইতি ঘটিয়ে ছেড়ে

দিত।

একজন লোকেরও সামনে না পড়ে গুহার কাছে চলে এলাম আমরা। কি জানি কেন, হঠাৎ গরগর করে উঠল চিতা। কোন কিছু উত্তেজিত করেছে তাকে। কিন্তু কারণ বুঝতে পারলাম না। কোন জানোয়ার কিংবা মানুষ চোখে পড়ল না।

গুহায় ঢুকে পড়লাম। চলে এলাম সেই পাথরের দরজাটার কাছে। অন্য পাশে এসে কি ভেবে আজ দরজাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ আর খুঁতখুঁতে মন তার। এতে ক্ষতির চেয়ে ভালই হয়, অতীতে বহুবার দেখেছি।

তেমুলকা উপত্যকায় বেরিয়ে এলাম। জলপ্রপাতের নিচ দিয়ে এসে ঢুকলাম সেই প্রথম ঘরটায়, আগের দিন যেটাতে ঢুকেছিলাম।

খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম আমরা। তাড়াহুড়োয় মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুসার কোদালের ফলায় উঠে এল চকচকে একটা জিনিস। ওটা হাতে নিয়ে একবার দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্রেসলেট! সোনার!'

কিশোর আর আমিও হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। সত্যিই সোনার।

নতুন উদ্যমে মাটি খুঁড়তে লাগলাম আমরা। কি জানি কি বুঝল চিতা, সে-ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল, আঁচড়ে আঁচড়ে খুঁড়তে শুরু করল। এবং দ্বিতীয় জিনিসটা খুঁজে পেল সে-ই। সোনার একটা নেকলেস। নখে আটকে বের করে আনল।

'তার মানে সত্যি সোনা বানাতে জানত নীল চোখেরা?' প্রশ্ন জাগল মনে, বললাম সেটা।

'সোনা বানানোর কথা আমার বিশ্বাস হয় না,' কিশোর বলল। 'পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই অবশ্য এই কিংবদন্তী রয়েছে। বানাতে জানত কিনা জানি না, তবে নীল চোখেরা যে দক্ষ স্বর্ণকার ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' হারটা দেখতে দেখতে বলল সে।

'পেল কোথায় এই সোনা?' মুসার প্রশ্ন।

'আমিও সে-কথা ভাবছি। পেল কোথায়? তবে কি এখানে সোনার খনি খুঁজে পেয়েছিল ওরা?'

'কিন্তু বাংলাদেশে সোনার খনি আছে বলে তো শোনা যায়নি কখনও?' প্রশ্ন তুললাম, 'কেউ বলেনি।'

'মাটির নিচে কোথায় কি আছে কে বলতে পারে? বলেনি বলেই যে থাকতে পারবে না এমন তো কোন কথা নেই। নীল চোখেরা ছিল পাতালের অধিবাসী। এখানে কোথাও খনি থাকলে তাদের পক্ষে সেটা খুঁজে পাওয়া খুব স্বাভাবিক।...এসো, দেখি, আর কি পাওয়া যায়।'

অনেক কিছুই পেলাম আমরা। সোনার গহনা তো পেলামই, নানা রকম তৈজসপত্রও বেরোল মাটির নিচ থেকে। কোনটা ধাতুর তৈরি, কোনটা মাটির।

বিকেল হলো, বাড়ি ফেরার সময়। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কি করব আমরা? এখানেই ফেলে যাব?'

'সোনার জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়াই উচিত,' জবাব দিল কিশোর। 'বাকি সব

থাক। আমাদের আবিষ্কারের কথা এখনও কাউকে জানানোর সময় আসেনি। কাল এসে থেলিয়ার সোনার মূর্তিটা খুঁজব। আমি এখন শিওর, ওটাও আছে কোথাও না কোথাও। বের করার চেষ্টা করব। তারপর গিয়ে ফাঁস করব পুরো কাহিনী।' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ।

পরদিন আবার আসতে হবে। শাবল-কোদালগুলো ওখানে ফেলে রেখেই রওনা হলাম আমরা।

পাথরের দরজাটা খুলে সুড়ঙ্গের অন্যপাশে আসতেই থমকে দাঁড়াল চিতা। গরগর শুরু করল। ঢোকার সময়ও এমন করেছিল। আবার কোন কিছু উত্তেজিত করেছে তাকে।

টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গের মেঝেতে ছুরিটা আমিই খুঁজে পেলাম। কয়েকবার করে যাতায়াত করেছি এখান দিয়ে, তখন তো চোখে পড়েনি! তারমানে আমরা আজ ঢোকার পর কেউ এসেছিল, ফেলে গেছে।

'কে হতে পারে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা।

'দুই পোচার ছাড়া তো আর কারও কথা ভাবতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'সকাল বেলায়ই সন্দেহ হয়েছিল আমার, সে জন্যেই দরজাটা লাগিয়ে গেছি। তারমানে ওরা কোন কারণে এসেছিল এখানে।'

একটা কথা মনে হলো আমার, 'আচ্ছা, আমাদের পিছু নিয়ে আসেনি তো?'

'কেন আসবে?'

'হতে পারে, ওরাও সন্দেহ করে বসেছে, পাতালশহর আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা।'

'তা পারে। এখান পর্যন্ত এসেছিল, দরজাটা বের করতে পারেনি, তাই ফিরে গেছে।'

'ভাগ্যিস আজ দরজাটা লাগিয়ে রেখেছিলে!'

'আমার কি মনে হয় জানো,' মুসা বলল, 'ব্যাটারা লুকিয়ে থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে। আর বোধহয় দেরি করা উচিত না আমাদের। আংকেলকে সব বলা দরকার।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এখনও সময় হয়নি। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে খবরের কাগজ আর টেলিভিশনের লোক। ছুটে আসবেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করা হবে এটাকে। পুলিশ পাহারা বসবে। আমাদেরকেই তখন আর ঢুকতে দেয়া হবে না। মূর্তিটা খুঁজে বের করা আর হবে না আমাদের। যত যা-ই ঘটুক, ওটা বের করার আগে কাউকে জানাতে রাজি নই আমি।'

'কিন্তু আবার যদি আমাদের পিছু নেয় ব্যাটারা?'

'আরও সাবধান হব। এবার তো বুঝে গেলাম, যে ওরা আমাদের পিছু ছাড়েনি।'

রাতের খাওয়ার পর বারান্দায় আলোচনায় বসলাম আমরা। ঝিরঝিরে চমৎকার হাওয়া বইছে। নীল পাহাড়ের চূড়াটা অন্ধকার। তারার আলোয় খুব আবছা ভাবে চোখে পড়ছে ওটার আকৃতি। আকাশ ভরা তারার মেলা। অনেক বড় আর উজ্জ্বল সেগুলো, শহরের আকাশে এ রকম দেখা যায় না। কোন কোনটাকে

তো মনে হচ্ছে এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

আংকেল আর আন্টি শুয়ে পড়েছেন। রান্নাঘরে খুটখাট করছে ছমির আলি। নিচু গলায় কথা বলতে লাগলাম আমরা। আমাদের আলোচনাটা মূলত থেলিয়ার মূর্তি নিয়ে।

কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস, সাধারণ কোন ঘরে রাখা হয়নি ওটা। কারণ, থেলিয়া ছিল রানী। বাস করত কোন প্রাসাদে, অন্যসব বাড়ির চেয়ে আলাদা কোন বাড়িতে। কাল গিয়ে ওরকম বাড়িই খুঁজে বের করতে হবে।'

কিন্তু পরদিন ওরকম বাড়ি একটাও চোখে পড়ল না আমাদের।

ভাবতে বসল কিশোর। ঘন ঘন কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার পর বলল, 'থেলিয়াকে শুধু রানীই নয়, হয়তো দেবীটেবী গোছের কিছু ভাবত নীল চোখেরা। আর দেবীর মূর্তিকে কোথায় রাখা হয়? কোন মঞ্চ, বেদি কিংবা কোন নিরাপদ জায়গায়। মঞ্চ আর বেদি তো কোথাও চোখে পড়ল না। বাকি রইল নিরাপদ জায়গা। সেই নিরাপদ জায়গাটাই খুঁজতে হবে এখন আমাদের...'

চিৎকার করে উঠলাম, 'জলপ্রপাত! দেয়ালটাতে অনেক খাঁজ আর ফোকর দেখেছি! গুহামুখও নজরে পড়েছে একটা...'

'ঠিক বলেছ!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ওখানেই আছে!' কারও কথার অপেক্ষায় না থেকে দৌড় দিল সে। আমরাও ছুটলাম।

সরু জায়গাটাতে ওঠার সময় অবশ্য তাড়াহুড়ো করলাম না আমরা। পা পিছলে পানিতে পড়ে মরতে চাই না।

গুহামুখটা বেশি বড় না। হামাগুড়ি দিয়ে একজনের পেছনে আরেকজন ঢুকে পড়লাম। মুখটা যতটা সরু, ভেতরে ততটাই চওড়া একটা গুহা। আর গুহার একধারে একটা পাথরের বেদিতে দাঁড়িয়ে আছে সোনার মূর্তি। ফুট তিনেক উঁচু। সুন্দর চেহারা। দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া, নিখুঁত করে তৈরি।

পুরো একটা মিনিট হাঁ করে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

তারপর নীরবতা ভাঙল মুসা, 'এত সুন্দর!'

'হ্যাঁ,' যেন ঘোরের মধ্যে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'খুব সুন্দর!...কিন্তু এটাকে বের করব কি করে? এই সাইজের একটা সোনার মূর্তির সাংঘাতিক ওজন হবে।'

'নেয়ার দরকার কি? এখানেই ফেলে যাই। আমাদের কাজ শেষ, সব আবিষ্কার করে ফেলেছি। এখন গিয়ে শুধু খবরটা দেব।'

'ফেলে যাওয়া যাবে না। পোচারদের বিশ্বাস নেই। ওরা ঢুকে পড়তে পারে। দেখলে আর রাখবে না...'

এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে হাত রাখল কিশোর। দু-হাতে জাপটে ধরে টেনে তুলে কতটা ওজন বোঝার চেষ্টা করল।

আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে সহজেই তার হাতে উঠে এল ওটা। সোনার এতবড় একটা মূর্তির ওজন এতটাই বেশি হওয়ার কথা, তিনজনে মিলে তুলতেও হিমশিম খেয়ে যেতাম, আর একজনেই এত সহজে তুলে ফেলল! নিশ্চয় কোন গড়বড় আছে।

'নিরেট নয় এটা,' কিশোর বলল। 'ভেতরটা ফাঁপা।'

'ফাঁপা?' বিড়বিড় করল মুসা।

'হ্যাঁ। তা নাহলে এটা তোলার সাধ্য আমার হত না। ধরো, এটাকে বাইরে নিয়ে যাই। টর্চের ব্যাটারি খরচ না করে দিনের আলোয় দেখি।'

'ভেতরে কিছু ভরা নেই তো?'

'থাকতে পারে। অসম্ভব কি।'

'রত্নটত্ন কিছু?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

ধরাধরি করে মূর্তিটাকে বাইরে নিয়ে এলাম আমরা। নদীর চরায় এনে রাখলাম। ভেতরে কি আছে বের করতে সময় লাগল না। পায়ের নিচে একটা মুখ লাগানো। সেটা খুলতে ভেতরে একটা কুঠরি দেখা গেল।

'ঠিকই সন্দেহ করেছি,' বলতে বলতে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। হালকা কোন ধাতুর তৈরি একটা সিলিন্ডার বের করে আনল। ঝাঁকি দিতেই ভেতরে নড়ে উঠল কিছু। ভোঁতা শব্দ।

পানি তো বটেই, বাতাসও নিরোধক করে বানানো হয়েছে সিলিন্ডারটা, মুখ খুলতে বেশ বেগ পেতে হলো। বাড়ি দিতে কিংবা বেশি চাপাচাপি করতেও ভয়, ভেতরে কতটা নাজুক জিনিস আছে বোঝা যাচ্ছে না, যদি নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে।

কিশোরের আটফলার সুইস নাইফটা বেশ কাজে লাগল। কয়েকটা অতি জরুরী টুলস রয়েছে ওটাতে। ওগুলোর সাহায্যে অবশেষে মুখটা খুলে ফেলতে পারল সে। ভেতর থেকে বেরোল গোল করে গুটিয়ে রাখা কয়েকটা পার্চমেন্ট। তাতে খুদে খুদে অক্ষরে লেখা।

'দলিল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

'কি ভাষা?' গলা বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা, 'কিছুই তো পড়তে পারছি না। রবিন, তুমি কিছু বুঝছ?'

'নাহ,' মাথা নাড়লাম।

কিশোরও পড়তে পারছে না। একেবারেই অপরিচিত ভাষা। 'আমিও পারছি না,' বলল সে। 'নিশ্চয় এটাতে লেখা রয়েছে নীল চোখদের ইতিহাস। ওরা আসলে কোন জাতি, কি নাম, কোথা থেকে এসেছে, সঅব···সোনার চেয়ে দামী এটা।'

'সিলিন্ডারেই রেখে দাও,' মুসা বলল। 'তাহলে নষ্ট হবে না।'

'ঠিক। মূর্তিটা সহ এটা বের করে নিয়ে যাব কটেজে···'

'নেবে কি করে? লোকে দেখে ফেলবে না? সোনা চিনে ফেললে মুশকিল···' বলতে গেলাম।

'দেখবে না। বুনোপথটা ধরে চলে যাব। এক কাজ করতে পারি, মুসার শার্টটা অনেক বড়, এটা দিয়ে ঢেকেও নিয়ে যেতে পারি। তাহলে কেউ দেখে ফেলার আর ভয়ই থাকবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কটেজে নিয়ে যাব। আংকেলকে সব বলব। কেউ কিছু জেনে ফেলার আগেই পুলিশে খবর দিতে হবে। নইলে রাখতে পারব না, ঠিক এসে লুট করে নিয়ে যাবে গুণ্ডাপাণ্ডারা।'

'বসে থেকে আর লাভ কি?' গা থেকে শার্ট খুলতে আরম্ভ করল মুসা। 'চলো, বেরিয়ে যাই। আমাদের আবিষ্কার করার মত আর তো কিছু নেই।'

'না নেই। চলো।'

ভাবলাম, সব কিছু ভালয় ভালয়ই কাটল। কিন্তু মস্ত ভুল করেছি। পাথরের দরজাটা খুলতেই মুখের ওপর এসে পড়ল টর্চের আলো। বিমূঢ় ভাবটা কাটার আগেই শোনা গেল খিকখিক হাসি, জলিল বলল, 'কি রে ফটিক, বলেছিলাম না, বিচ্ছুগুলো ওপাশেই আছে।'

চারজন রয়েছে এখন ওরা। অন্য দু-জনকেও চিনি, সেদিন যারা আমাদের পেছন পেছন এসেছিল। বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব? চারজন জোয়ান লোকের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। খেঁক খেঁক করে উঠল চিতা, তাকে থামাল মুসা।

'তারপর,' আমাদের বলল জলিল, 'সত্যিই তাহলে শহরটা বের করে ফেললে। বিচ্ছু হলেও কাজের বিচ্ছু তোমরা, স্বীকার করতেই হচ্ছে।...হাতে ওটা কি? সোনার মনে হচ্ছে? মূর্তি নাকি?'

শার্ট দিয়ে ঢাকলেও পুরোটা ঢাকা পড়েনি, খানিকটা বেরিয়েই আছে মূর্তিটার। সেটা দেখে বলল জলিল।

'জানলেন কি করে এখানে আছি?' গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'নিশ্চয় নজর রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা আমারই। কি জানি কেন, মনে হচ্ছিল শহরটা পেয়েও যেতে পারো তোমরা। ফটিকটা তো বিশ্বাসই করতে চায়নি। শেষে কোরবান আর হাফিজকে লাগালাম তোমাদের পেছনে, নজর রাখার জন্যে, কখন কি হয় না হয়, আমাদের জানাতে বললাম ওদেরকে। আমরা সামনে আসিনি, চেনা হয়ে গেছি, তা ছাড়া পুলিশকে খবর দিয়েছ কিনা তা-ও বুঝতে পারছিলাম না। ওদিকে ছমির আলির কাছে জানলাম, তার মনিব, অর্থাৎ তোমাদের আংকেল পুলিশের বড়কর্তা ছিল। দেখা দিয়ে কে যায় বিপদে পড়তে।'

নামের সেই বিকৃতি এবারেও—কোরবানকে বলল কোরবাইন্না, আর হাফিজকে হাফিজ্জা।

চুপ করে আছি আমরা। কি বলব? শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে তীরে এসে তরী ডুবল।

'যাই হোক,' হেসে বলল আবার জলিল, 'মূর্তিটা বের করে এনে একটা কাজের কাজই করেছ। বনেবাদাড়ে ঘুরে জানোয়ার মারার দিন শেষ হলো। উফ্, আর সহ্য হচ্ছিল না! জঘন্য! পেটের দায়ে কত কিছুই যে করতে হয় মানুষকে!'

তবু চুপ করে রইলাম। আমাদের বলার কিছু নেই।

ফটিক বলল, 'এতসব বকবক করার কি দরকার। চল্, কাজ সেরে ফেলি। শহরটা যখন পেয়েছে, আমার ধারণা আরও অনেক সোনা আছে ওখানে। নিয়ে আসি।' আমাদের বলল, 'এই, ঘোরো। কোথায় আছে ওগুলো দেখাও।'

কিশোর বলতে গেল, 'আর নেই...'

কিন্তু ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়া হলো, 'বললেই হলো আর নেই! চলো চলো।'

কি করব? আবার বেরিয়ে এলাম উপত্যকায়।

নীলাভ আলোয় নদীর ওপারের শহরটা দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলোও। বিস্মিত হয়ে গেছে আমাদেরই মত। হওয়ারই কথা। পাহাড়ের নিচে ও রকম একটা শহরের কল্পনাই করা যায় না।

নদীর ওপারে কি করে যেতে হয়, ওরাও বুঝতে পারল না। আমাদেরকে বাধ্য করল নিয়ে যেতে। ওদের ধারণা, ওই বাড়িঘরগুলো ধনরত্নে বোঝাই।

মুসার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরতে চায়। আর চিতা তো কেবল আদেশের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু ইশারায় ও রকম বোকামি করতে মানা করল মুসাকে কিশোর। চার-চারজন লোকের বিরুদ্ধে গায়ের জোরে কিছু করতে পারব না আমরা।

হাঁটতে হাঁটতে ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে, 'দেখুন, এখানে যা আছে নষ্ট করাটা একদম উচিত হবে না। এগুলো কতবড় আবিষ্কার জানেন? সাড়া পড়ে যাবে। ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে যাবে জায়গাটা। আপনাদেরই তো এলাকা।'

হেসে উঠল জলিল। 'নষ্ট করব কে বলল তোমাকে? একটা জিনিসও নষ্ট করব না। কেবল সোনাদানা যা পাওয়া যায়, নিয়ে চলে যাব। ট্যুরিস্টদের কোন কাজে লাগবে না ওসব জিনিস, কিন্তু আমাদের লাগবে।'

বোঝানো বৃথা। চুপ হয়ে গেল কিশোর।

কিন্তু মুসা আর চুপ থাকতে পারল না। এত কষ্ট করে জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছি, ছিনিয়ে নেবে কয়েকটা ছিঁচকে চোর, সহ্য হলো না তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল জলিলের ওপর। খাউ খাউ করে গিয়ে চিতাও আক্রমণ করে বসল।

আমি আর কিশোর কিছু করার আগেই মুসাকে কাবু করে ফেলল ওরা। হাত মুচড়ে ধরে পেছনে নিয়ে এল। চিতার মাথায় পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলেছে ফটিক।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জলিল বলল, 'এইবার মাপ করে দিলাম। আর যদি এ রকম করো, সোজা পানিতে ফেলে দেব। চিহ্নও কেউ খুঁজে পাবে না তোমাদের।'

কিছু করলাম না আমরা। মুসাকে তো আগেই বারণ করেছিল কিশোর।

তবে মারের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ল না চিতা। জলপ্রপাতের নিচ দিয়ে চলেছি আমরা, এই সময় হুঁশ ফিরল তার। কখন যে উঠল, কিছু বুঝতে পারলাম না। নিঃশব্দে পেছন থেকে এসে চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ফটিকের ওপর। পড়ার আগে শুধু ঘাউ করল একবার।

এ রকম কিছুর জন্যে মোটেও সাবধান ছিল না ফটিক। ধাক্কা সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে গেল সামনের দিকে। পা গেল পিছলে। পড়ে গেল পানিতে।

নয়

পড়ার আগে চিৎকার করেছিল বোধহয়, কিন্তু পানির গর্জনে কিছুই শুনতে পাইনি। পড়েই ডুবে গেল। খানিক পরে ভেসে উঠল, তবে অনেকটা দূরে। চোখের পলকে চলে গেছে ওখানটায়। তীরের কাছে সাঁতরে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যেতে পারবে না। ভীষণ বিপদে পড়েছে।

এ পাশের চরায় নেমে চলে এসেছি আমরা। তাকিয়ে আছি।

চিৎকার করে বলল মুসা, 'সাংঘাতিক স্রোত! পারবে না তো!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জলিলের মুখ। বোকা হয়ে গেছে যেন তার দুই সহচর। কি যে করবে কেউ কিছু ভেবে বের করতে পারছে না।

চেঁচিয়ে উঠল জলিল, 'মরবে ও, মরে যাবে তো! সাঁতারও ভাল জানে না! কিছু করা দরকার!'

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি আমি আর কিশোর। একটা দড়ি হলে সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু পাব কোথায়? একটা ডাল হলেও হত, কিন্তু এখানে গাছই নেই, ডাল আসবে কোত্থেকে?

ওদিকে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চলে যাচ্ছে ফটিক। তীর ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াচ্ছে জলিল আর অন্য দু-জন।

মুসাও ছুটছে। তার পাশে চিতা।

পানি থেকে বেরিয়ে আছে অনেক পাথরের চাঙড়। ফটিকের ভাগ্য ভাল, একটা পাথরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ধরে ফেলতে পারল ওটাকে। কিংবা বলা যায়, পানিই তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলল ওটার ওপর। সে শুধু সময় মত ধরে ফেলল। কিন্তু স্রোতের যে টান, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

পানির কিনারে ছুটে গেল মুসা। শার্ট আগেই খুলেছে মূর্তিটা ঢাকার জন্যে, টান দিয়ে দিয়ে খুলে ফেলতে লাগল প্যান্টের বেল্ট, চেন। উবু হয়ে জুতো খুলল। তার উদ্দেশ্য বুঝে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'না, মুসা, না, পারবে না!'

কিন্তু একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল না মুসা। শুধু জাঙ্গিয়া পড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। খুব ভাল সাঁতারু সে, ওর মত সাঁতরাতে আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। কিন্তু এখানকার স্রোত যেন পাত্তাই দিল না তাকে। টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সে-ও সহজে পরাস্ত হতে চাইল না। জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করতে লাগল স্রোতের বিরুদ্ধে।

এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। বুঝতে পারছি না, মুসাকে হারাতেই চলেছি কিনা। পাগল হয়ে গেছে যেন কিশোর। কিছু একটা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু কিছুই করার নেই। আর আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি।

কিন্তু আমাদের মত চুপ করে থাকল না চিতা। মুসাকে সে ভীষণ ভালবাসে। সে-ও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। একটা কায়দা করল, স্রোতের দিকে মুখ করে সাঁতরে এগোল। অবাক হয়ে দেখলাম, তাতে স্রোতের চাপ কম লাগছে। মুসার চেয়ে ভাল এগোতে পারছে সে।

চিৎকার করে সেই কথা মুসাকে জানাতে গেল কিশোর।

তার কথা বুঝল কিনা মুসা বুঝলাম না, তবে চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল। চিতাকে সাঁতরে এগোতে দেখল। বুঝে ফেলল সে-ও। দু-একবার চেষ্টা করেই ধরে ফেলল কায়দাটা। স্রোতকে পাশে রেখে আর এগোনোর চেষ্টা করল না।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে পাথরটার দিকে এগিয়ে চলেছে মুসা ও চিতা। বুঝলাম, জয়

ওদেরই হতে চলেছে। পৌঁছে গেল পাথরটার কাছে। ওটাকে জড়িয়ে ধরে জিরিয়ে নিতে লাগল মুসা। চিতা কাছাকাছি হতেই তাকেও ধরতে গেল, তবে ধরার প্রয়োজন পড়ল না। আশ্চর্য কৌশলে পাথরটায় শরীর ঠেকিয়ে দিয়ে স্রোতের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে লাগল কুকুরটা।

গেল তো, কিন্তু এখন আসবে কি করে? তা ছাড়া গেছে একা, ফিরতে হবে এমন একটা লোককে নিয়ে যে সাঁতারও জানে না ভালমত। রীতিমত একটা বোঝা, টেনে আনা সহজ কথা নয়।

এই সময় যেন বোধোদয় হলো জলিলের। কয়েক টানে সে-ও জামাকাপড় খুলে ফেলল। ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। ভাল সাঁতার জানে, সাঁতরানো দেখেই বুঝলাম। মুসা আর চিতা কি করে এগিয়েছে, দেখেছে সে। স্রোতের সঙ্গে লড়াই করার কায়দাটা জেনে ফেলেছে।

জলিলও পৌঁছে গেল পাথরের কাছে। আশা হলো আমাদের। অনেক চেষ্টা করেছে স্রোত, কিন্তু তিনজনের কাউকেই ভাসিয়ে নিতে পারেনি যখন, ফটিককে বাঁচানো যেতেও পারে।

বাঁচানো গেল ঠিকই, কিন্তু যে কসরতটা করতে হলো মুসা, জলিল আর চিতাকে, সেটা বলে বোঝানো যাবে না। অনেক কষ্টে ফটিকের প্রায় অবশ দেহটাকে নিয়ে তীরে উঠল ওরা, নিরাপদেই। বালিতেই শুয়ে পড়ল জলিল আর মুসা। চিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

আমি আর কিশোর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম চিত হয়ে পড়ে থাকা ফটিকের পাশে। জলে ডোবা মানুষকে কি ভাবে সেবা করে চাঙা করতে হয় জানি, সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। কোরবান আর হাফিজও এসে বসল পাশে।

অবশেষে অনেকটা সুস্থ হলো ফটিক। কথা বলতে পারল। জড়িত গলায় কেবল বলল, 'হয়েছে…আর লাগবে না…'

উঠে বসল মুসা।

তার দিকে তাকিয়ে জলিল বলল, 'এই পাগলামিটা কেন করতে গেলে? মরতেও পারতে, জানো?'

'মানুষকে বাঁচাতে যাওয়াটা পাগলামি নয়,' ভোঁতা গলায় জবাব দিল মুসা।

একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিল জলিল, 'তোমার মত মানুষ আমি দেখিনি আর। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে…' আনমনে মাথা নাড়তে লাগল সে, 'একটা শিক্ষা দিলে আজ আমাকে…' অবাক হলাম তার কথা শুনে; অশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায় বলছে না আর, পরিষ্কার শুদ্ধ বাংলা, লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই কেবল এ ভাবে বলা সম্ভব।

আরও কিছুক্ষণ পর। ফটিক পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঘড়ি দেখল কিশোর। সন্ধে প্রায় হয় হয়। বলল, 'আর কত বসে থাকব?'

'না, আর থাকব না,' উঠে দাঁড়াল জলিল। 'চলো, তোমাদের পৌঁছে দিই। মূর্তিটা একা নিতে পারবে না তোমরা।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলতে গেলাম, 'তার মানে…তার মানে আর নিচ্ছেন না…'

হাসল জলিল, 'লজ্জা দিও না আর। তোমাদের পরিচয় কি, জানি না। কিন্তু আজ যে শিক্ষা তোমরা আমাদের দিলে, তারপরেও কি আরও অন্যায় কাজ করব ভেবেছ?'

কাহিনী শেষ। অহেতুক আর টেনে লম্বা করে লাভ নেই। প্রিয় কিশোর বন্ধুরা, এরপর কি কি ঘটল নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ তোমরা। পুলিশ জানল, সাংবাদিক, বিজ্ঞানীরা এল হুড়াহুড়ি করে, বিখ্যাত হয়ে গেল অশোক তরু গ্রাম। আর আমাদের সে কি কদর। গোপনে তোমাদেরকে একটা কথা বলেই ফেলি, গর্ব হয়েছে বৈকি আমাদের; গর্বে মাটিতে পা পড়ে না যে, অনেকটা সেই অবস্থাই।

আর দু-চারটা কথা বলেই শেষ করছি। কৌতূহলের মধ্যে রাখব না তোমাদের। হয়তো ভাবছ, জলিলরা কারা, কি করেই বা এল ওই পাহাড়ী গ্রামে, তাই না? ওরা আসলে চার বন্ধু, কলেজে পড়ত, চারজনেরই নানা রকম পারিবারিক অসুবিধা আর জটিলতা ছিল, ফলে মাস্তান হতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর আর কি? এক ভয়াবহ অন্ধকার, অস্বস্তিকর. অশান্তির জীবন। মানুষের তাড়া, পুলিশের তাড়া, কত আর সওয়া যায়? অন্ধকার রাতে এক ব্যবসায়ীকে ছুরি মেরে বসল একদিন। তারপর চিটাগাঙ শহর ছেড়ে পালাল। লুকাল গিয়ে ওই পাহাড়ী গ্রামে। ওরা জানত না, লোকটা মারা যায়নি। পুরো তিনদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি করে শেষে বেঁচে গিয়েছিল ব্যবসায়ী।

চৌধুরী আংকেলকে কথা দিয়েছে ওরা, ভাল হয়ে যাবে, আর অপরাধ করবে না। তিনিও ওদেরকে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে আগে পুলিশের কাছে ধরা দিতে হবে।

বাকি রইল মনিকা। তার কি হলো, সেটা জানারও নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে তোমাদের?

দাঁড়াও, বলছি। তেমুলকা তো এসে দখল করল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। মূর্তিটার কথা জিজ্ঞেস করল। দরাদরি শুরু করল কিশোর; বলল, ওটা তো দেবেই, মাটির নিচে খুঁড়ে পাওয়া সমস্ত জিনিসই দিয়ে দেবে, তবে এক শর্তে। মনিকার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে।

অসাধারণ মেধাবী একজন ছাত্রীর ভার নিতে কোন আপত্তি নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়ে গেল।

বাকি রইল হারাণ মুচি। সে কিছুতেই অশোক তরু ছেড়ে যেতে রাজি হলো না। ওখানেই রইল, মুচির কাছে ব্যস্ত, ধ্যানমগ্ন এক ঋষি। আপনমনে জুতো মেরামত করে। একটিবারের জন্যেও তার পূর্বপুরুষদের শহরটা দেখতে গেল না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছি, যায় না কেন? কোন আগ্রহ কি নেই? গম্ভীরভাবে একবার মুখ তুলে জবাব দিয়েছে, 'জানিই তো কি আছে। নতুন আর কি দেখতে যাব?'

****

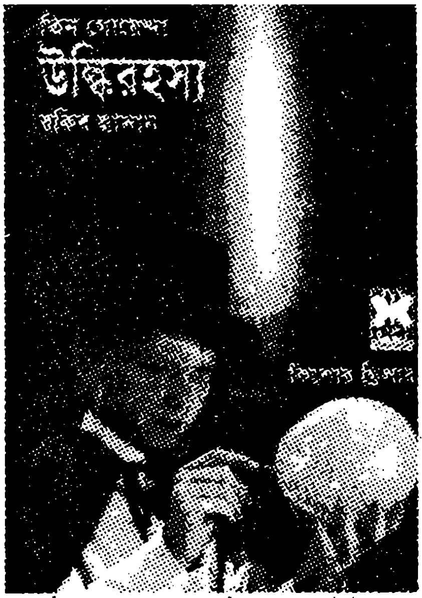

উল্কিরহস্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

ছবিটার দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল রবিন।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি হলো?'

'দেখো,' ছবিটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল রবিন। মেরিচাচী দিয়েছেন। ডাকে আসা চিঠিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা খামের ভেতর থেকে ছবিটা পেয়েছেন। দেখতে দিয়েছেন রবিনকে।

কিশোরও তাকাল ছবিটার দিকে। চাঁদিতে বাদামী রঙের হালকা কিছু চুল, মুখ ভর্তি ফুরফুরে দাড়ি।

'এ তো একটা ভাঁড়!'

'আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে এ ভাবে কথা বলা উচিত না,' টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে বললেন মেরিচাচী। হাসি লুকানোর চেষ্টা করলেন তিনিও।

'আত্মীয়!' ছবিটার দিকে ভাল করে নজর দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, ফ্রেড ওয়ালকিন,' চাচী বললেন, 'আমার দূর সম্পর্কের খালাত ভাই। চিঠি লিখেছে। দেখা করতে আসবে।'

আসার কথা শুনে আগ্রহ আরও বাড়ল কিশোরের, 'কই, কোনদিন তো তার নাম শুনিনি?'

'আমার আত্মীয় কতজনেরই তো নাম শুনিসনি। তাতে কি? তবে এই বিশেষ মানুষটির কথা তোকে বলা উচিত ছিল আমার। সেই যে তিরিশ বছর আগে সাগরে পাড়ি জমাল, তারপর থেকে পরিবারের কারও সঙ্গে আর দেখা হয়নি ওর।'

'তিরিশ বছর!'

'হ্যাঁ। দু-চারখানা চিঠি দিয়েছে, ব্যস। আমাকে খুব পছন্দ করে। তাই আমেরিকায় ফিরে আমার সঙ্গেই প্রথমে দেখা করতে আসছে।'

রবিনও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বলল, 'দারুণ হবে! চুটিয়ে সাগরের গল্প শোনা যাবে।'

ফ্রেড ওয়ালকিনের চিঠিটা দেখিয়ে চাচী বললেন, 'লিখেছে, হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই আসবে।'

ছবিটার কথা বলল কিশোর, 'এটা থাক আমার কাছে। মুসাকে দেখাব।' বলেই হেসে ফেলল আবার। 'যা চেহারা-সুরৎ করে রেখেছে! হেসেই মরে যাবে মুসা!'

মেরিচাচীও হাসলেন। 'দেখ, ওকে নিয়ে তোদের হাসাহাসিগুলো আগেই সেরে রাখ। ও এলে সামনে আর হাসবি না বলে দিলাম। মাইন্ড করতে পারে।'

মেরিচাচীর হাসিটা সংক্রামিত হলো রবিনের মাঝে। ছবির দিকে তাকিয়ে আবার হেসে উঠল ও। কিশোরও হাসতে লাগল।

এই সময় কলিং বেল বাজল। হাসি বন্ধ হলো ওদের।

দরজা খোলার জন্যে উঠতে গেল কিশোর, কিন্তু তার আগেই বসার ঘরে গিয়ে খুলে দিলেন মেরিচাচী।

নিজের নাম বললেন আগন্তুক—বুমার। পরিচয় দিলেন কারনিভালের মালিক বলে, শুনতে পেল দুই গোয়েন্দা। মুহূর্তে উঠে রওনা হয়ে গেল বসার ঘরে।

লম্বা মানুষ বুমার, হাসি হাসি চোখ, লালচে রঙের গাল। বললেন, 'আমি তিন গোয়েন্দার খোঁজে এসেছি। গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের কাছে নাম শুনেছি ওদের।'

ইঙ্গিতে কিশোরকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মেরিচাচী।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড। মুসা আপাতত নেই। আপনি বসুন। মিস্টার সাইমন কি বলেছেন আপনাকে?'

হাত মেলালেন বুমার। 'তোমাদের অনেক প্রশংসা করে বলেছেন আমাকে সাহায্য করতে পারবে তোমরা। এখানে আসার আগে ছয়টা শহরে যেখানেই খেলা দেখিয়েছি, পকেটমারের শিকার হয়েছি আমরা। ব্যবসার জন্যে এটা খুব খারাপ, বদনাম হয়ে যায়। দর্শক আসতে চায় না। চোরগুলোকে ধরে দেয়ার জন্যে মিস্টার সাইমনের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি খুব ব্যস্ত, তাই তোমাদের কাছে পাঠালেন। বললেন, এ কাজ তোমরাই করে দিতে পারবে।'

রবিনের দিকে তাকাল একবার কিশোর। 'চেষ্টার ত্রুটি করব না আমরা, মিস্টার বুমার। কিসের খেলা দেখান আপনারা?'

'কারনিভাল।'

বেশি কথা বললেন না বুমার। তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করে ফেললেন। রোজ তিনটায় খোলে কারনিভাল—জানিয়ে দিয়ে, উঠে চলে গেলেন।

মুসাকে খবর দিল কিশোর। বাড়িতে কাজে ব্যস্ত ছিল সে, কারনিভালের নাম শুনে লাফিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে এল। দুপুরের খাওয়া সারল কিশোরদের বাড়িতে। তারপর রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে।

ঘটনার কিছুই জানে না মুসা। বলার সময়ও পায়নি কিশোর। এখন বলল, 'ভালই হলো। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। বুমারের চোরের সন্ধানও করা যাবে, রহস্যময় সেই ইনফর্মারের ব্যাপারেও তদন্ত করা যাবে।'

হাঁ করে তার দিকে তাকাল মুসা, 'খাইছে! গ্রীক বলছ নাকি? না মঙ্গল গ্রহের ভাষা?'

সব খুলে বলল তাকে কিশোর—সেদিন সকালেই ভিকটর সাইমনের সঙ্গে দেখা করেছে ওরা, সে আর রবিন। সকাল বেলা ওঅর্কশপে বসে কাজ করছিল দু-জনে, এই সময় এল সাইমনের ফোন—সময় করে দেখা করার অনুরোধ জানালেন। নিশ্চয় কোন কেস, ভেবেছে কিশোর, রবিনকে নিয়ে তখনই দৌড়েছে সাইমনের বাড়িতে।

কোন রকম ভূমিকা না করে সাইমন বললেন। 'একজন লোককে খুঁজে বের করতে হবে, যদি সম্ভব হয়।'

‘কে সে?’ জানতে চাইল রবিন।

লোকটা কে বলতে গিয়ে হাতির দাঁতে তৈরি একটা মূর্তির গল্প বললেন সাইমন। চীনের মিং রাজাদের আমলে তৈরি। বছর দশেক আগে হং কং-এর আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতিমান আর্ট কালেক্টর ডেভিড টিয়ানের সংগ্রহশালা থেকে মূর্তিটা চুরি করে কয়েকজন জলদস্যু—বন্দরে জাহাজ ভিড়লে ডাঙায় নেমেছিল ওরা।

‘খবর পেয়েছি,’ সাইমন বললেন, ‘চুরি হওয়ার কয়েক মাস পরই মূর্তিটা চলে এসেছে আমেরিকায়। কিন্তু ওটাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। মাসখানেক আগে লস অ্যাঞ্জেলেসের এক আর্ট কালেক্টর ক্রিটার বেনসনের কাছে একটা চিঠি আসে। তাতে জিজ্ঞেস করা হয় মূর্তিটা কিনতে তিনি আগ্রহী কিনা।’

‘তারমানে বেরিয়েছে আবার মূর্তিটা?’ আগ্রহে গলা চড়ে গেছে রবিনের।

‘না, ঠিক বেরোয়নি। তাঁকে কেবল অফার দেয়া হয়েছে। মূর্তিটা নিলে এক লাখ ডলার দিতে হবে। আসল দামের চেয়ে এটা অনেক কম। আগাম দিতে হবে পঁচিশ হাজার ডলার। মূর্তিটা বের করে পৌঁছে দেয়ার খরচ আছে, সে-জন্যে চাওয়া হয়েছে টাকাটা।’

‘চিঠিটা কে দিয়েছে?’ কিশোরের প্রশ্ন।

‘ঠিকানা দেয়নি। নিচে নাম সই করেছে ব্ল্যাকরাইট। ক্রিটার বেনসন সৎ লোক, সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড টিয়ানকে খবর দিয়েছেন। টিয়ান তখন আমেরিকান পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন। একই সঙ্গে আমাকেও ধরেছেন মূর্তিটা বের করে দেয়ার জন্যে।’

‘কোন সূত্র পাওয়া গেছে?’ জানতে চাইল রবিন।

‘গেছে। গতরাতে একজন ইনফর্মার পুলিশকে ফোন করে বলেছে ব্ল্যাকরাইটের ব্যাপারে তথ্য দিতে পারবে সে। কিন্তু বিনিময়ে টাকা দাবি করেছে অনেক বেশি। আরও বলেছে, ব্ল্যাকরাইট ধরা পড়লে পুরস্কার হিসেবে মোটা টাকা দিতে হবে তাকে।’

‘হুঁ, লোভী লোক,’ মন্তব্য করল কিশোর।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সাইমন বললেন, ‘ফোনটা করা হয়েছে কোত্থেকে জানো? রকি বীচ।’

‘তাই নাকি?’ ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন।

‘হ্যাঁ। শহরের বাইরে অনেক বড় পতিত জায়গাটা যে আছে—কারনিভাল কিংবা সার্কাস এলেই যেখানে আড্ডা গাড়ে, তার উত্তর দিকের একটা ফোন বুদ থেকে করেছে।’

কিশোর বলল, ‘ডেমন’স ল্যান্ডের কথা বলছেন? ভূত দেখা যায় বলে গুজব আছে যেখানে?’

‘হ্যাঁ।’

‘পেপারে দেখলাম গতকাল একটা কারনিভাল পার্টি এসে আস্তানা গেড়েছে ওখানে। আজ থেকে খেলা দেখাবে। অনেক লোকের আনাগোনা এখন ওই জায়গায়। কে ফোন করেছে বের করা কঠিন হবে।’

‘তা হবে। আমার বিশ্বাস, কারনিভালেরই কোন লোক, ওখানে খুঁজলে পাওয়া

যাবে।'

'তারমানে আমাদেরকে কারনিভালে গিয়ে খোঁজ নিতে বলছেন?'

'যদি কোন অসুবিধে না থাকে তোমাদের।'

'না, অসুবিধে নেই।'

'যেখানে টাকার গন্ধ, সেখানে বিপদও বেশি, অতএব সাবধান। তেমন বুঝলে সরে চলে আসবে। বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

হাসল কিশোর। 'বিপদ কি আর আমাদের জন্যে নতুন? তবু, বলছেন যখন, সাবধানে থাকব...'

'ডেমন'স ল্যান্ডে এসে গেছি।'

রবিনের কথায় ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল কিশোর।

একটা খোলা জায়গায় আরও কিছু গাড়ির সঙ্গে গাড়ি রাখল রবিন। কারনিভাল মানেই প্রচুর হই-হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি, খাবারের সুগন্ধ; এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। চিৎকার করে আনন্দ-উল্লাস করছে লোকে, নাগরদোলা ঘুরছে শব্দ করে। একপাশে ভিড় কিছু কম, সেদিকের গেটের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

গেটে টিকিট চেক করছে ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় এক তরুণ। মোটাসোটা শরীর।

তার কাছে গিয়ে হেসে বলল কিশোর, 'আমার নাম কিশোর পাশা। মিস্টার বুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

পথ আটকাল মোটা তরুণ, 'কিশোর পাশা হয়েছ তো কি হলো? দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছ? প্রেসিডেন্ট হলেও টিকিট লাগবে।'

কেন এসেছে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, কানেই তুলল না লোকটা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'সরো!'

অধৈর্য হয়ে উঠল কিশোর। রবিন আর মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমার বন্ধুদের রেখে যাচ্ছি। মিস্টার বুমারকে সব বলব, তিনি ওদের ঢোকার ব্যবস্থা করবেন।'

পাশ কাটাতে গেল কিশোর। খপ করে তার শার্টের কলার ধরে ফেলল টিকিট চেকার। হ্যাঁচকা টানে মাটিতে চিত করে ফেলে পা তুলল লাথি মারার জন্যে।

মুসার আর সহ্য হলো না। জুডোর প্যাঁচ মেরে টিকিট চেকারকেও মাটিতে ফেলে দিল।

গাল দিয়ে উঠল চেকার। উঠে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল 'হে রুবি' বলে।

এই চিৎকারের মানে জানা আছে দুই গোয়েন্দার। কারনিভালের লোকেরা বিপদে পড়লে কিংবা গোলমাল দেখলে 'হে রুবি' বলে চিৎকার করে। সাহায্য করার লোক তৈরিই থাকে। শোনা মাত্র দৌড়ে আসে।

থমকে গেল তিন গোয়েন্দা। এই সুযোগে মুসাকে ঘুসি মারল চেকার।

আবার চিৎকার করে উঠল টিকিট চেকার, 'হে রুবি!'

দুই

ঘুসির জবাব দিতে মুসাও ছাড়ল না। মাটিতে ফেলে দিল আবার চেকারকে। রুক্ষ চেহারার কয়েকজন লোককে ছুটে আসতে দেখল কিশোর। চিৎকার করে হুঁশিয়ার করল মুসাকে।

লোকগুলোও দেখে ফেলল ওদের। 'ওই যে ব্যাটারা, ধরো, ধরো! স্ট্রেচকে মেরে ফেলল!' চেঁচিয়ে উঠল ওদের দলপতি।

কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। হাত গুটিয়ে মার খাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই। তবে মারামারি করার আগে শেষ চেষ্টা করল কিশোর, 'শুনুন! আমরা গোলমাল করতে আসিনি!'

কে শোনে কার কথা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ওদেরকে মারতে উদ্যত হলো লোকগুলো, এই সময় শোনা গেল কঠিন আদেশ, 'থামো! একটা ঘুসি কেউ মারলে বেঁধে থানায় নিয়ে যাব!'

থেমে গেল লোকগুলো। ফিরে তাকাল। গোয়েন্দারাও অবাক হলো পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে দেখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পুলিশের সামনে গণ্ডগোল করার সাহস হলো না লোকগুলোর। তবে সরেও গেল না।

ওদের ঘেরের মধ্যে ঢুকলেন চীফ।

'স্যার, আপনি!' জোরে জোরে দম নিচ্ছে রবিন।

'দেখতে এসেছিলাম সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কারনিভালে গোলমাল হয়ই। তা ব্যাপার কি? ওরা এমন খাপ্পা হয়ে উঠেছে কেন তোমাদের ওপর?' জানতে চাইলেন চীফ।

বলল কিশোর।

উঠে দাঁড়িয়েছে স্ট্রেচ বিটার।

কিশোরের কথা শুনে তার পক্ষই নিলেন চীফ।

সন্দেহ গেল না দলপতির। খানিকক্ষণ দ্বিধা করে বলল, 'মিস্টার বুমার আসতে বলে থাকলে তো ঠিকই আছে। অযথা গোলমাল করে ফেললাম, সরি!'

বিটার অত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না, কারণ তার পেটের ব্যথা সারেনি। আঙুলের মাথা এক করে কারাতের প্রচণ্ড খোঁচা মেরেছে ওখানে মুসা। মুখ বিকৃত করে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল সে।

তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'সরি, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে তো বলেইছিলাম মিস্টার বুমার আমাদের আসতে বলেছেন।'

হাত মেলাল না বিটার। আবার গিয়ে দাঁড়াল তার আগের জায়গায়।

'মাথাটা ওর গরম হয়ে আছে,' নিচু স্বরে বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন চীফ, 'ওর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

চীফকে ধন্যবাদ জানিয়ে কারনিভালে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। এবার আর বাধা দিল না বিটার, তাকালও না ওদের দিকে। ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে কারনিভালে। নাগরদোলাটার কাছে চলে এল কিশোররা।

ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্দেহজনক আচরণ করে কিনা কেউ, দেখার আশায় কড়া নজর রাখতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে তার নতুন হবির কথা দুই বন্ধুকে জানাল মুসা। মাঝে মাঝেই তার মাথায় নতুন কিছু করার শখ চাপে। কয়েক হপ্তা সেটা থাকে, তারপর চলে যায়। এইবার চেপেছে—স্ক্রিমশ।

স্ক্রিমশ হলো তিমি আর সিন্ধুঘোটকের দাঁতকে ঘষে মসৃণ করে তার ওপর ডিজাইন কিংবা ছবি আঁকার, কিংবা খোদাই করে কোন জিনিসে রূপ দেয়ার বিদ্যা।

'এ এক দারুণ জিনিস, বুঝলে,' বকবক করতে থাকল মুসা, 'এই স্ক্রিমশ। এখন বুঝতে পারছি আগের দিনে তিমি-শিকারি নাবিকেরা কেন এ নিয়ে পড়ে থাকত। স্পার্ম তিমির একটা মাত্র দাঁতকে ঘষে কিছু তৈরি করতে লাগিয়ে দিত ছয় মাস সময়। আসলে করবেটাই বা কি? তিন-চার বছরের জন্যে বেরিয়ে যেতে হত সাগরে। শিকারের সময়টা বাদ দিলে অখণ্ড অবসর। সময় কাটানোর জন্যে কিছু তো একটা করা লাগে।'

লোনা জলে ভিজিয়ে কি করে দাঁতকে নরম করতে হয়, তারপর উখা দিয়ে ঘষে অসমান জায়গাগুলোকে সমান করার পর ঝামাপাথর দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে হয়, সবশেষে হাতের তালু দিয়ে ঘষে চাকচিক্য আনতে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল মুসা।

'এত ধৈর্য তোমার আছে?' খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কান দিল না মুসা। তার বকর বকর করতেই থাকল, 'খাঁজ কেটে ছবি আঁকতে হয় পাল সেলাই করার সুচ অথবা ছোট চাকু দিয়ে। ডিজাইন তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো স্পষ্ট করে তোলার জন্যে ব্যবহার করা হয় ইনডিয়া ইংক। আজকাল অবশ্য বিদ্যুতে চলা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লোকে, কিন্তু আমার ওসব ভাল্লাগে না। যা করব, হাতে করব, আদিম পদ্ধতিতে, সেটাই মজা।'

'কিশোরেরও একটা নতুন হবি তৈরি হয়েছে,' মুসাকে থামানোর জন্যে বলল রবিন। 'হারানো আত্মীয়দের ছবি সংগ্রহ করা।'

একটা মঞ্চের ওপরে খেলা দেখাচ্ছে একজন ভাঁড়, মারগো দ্য ক্লাউন। মঞ্চের কিনার দিয়ে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মুসা। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

ফ্রেড ওয়ালকিনের ছবিটা বের করে দেখাল কিশোর। কার ছবি, কবে আসবে জানাল।

হাসি ফুটল মুসার মুখে। তবে চেহারা দেখে নয়, আনন্দে। তার আশা, এতকাল যে নাবিক সাগরে সাগরে ঘোরে, স্ক্রিমশ সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে বাধ্য। ওর কাছ থেকে নতুন কিছু শেখা যাবে।

মাথার ওপরে কাশি শোনা গেল। মুখ তুলে গোয়েন্দারা দেখল ঝুঁকে ছবিটার দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে মারগো। ওদের কথা শুনছে। ওরা

তাকাতেই বলল, 'সরো। নামব। আমার খেলা দেখানো শেষ।'

সরে গেল তিন গোয়েন্দা।

লাফ দিয়ে নামল মারগো। তেরপলে ঢাকা একটা ছাউনিতে গিয়ে ঢুকল।

কিশোর বলল, 'খানিকটা খোঁজখবর করা দরকার। ভাঁড়কে দিয়েই শুরু করা যাক, কি বলো?'

দুই সহকারীকে নিয়ে মারগো যেদিকে গেছে সেদিকে এগোল সে।

খেলোয়াড়দের বিশ্রামের জন্যে তৈরি করা হয়েছে ছাউনিটা। কফির কাপ নিয়ে বসেছে মারগো। মুখে মাখা সাদা আর লাল রঙ, ঢোলা বিচিত্র পোশাক পরনেই আছে, কেবল টুপিটা খুলে রেখেছে।

পাশে বসেছে উল্কি-মানব হোগারফ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরে উল্কি দিয়ে আঁকা নানা রকম ডিজাইন আর অদ্ভুত সব ছবি। বুকে আঁকা একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঢেউয়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে বিশাল এক স্পার্ম তিমি, সেটাকে মারার জন্যে চারদিক থেকে নৌকা নিয়ে ঘিরে এসেছে তিমি শিকারিরা। হোগারফের পরনে সংক্ষিপ্ত সাঁতারের পোশাক।

নিজের আর দুই সহকারীর পরিচয় দিল কিশোর।

সহজ ভাবেই ওদেরকে নিল মারগো আর হোগারফ। কথা বলতে দ্বিধা করল না। কিন্তু ব্ল্যাকরাইটের নাম জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

কর্কশ স্বরে মারগো বলল, 'দেখো, ওই নামে কাউকে চিনি না আমরা। ওর সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না। এখন তোমরা আসতে পারো। অনেক পরিশ্রম করে এসেছি, একটু আরাম করে নিই, কয়েক মিনিট পরই আবার খেলা দেখাতে যেতে হবে।'

বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। কারনিভালের ভেতরের প্রধান গলিটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'সত্যি বলল না মিথ্যে, বুঝলাম না।'

কিশোর বলল, 'বিশ্রামের সময় গিয়ে বিরক্ত করেছি, শুরুতেই রেগে গেলে অবাক হতাম না। কিন্তু হঠাৎ করে যে ভাবে বদলে গেল, সেটা সন্দেহ জাগায়।'

'তা বটে,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলো মুসা। 'আমার তো মনে হলো হুমকিই দিল—ব্ল্যাকরাইটের ব্যাপারে খোঁজখবর করলে ভাল হবে না।'

আপাতত আর সে-খোঁজ করলও না গোয়েন্দারা। পকেটমারের সন্ধানে এসেছে, সেটাতেই মন দিল। নজর রাখার জন্যে ছড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। তিনজন তিন দিকে চলে গেল।

দু-দিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে আবার একসঙ্গে হয়ে গেল রবিন আর কিশোর। চোখ পড়ল মুসার ওপর।

মলিন পোশাক পরা রোগাটে এক লোকের পিছে লেগেছে মুসা। লোকটা যেদিকে যাচ্ছে সে-ও সেদিকে যাচ্ছে। ওদিকে দামী প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা আরেক লোক হাঁটছে মুসার পেছনে। তাকে দেখে কেউ খারাপ লোক বলে সন্দেহ করবে না। খাটো, টাকমাথা এক লোকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। টের পেয়ে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল টাকমাথা লোকটা। তার পকেট থেকে বের করে আনা মানিব্যাগটা চোখের পলকে মুসার পকেটে চালান করে দিল

জ্যাকেট পরা লোকটা।

'এসো, ধরতে হবে!' চিৎকার করে রবিনকে বলেই দৌড় দিল কিশোর।

জ্যাকেটওয়ালাকে ধরে ফেলল টাকমাথা। মুসার দোষ দিতে লাগল জ্যাকেটওয়ালা। নিজের পকেট থেকে চোরাই মানিব্যাগ বেরোতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল মুসা।

ভিড় জমে গেল। তোতলাতে শুরু করল মুসা। কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করল। এই সুযোগে পিছলে বেরিয়ে যেতে চাইল আসল পকেটমার। কিন্তু দু-দিক থেকে তাকে ধরে ফেলল কিশোর আর রবিন।

জনতার উদ্দেশ্যে কিশোর বলল, 'সরুন আপনারা। আসল চোর হলো এই লোক। আমরা কারনিভলের সিকিউরিটি গার্ড।'

তর্ক শুরু করল পকেটমার। বার বার মুসার দোষ দিতে লাগল।

কিশোর বলল, 'বাজে কথা বলবেন না। নিজের চোখে আপনাকে পকেট মারতে দেখেছি। যাকে চোর বানাতে চাইছেন সে কে জানেন? সে-ও সিকিউরিটি, আমার সহকারী। আর কিছু বলার আছে?'

চুপ হয়ে গেল পকেটমার। তাকে টানতে টানতে বুমারের অফিসে নিয়ে এল গোয়েন্দারা। সঙ্গে এল টাকামাথা লোকটা, যার মানিব্যাগ চুরি হয়েছে। পুলিশকে খবর দেয়া হলো। পকেটমারকে খুব একচোট ধমক-ধামক দিল পুলিশ অফিসার। তক্ষুণি শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। শাসিয়ে দিল, আর যদি কখনও রকি বীচে তাকে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরা হবে।

কিশোরের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে তিন গোয়েন্দার প্রশংসা করে বুমার বললেন, 'মনে হচ্ছে ঠিক লোককেই বহাল করেছি। তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল স্ট্রেচ বিটার। ছেলেদের প্রশংসা সহ্য করতে পারল না। হিংসায় জ্বলে উঠল চোখ। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে চলে গেল ওখান থেকে।

পুরোদমে চালু হয়ে গেছে তখন কারনিভাল।

বাকি বিকেলটা পাহারা দিয়ে বেড়াল তিন গোয়েন্দা। আর কোন অঘটন ঘটল না। কোন চোরও ধরা পড়ল না। আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল ভিড়। কমে গেল দর্শক। কারনিভাল বন্ধের সময় হলো। বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হলো গোয়েন্দারা।

মুসা বলল, তার একটা কাজ আছে, পথে নামিয়ে দিতে। নামিয়ে দিয়ে কিশোরকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ইয়ার্ডে এল রবিন। তাকে খেয়ে যেতে বলল কিশোর।

ঘরে ঢুকে দেখল ওরা, খবরের কাগজ পড়ছেন মেরিচাচী।

'এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কাগজটা ঠেলে দিলেন চাচী, 'দেখ, অদ্ভুত কাণ্ড!'

কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা।

তিমির ওপর একটা খবর বেরিয়েছে। খবরটার সারাংশ:

শপিং সেন্টার তৈরির জন্যে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে

স্টাফ করা বিশাল এক নীল তিমি। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী জলচর এই স্তন্যপায়ী জীবগুলোর কোন কোনটা একশো ফুটের বেশি লম্বা হয়। তবে রকি বীচে মাটির নিচ থেকে যেটা বেরিয়েছে সেটা অনেক ছোট। মনে করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল ওটা।

রবিন বলল, 'মাটির নিচ থেকে গুপ্তধন বেরোতে শুনেছি। কিন্তু স্টাফ করা তিমি! না, বাবা!'

'ওটা ওখানে এল কি করে?' মেরিচাচীর প্রশ্ন।

কিশোর অনুমান করল, 'আটকা পড়েছিল হয়তো বরফযুগে।'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ,' রবিন বলল, 'ওটা স্টাফ করা। বরফযুগের মানুষ কি স্টাফ করতে জানত?' নিজে নিজেই জবাব দিল আবার, 'তবে এমন হতে পারে, বরফযুগ চলে যাওয়ার পর অতিরিক্ত গরমে আপনা-আপনি শক্ত হয়ে স্টাফ হয়ে গেছে।'

'এটাও সম্ভব না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বরং শক্ত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু গরম এলেই পচন ধরবে,' হাই তুলল কিশোর। 'এই, দেখো, বিল্ডিং বানানোর কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন মিস্টার ওয়াকার। বিডকে জিজ্ঞেস করলে তিমিটার ব্যাপারে জানা যেতে পারে।'

মিস্টার ড্রেক ওয়াকারের ছেলে বিড ওয়াকার ওদের বন্ধু। ভাল বাস্কেটবল প্লেয়ার। একই স্কুলে পড়ে ওরা।

পরদিন কিশোর নাস্তার টেবিলে থাকতে থাকতেই রবিন চলে এল। তিমিটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে।

বিডকে ফোন করবে কিনা আলোচনা করছে দু-জনে এই সময় কলিং বেল বাজল। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকল বিড আর টম মার্টিন। টমও ওদের বন্ধু। কয়েকটা কেসে কাজ করেছে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

'আরি, বিড,' কিশোর বলল। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'নিশ্চয় তিমিটার ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে?' হেসে বলল বিড, 'সেই খবরই দিতে এলাম।' নাটকীয় ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সে। মাথা কাত করে ইশারায় টমকে দেখিয়ে বলল, 'আমরা এখন ব্যবসায়ী। দু-তিন দিনের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে যাব রকি বীচে। তিমি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি।'

তিন

খুলে বলল বিড, 'যার জায়গায় পাওয়া গেছে তিমিটা তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। বিপদেই পড়ে গিয়েছিল বেচারা, এত্তবড় তিমি নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, আমরা কিনতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। যা দাম বললাম তাতেই দিয়ে দিল...'

টম বলল, 'আসলে পয়সা ছাড়াই দিয়ে দিত। টাকা দেয়ার কথা বলে বোকামি

করেছি। অত বড় এক তিমি, কি করত? ফেলে দিয়ে আসতে গেলে ট্রাক ভাড়া লাগত একগাদা টাকা। অয়েলপেপারে মোড়া ছিল তিমিটা। বোঝা যায়, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেই কেউ মাটি চাপা দিয়েছিল। তাতে মোটামুটি অক্ষতই আছে ওটা। তিমি মোড়ানো হয়েছে, কত পেপার লাগে বোঝো, পেপার কেটে খুলতে খুলতেই অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে আমাদের।'

'যেখানে পাওয়া গেছে, তার পাশের খালি জায়গাটা ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নিয়েছি আব্বার কাছ থেকে,' বিড বলল। 'তেরপলের ছাউনি তুলে তার মধ্যে রেখেছি তিমিটা। টিকেট বিক্রির ঘরও বানিয়েছি। কাল সারাটা বিকেল এই করেই কাটিয়েছি।'

হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। সেগুলোর দিকে তিক্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে। মুখ তুলে তাকাল কিশোর আর রবিনের দিকে। 'তোমাদের কাছে এসেছি সাহায্যের জন্যে। একা কষ্ট হবে আমাদের। তোমরা থাকলে অনেক সুবিধে হবে। পার্টনার করে নিতে রাজি আছি। লাভের সমান ভাগ দেব।'

'যেতে পারলে ভালই হত,' কিশোর বলল। 'মজা পেতাম। কিন্তু হাতে অনেক কাজ। মিস্টার সাইমন একটা লোককে খুঁজে বের করে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। কারনিভালের মালিক মিস্টার বুমার এসে ধরেছেন পকেটমারের অত্যাচার বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। একসঙ্গে কয়টা করব?'

নিরাশ মনে হলো বিডকে। 'তাহলে তো মুশকিলই। দেখো, হাতের কাজগুলো জলদি জলদি শেষ হয় কিনা। তোমাদের পেলে সত্যি খুশি হব।'

ঘড়ি দেখল টম। 'বিড, চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বেরিয়ে গেল ওরা।

বিকেল বেলা কারনিভালে চলল রবিন আর কিশোর। মুসা আসেনি। সে তার স্ক্রিমশ নিয়ে ব্যস্ত। সেটা বাদ দিয়ে কারনিভালে যাওয়ার আগ্রহ নেই তার।

আগের দিনের মত ভিড় নেই কারনিভালে। দর্শকই নেই। ব্যাপারটা অবাক করল দুই গোয়েন্দাকে। মিস্টার বুমারের অফিসে ঢুকল।

দেখেই ফোঁস করে উঠলেন বুমার, 'আর বোলো না! আমার বারোটা বেজে গেছে!'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'তিমিটা আমার সর্বনাশ করেছে। বেরোনোর আর সময় পেল না। লোকে ভাবছে কারনিভাল অনেক দেখেছে, আরও অনেক দেখবে—কিন্তু তিমি দেখার এই একটাই সুযোগ, তা-ও আবার মাটির নিচ থেকে বেরোনো স্টাফ করা তিমি। আমার সমস্ত দর্শক নিয়ে গেছে ছেলে দুটো।'

নিজের হাতেই চাপড় মারলেন বুমার। 'বসে বসে লালবাতি জ্বলা দেখতে পারব না আর। দরকার হয় কিনে নেব তিমিটা। যাবে নাকি তোমরা?'

বুমারের সঙ্গে তাঁর স্টেশন ওয়াগনের দিকে চলল দুই গোয়েন্দা। ওরা তাঁকে জানাল, বিড আর টম ওদের বন্ধু। ওদের ব্যবসা বন্ধ করতেও রাজি নয় ওরা, আবার কারনিভালের কোন ক্ষতি হোক, সেটাও চায় না।

গম্ভীর হয়ে রইলেন বুমার। একটা তাঁবুর ছায়ায় বসে অলস ভঙ্গিতে ঘাসের

ডগা দাঁতে কাটছে স্টেচ বিটার। ইশারায় তাকে ডাকলেন।

'আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে,' বললেন তিনি।

বসের মুখ দেখেই অনুমান করে নিল বিটার, পরিস্থিতি সুবিধের নয়। উজ্জ্বল হলো মুখ। গণ্ডগোল বাধুক, এটাই চায় সে। ঝগড়া করতে ভালবাসে। দ্বিতীয়বার আর যাওয়ার কথা বলতে হলো না। লাফ দিয়ে উঠে বসল গাড়ির সামনের সীটে, বুমারের পাশে।

যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। কাছেই জায়গাটা। তিমির তাঁবুর সামনে লম্বা লাইন। টিকিট কেনার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকে।

তাঁবুর পাশে ছোট্ট একটা ঘরকে অফিস বানিয়েছে বিড আর টম। স্টেশন ওয়াগন থেকে কিশোরদের নামতে দেখে বেরিয়ে এল।

ওদেরকে খানিকটা দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিমি কেনার প্রস্তাব দিলেন বুমার।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল বিড আর টম।

শেষে বিড বলল, 'সরি, মিস্টার বুমার। যা দিতে চাইছেন, প্রদর্শনী করলে তার চেয়ে অনেক বেশি পাব আমরা। বেচব না।'

ধৈর্য রাখতে পারলেন না বুমার, চিৎকার করে উঠলেন, 'আমাকে শেষ করে দেবে নাকি!'

'মিস্টার বুমার,' শান্তকণ্ঠে বলল টম, 'বেশিদিন চলবে না আমাদের প্রদর্শনী। দুই-তিনদিনের মধ্যেই রকি বীচের সব লোকের দেখা হয়ে যাবে তিমিটা। তখন ওরা আবার ভিড় জমাতে শুরু করবে আপনার কারনিভালে।'

'হয়তো,' জবাব দিলেন কারনিভালের মালিক। 'কিন্তু আজকাল এমনিতেই কারনিভালের ব্যবসা খারাপ। টিকিট বিক্রি না হলে তিনদিনের খরচ জোগানোই কঠিন হয়ে যাবে আমার জন্যে!'

'কি করব বলুন? আমরাও তো বেআইনী কিছু করছি না।'

রবিনের সঙ্গে ফিসফিস করে আলোচনা করতে লাগল কিশোর, 'আমরা পড়লাম বেকায়দায়। মিস্টার বুমারের পক্ষ নিলে বিড আর টম রেগে যাবে। আবার ওদের পক্ষ নিলে কারনিভালের ক্ষতি হবে। একটা বুদ্ধি বের করেছি। দেখি কাজ হয় কিনা। তুমি আমাকে সমর্থন করবে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

এগিয়ে গেল কিশোর, 'আমি একটা কথা বলি, শুনুন। মিস্টার বুমার, এক কাজ করতে পারেন। দাম যা দিতে বলেছেন, তার অর্ধেক এখনই দিয়ে দিন ওদের। তিমিটা নিয়ে যান কারনিভালে। এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে—লোকে তিমিও দেখতে আসবে, কারনিভালও। টিকিটের দাম খানিকটা বাড়িয়ে রাখুন। তিমির ভাড়া বাবদ প্রতিটি টিকিটের জন্যে একটা কমিশন দিয়ে দিন বিড আর টমকে। তাতে ওদেরও লাভ, আপনারও। কারনিভাল আর বন্ধ থাকবে না।'

'বাহ্, দারুণ বুদ্ধি তো!' মোসাহেবী করল রবিন।

মাথা চুলকাতে লাগলেন বুমার, 'কিন্তু...'

বাধা দিল বিটার। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওদের কথা শুনবেন না, বস! বিপদে ফেলে আপনার পকেট খালি করার ফন্দি করেছে ওরা!'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বিডের, 'বিপদে ফেলেছি, না! যাও, বেচবই না! যা করতে পারো করো!'

গাল দিয়ে উঠল বিটার। ঘুসি মেরে বসল বিডকে।

মোটেও সহ্য করল না বিড। করার কোন কারণ নেই। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল টম। মারপিট বেধে গেল। চোয়ালে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে মাটিতে উল্টে পড়ে গেল বিটার। লাফিয়ে উঠে আবার ঘুসি পাকিয়ে মারতে গেল। হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে নিলেন বুমার। গর্জে উঠলেন, 'স্ট্রেচ! কতবার মানা করেছি কথায় কথায় হাত চালাবে না! দিলে তো সব ভজকট করে!'

টেলিফোন বাজল। ধরার জন্যে অফিসে ছুটে গেল বিড। বিটারের দিকে কড়া নজর রাখল টম।

অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ডাকল বিড, 'কিশোর তোমাদের ফোন। যে কোন একজন এলেই চলবে।'

রবিনকে পাঠাল কিশোর। সে দাঁড়িয়ে থেকে তিমি বিক্রিতে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করতে লাগল। বিড আর টমকে নরম করতে পারল খানিকটা, তবে পরিস্থিতি আগের মত আর স্বাভাবিক হলো না। বিড বলল, 'আলোচনা করে দেখি আমরা। দু-দিন পর জানাব।'

বিটারকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন বুমার।

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকাল বিটার।

ফোন শেষ করে এসে কিশোরকে জানাল রবিন, 'মিস্টার সাইমনের ফোন। ইয়ার্ডে করেছিলেন। মেরিচাচী বলেছেন আমরা কারনিভালে গেছি। কারনিভাল থেকে বলল এখানে এসেছি।'

'কি বললেন?'

'কাল রাতে নাকি আবার ফোন করেছিল ইনফর্মার, একই ফোন বুদ থেকে। পুলিশ টাকা দিতে রাজি হয়নি। তবে ডেভিড টিয়ান হয়েছেন। সেটাই জানালেন মিস্টার সাইমন। কড়া নজর রাখতে বললেন আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকটাকে ধরতে হবে।'

টম আর বিডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল দুই গোয়েন্দা।

সমস্ত পথ নীরবে গাড়ি চালালেন বুমার। থেকে থেকে বিটার তার আহত চোয়াল ডলতে লাগল।

কারনিভালে ফিরে তেমন কিছু করার থাকল না গোয়েন্দাদের। লোকের ভিড় থাকলে পকেটমার থাকে। লোকই নেই, চোর এসে কার পকেট মারবে? কিংবা হয়তো ওই একজনই ছিল। সে ধরা পড়ার পর উৎপাত বন্ধ হয়ে গেছে। ইনফর্মার লোকটা দিনের বেলা কখনও ফোন করে না। অকারণে হঠাৎ করে তার পদ্ধতি বদল করে দিনের বেলা করতে যাবে না। অলস ভঙ্গিতে কারনিভালের ভেতরের অলিতে-গলিতে ঘুরতে ঘুরতে সে-সব নিয়েই আলোচনা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। কারনিভালের কয়েকটা ট্রাক দেখা গেল ফোন বুদের পাশে। কিশোর ঠিক করল, রাত হলে কোন একটাতে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখবে বুদের ওপর। দেখবে, ইনফর্মার আসে কিনা।

অন্ধকার নামতেই একটা ট্রাকে উঠে পড়ল কিশোর। রবিন কারনিভালের ভেতর চক্কর দিতে লাগল। এক ঘণ্টা করে পাহারা দেবে ওরা।

পালা করে পাহারা দিতে লাগল দু-জনে। কারনিভাল বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এল। সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না। শেষবার পাহারা পড়ল রবিনের। ঘুরতে ঘুরতে কিশোর ভাবল, এইবার কিছু না হলে আজ রাতে আর লোকটাকে ধরার আশা নেই।

হঠাৎ রবিনকে দৌড়ে আসতে দেখে আশা বাড়ল তার। ছুটে গেল। রবিন জানাল, হালকা-পাতলা, বালিরঙের চুলওয়ালা এক তরুণকে বুদের পাশের ছায়ায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে আধঘণ্টা ধরে। সে চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পর মারগো ঢুকেছে বুদে। কথা সব বুঝতে পারেনি রবিন। মনে হয়েছে কোন ব্যাপারে কথা কাটাকাটি করেছে কারও সঙ্গে।

'এসো, মারগোকে জিজ্ঞেস করব,' প্রায় দৌড়ে চলল কিশোর।

ড্রেসিং রুমে পাওয়া গেল লোকটাকে। পরনে এখনও ভাঁড়ের পোশাক, মুখে রঙ মাখানো। প্রথমে রেগে উঠল সে, বলে দিল এটা ওদের ব্যাপার নয়। পরে যখন হুমকি দিল কিশোর, নরম হয়ে এল। বলল, 'দেখো, মূর্তি বা ব্ল্যাকরাইটের কথা কিচ্ছু জানি না আমি। ব্যাপারটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত। টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি করেছি আমার স্ত্রীর সঙ্গে।'

এরপর আর কোন কথা থাকে না। বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। রবিন বলল, 'আমি শিওরই হয়ে গিয়েছিলাম, মারগোই আমাদের ইনফর্মার।'

কারনিভাল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেদিন রাতে আর কিছু ঘটার আশা নেই। বিদায় নেয়ার জন্যে বুমারের অফিসে ঢুকল দু-জনে।

একটা বড় খাতায় হিসেব মেলাচ্ছেন বুমার। মুখ তুলে তাকালেন। 'কিছু বলবে?'

'মিস্টার বুমার,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'টাকা নিয়ে কি সব সময়ই তার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মারগো?'

'মারগো? হাহ্ হা। বউই নেই, ঝগড়া করবে কি। বিয়েই করেনি সে।'

'কি বললেন!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর রবিন। দৌড় দিল দরজার দিকে। বোকা হয়ে তাকিয়ে রইলেন বুমার।

বাইরে বেরিয়ে বলল কিশোর, 'অদ্ভুত কিছু ঘটছে এখানে!'

রবিন বলল, 'আমার ধারণাই ঠিক! মারগোই সেই লোক!'

'ড্রেসিং রুমে আর পাওয়া যাবে না এখন ওকে, আমি শিওর। তুমি এ দিক দিয়ে যাও, আমি ওদিক। এ ভাবে খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে। না পেলে আধঘণ্টা পর বুমারের অফিসে দেখা করব।'

কোথাও পাওয়া গেল না মারগোকে। কারনিভালের কয়েকজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। তারাও কিছু বলতে পারল না। হতাশ হয়ে আধঘণ্টা পর বুমারের অফিসে ফিরে এল সে।

রবিন ফেরেনি।

পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল। চিন্তিত হয়ে পড়ল কিশোর।

আরও পনেরো মিনিট পরও যখন ফিরল না, আর বসে থাকতে পারল না সে। নিশ্চিত হয়ে গেল, বিপদে পড়েছে রবিন।

চার

সারা কারনিভালে খুঁজে বেড়াতে লাগল কিশোর। তাকে সাহায্য করার জন্যে ছয়জন লোক দিয়েছেন বুমার। অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজছে ওরা, রবিনের নাম ধরে ডাকছে। সবার হাতেই টর্চ। অন্ধকার তাঁবুতে, ট্রাক ও ওয়াগনের নিচে আলো ফেলে দেখছে।

কোথাও পাওয়া গেল না রবিনকে। মারগোরও কোন খোঁজ নেই।

একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। রাগ আর হতাশা চেপে ধরতে চাইছে। জোর করে সরাল সে-সব। জানে, রাগের কাছে পরাস্ত হলে মাথাটা গরম হয়ে উঠবে, চিন্তা করতে পারবে না ঠিকমত।

ওপর থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল।

ঝট করে মাথা তুলল কিশোর। কারনিভালের দানবীয় ফেরিস হুইলটা নড়তে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার, নিচের চোয়াল ঝুলে পড়তে লাগল।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল মাটি থেকে অনেক উঁচুতে সবচেয়ে ওপরের কারটায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা। হাত বাঁধা পেছনে। কার থেকে নামার চেষ্টা করছে। পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে।

চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'রবিন, বসে পড়ো! অনেক ওপরে রয়েছ! নামার চেষ্টা কোরো না, পড়লে মরবে!'

চুপ হয়ে গেল রবিন। হাঁপ ছাড়ল কিশোর।

'কিশোর!' দূর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন বুমার, 'রবিনকে পেয়েছ?'

'পেয়েছি! জলদি আসুন!'

ছুটে এলেন বুমার। 'কি হয়েছে?'

নীরবে ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কিশোর।

'মাই গড!' চমকে গেলেন বুমার। মুখের কাছে হাত জড় করে চেঁচিয়ে বললেন, 'রবিন, একদম নোড়ো না! যা করার আমি করছি!'

ফেরিস হুইলের গোড়ায় বসানো ইঞ্জিনের ঢাকনা খুললেন তিনি। স্টার্ট দিলেন। স্টিকটা ধরে আস্তে টান দিলেন সামনের দিকে। খানিক পরেই মাটিতে নামল রবিনের কার। ছুরি দিয়ে তার চোখের আর হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে নামতে সাহায্য করল কিশোর।

'থ্যাংকস,' রবিন বলল। 'বেঁচেই ফিরলাম তাহলে।'

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল কিশোর। 'ওখানে গেলে কি করে?'

মাথার পেছনটায় আঙুল ছোঁয়াল রবিন, ব্যথায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। গোল

আলুর মত ফুলে আছে। বলল, 'জানি না। মারগোর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে হুইলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে কে জানি মাথায় বাড়ি মারল। হুঁশ ফিরতে দেখি চোখ বাঁধা। উঠে দাঁড়ালাম। এই সময় তুমি ডাকলে।'

'এর জন্যে ভুগতে হবে ব্যাটাকে!' দাঁতে দাঁত চাপল কিশোর।

'আমারই কোন লোক এ কাজ করেছে ভাবতে লজ্জা লাগছে,' বুমার বললেন। 'আসার সময় দেখলাম ছায়ায় গা ঢাকা দিল একজন।'

'কে?'

'হোগারফের মত মনে হলো। শিওর না।'

'ওর সঙ্গে কথা বলব। মারগো আর বিটারকেও দরকার।'

'আমার ধারণা, মারগোই সব শয়তানীর মূলে,' রবিন বলল।

খানিক পর বুমারের অফিসে ডেকে নিয়ে আসা হলো হোগারফ আর বিটারকে। মারগোকেও পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে সে-ও এল। রবিনকে কে বেঁধেছে জিজ্ঞেস করাতে জোর গলায় অস্বীকার করল তিনজনেই।

কিশোর বলল, 'সোজা কথায় আসুন। মারগো, কিছুক্ষণ ধরে অনেক খোঁজা হয়েছে আপনাকে। কোথায় গিয়েছিলেন বলবেন?'

'হাঁটতে।'

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন—এই মিথ্যে কথাটা বললেন কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' কর্কশ হয়ে উঠল মারগোর কণ্ঠ।

বিটারের দিকে তাকাল রবিন। 'আমাকে ফেরিস হুইলে বাঁধার সময় আপনি কোথায় ছিলেন বলবেন?'

'না!' ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল বিটার। 'কোনই প্রয়োজন মনে করছি না!'

'স্ট্রেচ!' কঠোর কণ্ঠে ধমক দিলেন বুমার।

ছেলেদের দিকে চোখ ফেরাল বিটার। 'জানোয়ারগুলোর তদারক করছিলাম। আর কিছু জানার আছে?'

'হোগারফ, আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার ওয়াগনে ঘুমোচ্ছিলাম।'

'ঘুমাতে কেউ দেখেছে আপনাকে?'

'না।'

'হুঁ। তারমানে আপনাদের কারোরই কোন সাক্ষি নেই। কেবল আপনাদের মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে। প্রমাণ যেহেতু করতে পারছি না, আপাতত তা-ই করতে হবে।'

কারনিভালে আর কোন কাজ নেই, বাড়ি ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা।

রাতে ভাল একটা ঘুম দিতেই সুস্থ হয়ে গেল রবিন। পরদিন সকালে দেখল মাথা ব্যথা সেরে গেছে, ফোলাটাও কমেছে। বিকেলে কিশোরের সঙ্গে আবার রওনা হলো কারনিভালে। সেদিনও ওদের সঙ্গে গেল না মুসা।

বুমার বললেন, 'অবস্থা খুবই খারাপ। দেড়দিনে দেড়শো দর্শকও আসেনি। কর্মচারীদের বেতন দেয়াই মুশকিল হয়ে যাবে।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্যারনিভাল বন্ধ করে দিয়ে জরুরী মীটিঙের ঘোষণা

দিয়ে দিলেন তিনি। গোয়েন্দাদেরকেও তাতে থাকতে বললেন।

বড় তাঁবুটার নিচে জমায়েত হলো সবাই। কেউ কেউ মেঝেতে শুয়ে পড়ল। কেউ বা পা তুলে দিয়ে বসল চেয়ারে। সবাই গম্ভীর। মঞ্চে উঠে বসলেন বুমার। পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললেন সবাইকে। যখন বললেন, সেই সপ্তাহের পুরো বেতন দিতে পারবেন না, জোরাল গুঞ্জন উঠল।

'প্লীজ, শান্ত হও সবাই, আমার কথা শোনো,' অনুরোধ করলেন তিনি। 'এই অবস্থা আমাদের জন্যে নতুন নয়। আরও হয়েছে। সবাই মিলে সহ্য করেছি তখন, একসঙ্গে মোকাবিলা করেছি, সমস্যায় বসে থাকিনি, পার হয়ে এসেছি আমরা। এবারও থাকব না। ব্যবসা ভাল হলে বকেয়া বেতন তো মিটিয়ে দেবই, বোনাসও দেব একটা।'

এতে খানিকটা কাজ হলো বটে, তবে মুখ উজ্জ্বল হলো না কারও। পরিস্থিতি যা চলছে, তাতে সবাই খুব চিন্তিত।

হোগারফ উঠে দাঁড়াল। কঠিন হয়ে আছে মুখ। বলল, 'বস্, ওই তিমিটাই যত সর্বনাশের মূল, তাই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন বুমার।

'বেশ, ব্যবস্থা একটা করা হবে। এবং যতটা শীঘ্রি সম্ভব,' হোগারফ বলল।

'কি ব্যবস্থা করবে? শোনো, বেআইনী কিছু করতে যেয়ো না। একটা কথা ঠিক, তিমিটা যত তাড়াতাড়ি সরবে, তত তাড়াতাড়ি সামলে উঠব আমরা। কিন্তু তাই বলে কোন রকম গোলমাল কিংবা অসৎ কিছু করে সরানোর কথা ভাবতে পারি না আমি।'

কিছু বলল না হোগারফ। মুখ টিপে হাসল কেবল।

আরও দু-চারটা কথা বলে মীটিং শেষ করে দিলেন বুমার।

রবিনকে বলল কিশোর, 'কর্মচারীদের অনেকেরই ভাবসাব খুব খারাপ। যা খুশি করে বসতে পারে। বিড আর টমকে ফোন করে বলে দিতে হবে সাবধানে থাকে যেন।'

ফোন করার আগেই গোয়েন্দাদের পেছনে এসে দাঁড়াল মারগো। হাত রাখল রবিনের কাঁধে। মুখে মাখা পুরু রঙও তার অস্থির ভাবটা ঢাকতে পারল না।

'তোমাদের সঙ্গে কথা আছে,' ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল সে। 'এখানে বলা যাবে না, কেউ শুনে ফেলতে পারে। অন্য কোথাও চলো।'

'চলুন,' কিশোর বলল। দর্শকদের আনন্দ দেয়ার জন্যে অনেক ব্যবস্থা আছে কারনিভালে। ওয়াটার-রোট রাইড তার মধ্যে একটা। কথা বলা নিরাপদ ভেবে ওটার কাছে চলে এল তিনজনে। 'হ্যাঁ, এবার বলুন।'

অস্থির ভঙ্গিতে এদিক ওদিক ঘুরছে মারগোর চোখ। কেউ আছে কিনা দেখে নিল ভাল করে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে ধরার চেষ্টা করছে ওরা! ধরতে পারলে দুনিয়ায় রাখবে না, সোজা মেরে ফেলবে!'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কারা মারবে আপনাকে?'

'সেটা তোমাদের বলা যাবে না।' মারগোর গলা কাঁপছে।

নিজের অজান্তেই ডান হাতটা মুঠো হয়ে গেল তার। আজব একটা উল্কি আঁকা দেখতে পেল কিশোর। মারগোর বুড়ো আঙুলের গোড়া, তর্জনীর গোড়া আর তর্জনীর মাথায় নীল কালিতে আঁকা তিনটে ছবি—আলাদা আলাদা থাকলে যেগুলোর কোনই মানে হয় না, কিন্তু হাত মুঠো করে ফেললে গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে একটা তিমির ছবি তৈরি হয়ে যায়।

কারা ওকে মারতে চায়, বলার জন্যে চাপাচাপি করল গোয়েন্দারা, কিন্তু আর কিছু বলল না মারগো। গলায় ঝোলানো একটা রূপার চেন খুলে নিল। ছোট একটা চাবি রয়েছে তাতে। কিশোরকে দিয়ে বলল, 'আমার কিছু ঘটে গেলে আমার ওয়াগনে যেয়ো। বাংকের ম্যাট্রেস ওল্টালে নিচে একটা আলগা বোর্ড দেখতে পাবে। তার নিচে একটা বাক্স। সেটা খুললেই বুঝতে পারবে কি করতে হবে।'

কারনিভালের কয়েকজন লোককে আসতে দেখা গেল।

একটা মুহূর্ত আর দাঁড়াল না মারগো। তাড়াহুড়া করে চলে গেল।

'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে,' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'রাতটা যাক, শান্ত হোক, কাল এসে আবার ধরব। দেখি, ওর মুখ থেকে কিছু বের করা যায় কিনা?'

বাড়ি ফিরে চলল গোয়েন্দারা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ভেঙে পড়ল যেন আকাশ। শুরু হলো প্রবল ঝড়-বৃষ্টি।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে এসে ঝড়ে কতটা ক্ষতি করেছে জানার জন্যে টেলিভিশন ছাড়ল কিশোর। সকালের খবরটা শুনবে। সংবাদ পাঠক বলছে:

> **সাংঘাতিক এক রহস্য পেয়ে গেছে রকি বীচের পুলিশ। কাল রাতে ঝড়ের মধ্যে বিড ওয়াকার আর টমাস মার্টিনের নীল তিমিটা কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। পাহারায় ছিল বিড ওয়াকার। তিমির সঙ্গে সঙ্গে সে-ও নিখোঁজ। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।**

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে টেলিভিশনটা বন্ধ করল, তারপর ছুটল ফোনের দিকে। সে রিসিভার তোলার আগেই বেজে উঠল ফোন। রবিন করেছে। খবরটা শুনেছে। তাকেই ফোন করতে যাচ্ছিল কিশোর, তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলল।

রবিন আসতে বিডের বাড়ি রওনা হলো ওরা।

বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই আরেকটা গাড়ি দেখা গেল। পুলিশের গাড়ি। পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের পাশে বসে আছে বিড ওয়াকার স্বয়ং। কাপড়ে ময়লা লেগে আছে, ছেঁড়া। স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না বিডকে, কেমন ঘোর লাগা অবস্থা।

ছেলেকে দেখে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামলেন মিস্টার ওয়াকার।

বসার ঘরে এনে বসিয়ে পাখা ছেড়ে দিয়ে, পানিটানি খাওয়ানোর পর অনেকটা সুস্থ হলো বিড। কি ঘটেছিল বলতে পারল।

রাতে ছাউনিতে পাহারায় ছিল সে। হঠাৎ একটা শব্দ কানে ঢুকল। দেখল, ছুরি দিয়ে তেরপল কাটছে কেউ। ধরতে গেল বিড। কিন্তু সে ছাউনি থেকে বেরোনোর আগেই লোকটা পালাল। সতর্ক হয়ে গেল বিড। সারারাত জেগে বসে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। খানিক পর বিটকেলে একটা গন্ধ নাকে ঢুকল। তারপরই

জ্ঞান হারাল, আর কিছু মনে নেই।

'গ্যাস,' রবিন বলল।

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন ইয়ান ফ্লেচার। বিডকে কোথায় পাওয়া গেছে জানালেন। কারনিভালের একটা গেটের পাশে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

'ওরাই শয়তানিটা করেছে!' রেগে উঠলেন মিস্টার ওয়াকার। 'ওই কারনিভালের লোকগুলোকেই ধরা উচিত!'

ক্যাপ্টেন যুক্তি দেখালেন, 'ওদের সন্দেহ করলেও কোন প্রমাণ ছাড়া ধরতে পারবেন না।'

অগত্যা যুক্তিটা মেনে নিয়ে চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হলেন মিস্টার ওয়াকার।

ছেলের পাশে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বসে আছেন মিসেস ওয়াকার। কথা বলতে পারছেন না। ছেলের নিখোঁজ সংবাদটা কাঁপিয়ে দিয়েছে তাঁকে, এখনও সামলে উঠতে পারেননি।

'আরে বাবা ছাড়ো না আমাকে,' মায়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল বিড। 'আমি ঠিকই আছি।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার ফ্লেচার, একটা উপকার করুন আমার। তিমিটা খুঁজে বের করে দিন!'

পাঁচ

ডাক্তার এলেন। বিডকে দেখেটেখে বললেন, দু-চার দিন বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। তিমিটা যেখান থেকে চুরি হয়েছে সেখানে চলল।

অনেক খুঁজেও কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

'ট্রাকের চাকার দাগ সব বৃষ্টিতে মুছে গেছে,' রবিন বলল।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ট্রাক দিয়ে নিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে!'

'তাহলে কি দিয়ে নিল? ঘাড়ে করে বয়ে তো আর নিতে পারেনি অত বড় তিমি। মুসা থাকলে অবশ্য বলত ডেমন'স ল্যান্ডের ভূতের কাজ। গায়েব করে দিয়েছে।'

'বুঝতে পারছি না, রবিন। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

জায়গাটায় আরেকবার খোঁজাখুঁজি করে, কিছু না পেয়ে, আবার বিডদের বাড়ি ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। কিশোরের ইচ্ছে, আরেকবার ওকে প্রশ্ন করবে। ঘোর কেটে গেলে হয়তো এমন কিছু মনে পড়তে পারে, যেটা তখন মাথায় আসেনি বিডের।

ঘোর ঠিকই কেটেছে, কিন্তু নতুন কিছু বলতে পারল না বিড। মাথা নেড়ে বলল, 'সরি, কিচ্ছু মনে নেই আর। গন্ধ পাওয়ার পর থেকে সব অন্ধকার।'

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল টম। বিডের ফিরে আসার খবরটা দেরিতে পেয়েছে। খবর পাওয়ার পর আর মুহূর্ত দেরি করেনি, ছুটে চলে এসেছে।

ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'যত শয়তানি ওই বিটারটার! সে চুরি করেছে এটা কেবল জানতে পারলে হয়, আগের বারের মত সহজে আর ছাড়ছি না!'

কিশোর বলল, 'কিছু না জেনে কাউকে চোর বলা ঠিক না।'

কি যেন ভাবছিল রবিন। তুড়ি বাজাল হঠাৎ, 'বুঝেছি!'

সবাই তাকাল তার দিকে।

'কি করে নেয়া হয়েছে তিমিটাকে, বুঝেছি' আবার বলল সে। 'হেলিকপ্টার! বড় একটা মালবাহী হেলিকপ্টার এনে, মোটা তারে বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটাকে।'

ঝিলিক দিয়ে উঠল কিশোরের চোখের তারা। 'হ্যাঁ, এটা হতে পারে। দাঁড়াও, ল্যারি কংকলিনকে ফোন করছি।'

মিস্টার সাইমনের প্রাইভেট প্লেনের পাইলট কংকলিন। ভাল খাতির তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। অনেক কেসে ওদেরকে সাহায্য করেছে।

ওকে পাওয়া গেল। গত রাতে ওই এলাকায় যত হেলিকপ্টার উড়েছে, তার একটা লিস্ট জোগাড় করতে কংকলিনকে অনুরোধ করল কিশোর।

খবর পেতে দেরি হলো না। কংকলিন বলল, 'নিরাশ করতে হচ্ছে তোমাকে, কিশোর। কাল রাতে রকি বীচের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি ঝড়ের জন্যে।'

'তাহলে নিল কি করে তিমিটা? আমি শিওর, আকাশপথেই নেয়া হয়েছে ওটাকে, আর কোন ভাবে নয়। বড় ট্রাকে করে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু শহরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কারও না কারও চোখে পড়তই তাহলে।'

'তা ঠিক।'

'আপনি কি এখন ব্যস্ত?'

'কেন?'

'ব্যস্ত না হলে আমাদের নিয়ে একটু আকাশে ঘুরতে বলতাম।'

'চলে এসো।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর মিস্টার সাইমনের বিমানে করে কংকলিনের সঙ্গে আকাশে উড়ল দুই গোয়েন্দা। চক্কর মারতে শুরু করল রকি বীচের আকাশে। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল শহরের ওপর থেকে। শক্তিশালী দূরবীন চোখে লাগিয়ে নিচের অঞ্চল তন্নতন্ন করে দেখছে কিশোর।

খানিক পর কংকলিন বলল, 'তেল কমে গেছে। আর কতক্ষণ উড়তে হবে?'

'তিমিটার কোন চিহ্ন না পাওয়া পর্যন্ত।'

'এ ভাবে কি পাবে?'

'চেষ্টা তো করতে হবে।'

'তাহলে তেল ভরে নেয়া উচিত। কাছেই গভারের প্রাইভেট এয়ারপোর্ট। নামব?'

'নামুন।'

গভারের বিমান বন্দরটা শহরের বাইরে। একটিমাত্র রানওয়ে। শেষ মাথায় পুরানো একটা বাড়িতে অফিস, আর একটা ফুয়েলিং পিট। রানওয়েতে বিমান

নামাল কংকলিন। ট্যাক্সিইং করে ফুয়েলিং পিটের সামনে গিয়ে থামল।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার গভার। বিশাল শরীর, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ছোটখাট একটা গ্রিজলি ভালুকের মত দেখতে লাগে। চেনেন ওদেরকে। হাত নেড়ে বললেন, 'হাই কিশোর, হাই রবিন, কেমন আছ?'

'ভাল,' হেসে জবাব দিল কিশোর।

'ল্যারি, কেমন? তেল লাগবে বুঝি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কংকলিন।

দরজা খুলে লাফিয়ে মাটিতে নামল কিশোর আর রবিন।

বিমানের তেলের ট্যাংকের মুখে পাইপের মাথা ঢুকিয়ে দিলেন গভার।

কোমরে হাত দিয়ে দেখতে লাগল কিশোর।

নাক টানলেন গভার, চুল ঝাঁকি দিলেন। বললেন, 'একেবারে সময়মত এসেছ। তোমাদের মত কা উকেই খুঁজছিলাম মনে মনে। ক্লাবের দুটো বেলুন চুরি করে নিয়ে গেছে কে যেন। একটু তদন্ত করে দেখবে?'

সামান্য দ্বিধা করে কিশোর বলল, 'এখন তো সময় নেই। জরুরী কাজে বেরিয়েছি। পরে পারলে একবার আসব।'

হতাশ হলেন গভার। পাম্পের মিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা।'

আবার আকাশে উড়ল বিমান।

আরও আধঘণ্টা ধরে চক্কর দেয়ার পর চলে এল কতগুলো ওক গাছের ওপর। নিচের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখো, দেখো!'

কিশোরও দেখল। কংকলিনকে নিয়ে যেতে বলল সেদিকে।

গাছের মাথার ওপর যতটা সম্ভব বিমান নামিয়ে আনল কংকলিন।

দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'বেলুন। খোঁচা লেগে ছিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। নিচে বাঁধা মোটা দড়ি, মাথা ছেঁড়া।'

যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে, আর কিছু দেখার নেই। কংকলিনকে এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে বলল সে। কি করে তিমি চুরি হয়েছে, বুঝে গেছে। বেলুনের দড়িতে বেঁধে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটাকে। বাতাসের স্রোতের ওপর ভরসা করেছিল চোরেরা। কিন্তু গোলমাল করে দিয়েছে ঝড়। দড়ি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে তিমিটা। বেলুনগুলো গাছের গায়ে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়েছে।

বিমান বন্দরে নেমে গভারকে একটা ফোন করল কিশোর। বেলুনগুলোর খবর জানাল। কংকলিনকে অনুরোধ করল, আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আগের রাতের বাতাসের গতি আর দিকটিকগুলো ভালমত জেনে বলতে।

জানাবে, কথা দিয়ে চলে গেল কংকলিন।

একটা স্ন্যাক শপে ঢুকে কিছু খেয়ে নিয়ে কারনিভালে রওনা হলো দুই গোয়েন্দা।

প্রতিযোগিতা খতম হয়েছে, আবার জমে উঠেছে কারনিভাল। খুশিই হওয়ার কথা বুমারের, হয়েছেনও, তবে নতুন আরেক সমস্যা তৈরি হয়েছে।

'একটু পরেই মারগোর অ্যাক্ট আছে,' কিশোরকে বললেন তিনি। 'কিন্তু সে গায়েব। কাকে দিয়ে করাই? ভাঁড় ছাড়া সার্কাস চলে না। আরেকজন জোগাড়

করতে সময় লাগবে।'

'মারগো নেই!' সতর্ক হলো কিশোর।

মাথা নাড়লেন বুমার।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'ইয়ান ফ্লেচারকে খবর দেয়া দরকার। মারগোর কিছু হয়েছে।'

ফোন করতে চলে গেল রবিন।

গুঙিয়ে উঠলেন বুমার, 'ভাঁড় সমস্যাটার সমাধান করি এখন কি ভাবে? টিকিট কেটে ঢুকেছে লোকে, ভাঁড় না দেখলে গালাগাল শুরু করবে।'

'ভাঁড় একজন আপনাকে এনে দিতে পারি অবশ্য, যদি সে রাজি হয়,' কিশোর বলল।

জ্বলজ্বল করে উঠল বুমারের চোখ। উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কে?'

'মুসা। আমাদের মুসা আমান।'

'সে পারবে?'

'পারবে। তবে করবে কিনা জানি না।'

কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরলেন বুমার। 'দেখো না, বলো! এখুনি ফোন করো!'

মুসাকে ফোন করল কিশোর। বাড়িতেই আছে সে, স্ক্রিম্‌শ নিয়ে ব্যস্ত। বুমারের ক্রমাগত অনুরোধে ভাঁড় হতে রাজি হলো।

কারনিভালের গাড়ি গিয়ে তুলে আনল মুসাকে। ভাঁড়ের জন্যে বলতে আরম্ভ করেছে দর্শকরা। না দেখলে বেশিক্ষণ সহ্য করবে না আর।

তাড়াতাড়ি গিয়ে পোশাক পরে এল মুসা, মুখে রঙ মাখল।

প্রয়োজনীয় কতগুলো জিনিস তার দুই পকেটে ভরে দিয়ে বুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'পারবে তো?'

'আশা তো করি,' জবাব দিল মুসা। 'স্কুলের অনেক অনুষ্ঠানে বহুবার ভাঁড় সেজেছি।'

'ঠিক আছে, যাও। আমার মান রাখো।' মুসা যে ভোজন রসিক, জেনে গেছেন বুমার। 'কারনিভালের সব খাবারের দোকানে যে কোন খাবার তোমার জন্যে ফ্রি। আমি বলে দেব দোকানদারদের, তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবে না।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।

খেলা দেখানো শেষ করেছে কয়েকজন দড়াবাজিকর। রিঙের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের অপেক্ষা করছে রিংমাস্টার। আসছে না দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে, উসখুস করছে।

ছুটে গেলেন বুমার। রিংমাস্টারের হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে ঘোষণা করলেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, একটা অঘটন ঘটে গেছে। আমাদের নিজেদের যে ভাঁড় ছিল, হঠাৎ করে সে চলে গেছে।' প্রতিবাদের ঝড় উঠতে গেল দর্শকদের মধ্যে থেকে, তাড়াতাড়ি হাত তুলে তাদের থামালেন তিনি। 'তবে, ভাঁড় না দেখে যেতে হবে না আপনাদের। আরেকজন জোগাড় করে ফেলেছি। মারগোর চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।' মুসাকে রিঙে ঢুকতে ইশারা করলেন তিনি। 'আসছে আমাদের নতুন ভাঁড়, মুসা আমান দি গ্রেট!'

বিচিত্র ভঙ্গি করে রিঙে ঢুকল মুসা। জমিদারি চালে হাঁটতে গিয়েই আছাড় খেলো। লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল, কে তাকে ধাক্কা দিয়েছে দেখার জন্যে।

হেসে ফেলল দর্শক।

সামনের সারিতে বসা একজন দর্শককে সন্দেহ করার ভান করল সে। কৃত্রিম রাগে ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। পকেটে হাত দিল পিস্তল বের করার ভঙ্গিতে। হাতে বেরিয়ে এল একটা প্লাস্টিকের গোলাপ ফুল। পিস্তল মনে করে তুলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে যেন দেখতে পেল সেটা পিস্তল নয়। নিরাশ হয়ে পকেটে রেখে আরেকটা জিনিস বের করল। একটা পানি ছোঁড়ার বাল্ব। পিস্তল না হলেও এটা দেখে সন্তুষ্ট হলো। দর্শকদের দেখিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাল, এখুনি শায়েস্তা করবে লোকটাকে। তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, এত্তবড় সাহস! লোকটার দিকে করে টিপে দিল বাল্ব। কিন্তু আবারও ভুল করেছে, ইচ্ছে করেই। মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছে তার নিজের কপালের দিকে। পানি ছিটকে এসে পড়ল চোখেমুখে। হতভম্ব হয়ে যাওয়ার ভান করল।

হাসতে লাগল দর্শক।

লোকটাকে শায়েস্তা করা আর হলো না। তাকে মাপ করে দিল মুসা। সরে এসে চক দিয়ে লম্বা একটা রেখা টানল। ছোট একটা ছাতা মেলে চকের দাগকে তার ধরে নিয়ে তার ওপর হাঁটতে শুরু করল—শূন্যে খালি একটা তারের ওপর যে ভাবে হাঁটে দড়াবাজিকর, সেই ভঙ্গিতে। ছাতা নিয়ে একবার এদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল দু-বার। আরেকবার ধুড়ুস করে পড়েই গেল। ছাতাটা হাত থেকে খসে চলে গেল দূরে।

হাসি আর হাততালির ধুম পড়ে গেল।

হাসিমুখে কিশোরের কাছে ফিরে এলেন বুমার। মুসার ভাঁড়ামি দেখে কিশোর আর রবিনও হাসছে।

বুমার বললেন, 'যাক, একটা দুশ্চিন্তা গেল।' মুসাকে এনে দিয়েছে বলে অনেক ধন্যবাদ দিলেন কিশোরকে।

ভাঁড়ামি চালিয়েই যাচ্ছে মুসা। দেখার ইচ্ছে ছিল কিশোরের, কিন্তু আরেকটা জরুরী কাজ সারতে হবে। কারনিভালের কর্মচারীরা সব ব্যস্ত, এটাই সুযোগ। মারগো ওদেরকে কি বলে গেছে, বুমারকে জানাল সে। বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে এখন মারগোর বাক্সটা খুলতে চাই।'

'ঠিক আছে, চলো, আমিও যাচ্ছি।'

ওয়াগনের কাছে দু-জনকে নিয়ে এলেন বুমার।

ফাঁক হয়ে আছে দরজা। ভেতরে ঢুকেই নাক কুঁচকাল রবিন, 'পোড়া গন্ধ!'

'হ্যাঁ,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর।

বাংকের দিকে এগোল সে। ম্যাট্রেস উঁচু করতেই আলগা বোর্ডটা দেখতে পেল। সরাল সেটা। স্থির হয়ে গেল হাত। তাকিয়ে আছে ছোট ফোকরটার দিকে।

'কি হলো?' দরজার কাছ থেকে জানতে চাইলেন বুমার।

বিড়বিড় করল কিশোর, 'বাক্সটা নেই!'

ছয়

পাওয়া গেল ওটা, তবে খোলা। ভেতরে কিছু নেই। দরজার পাশে দেখা গেল কাগজ পোড়া ছাই, পোড়ানোর পর জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কাছেই কাঠের ফাঁকের মধ্যে পাওয়া হলদে কাগজের একটা টুকরো। বেশির ভাগ পোড়া, বোধহয় এই কাগজটাই পোড়ানো হয়েছে।

দরজার কাছে বেশি আলোতে এনে পড়ল কিশোর, 'সেজউইক স্টোকস জানে...' আর কিছু নেই। পুড়ে গেছে। মুখ তুলে বুমারকে জিজ্ঞেস করল সে, 'নামটা শুনেছেন?'

'না।'

কাগজের টুকরোটা মানিব্যাগে রেখে দিল কিশোর।

প্রচুর খোঁজাখুঁজি করা হলো ওয়াগনের ভেতর। আর কিছু পাওয়া গেল না।

বেরিয়ে এল ওরা। মাটির দিকে চোখ পড়তে বলে উঠল রবিন, 'এটা কি!' নিচু হয়ে ছেঁড়া একটা ফটোগ্রাফ তুলে নিল। ধারগুলো পোড়া। মাঝখানে চিউয়িং গাম লেগে আছে।

'বাক্সে বোধহয় এই জিনিসটাই ছিল,' বলল কিশোর। 'তাড়াহুড়ো করায় পুরোপুরি পোড়েনি। জুতোর নিচে গাম লেগে গিয়েছিল লোকটার। তাতে আটকে এসে বাইরে পড়েছে।'

চোয়ালে মাংস নেই ছবির লোকটার। ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক। পরনে সার্কাসের পোশাক। চিনতে পারলেন বুমার। লোকটার নাম ছিল বিলি। দড়াবাজির খেলা দেখাত। ওপরের দোলনা থেকে পড়ে মারা যায়।

সূত্র কিছু পাওয়া গেছে, তবে এগুলো দিয়ে কি হবে বুঝতে পারল না কিশোর। বাড়ি ফিরে মিস্টার সাইমনকে ফোন করল। তাঁকে পাওয়া গেল না। তাঁর বাবুর্চি নিসান জাং কিম জানাল, আটচল্লিশ ঘণ্টা হলো বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন সাহেব, কোন খোঁজ নেই।

তারমানে জরুরী কোন কেসে জড়িয়েছেন তিনি, ইচ্ছে করে আত্মগোপন করেছেন, অনুমান করল কিশোর।

রাতে খাবার টেবিলে মেরিচাচী ঘোষণা করলেন, আগামী দিন সকাল আটটার প্লেনে ফ্রেড ওয়ালকিন আসছে।

সুতরাং পরদিন সকালে তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে চলল কিশোর আর রবিন।

ফ্রেডকে চিনতে মোটেও বেগ পেতে হলো না ওদের। তাঁর রোদে পোড়া চামড়া, ফিনফিনে চুল-দাড়ি, নাবিকের পোশাক প্লেনের অন্য যাত্রীদের থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। ডান হাতটা স্লিঙে ঝোলানো।

ডাক দিল কিশোর, 'ফ্রেড আংকেল!'

ঘুরে তাকাল লোকটা। এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল কিশোরের। হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে, 'তুমি নিশ্চয় কিশোর। মেরির ছেলে।'

'জানলেন কি করে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর। রবিনের পরিচয় দিল।

'বাইরে বাইরে থাকি বলে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ পাই না ভেবেছ? সবই পাই,' ফ্রেড বললেন।

'আপনার হাতে কি হয়েছে? ভেঙেছেন?'

'না, মচকেছে। সুটকেসটা ভারি। বেকায়দা ভাবে টান দিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম।'

ব্যাগেজ ক্লেম এরিয়া থেকে ওটা আনতে গিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলো কিশোর আর রবিন, এই জিনিস তুলতে গেলে ওদের হাতও মচকাত।

'বাহ, জিনিস বটে একখান,' রবিন বলল। 'অর্ধেক বাস ভরে যাবে।'

'অর্ধেক না ভরলেও কোয়ার্টার তো ভরবেই,' রসিকতা বোঝেন ফ্রেড।

তাঁকে নিয়ে বাড়ি এল কিশোররা। তৈরি হয়েই আছেন মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা। মেহমানকে আদর-অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রচুর খাবার বানিয়ে রেখেছেন চাচী। টেবিলে দিলেন।

দিনের বেলা, ইয়ার্ডের কাজের সময়। রাতে গল্প করবেন বলে কাজ করতে চলে গেলেন রাশেদ পাশা। খানিক পর মেরিচাচীও গেলেন। ফ্রেডের সঙ্গী হয়ে রইল কিশোর আর রবিন। সাগরের গল্প শুনতে লাগল।

কিশোরের মনে হলো, বিডের খোঁজ নেয়া দরকার।

বিশ্রাম নিতে গেলেন ফ্রেড। কিশোর আর রবিন রওনা হলো বিডদের বাড়িতে।

সেরে উঠেছে বিড। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে সে। বিছানার কাছ থেকে দূরে একটা কাউচে বসে পা দোলাচ্ছে টম। ও রোজই দেখতে আসে বিডকে। হাজার হোক ব্যবসার অংশীদার।

কিশোর বলল, 'কি ব্যাপার, মেজাজ গরম হয়ে আছে মনে হচ্ছে?'

'হবে না,' ফুঁসে উঠল বিড। 'এতগুলো টাকা খরচ করলাম তিমিটার পেছনে। খরচ ওঠার আগেই নিয়ে চলে গেল। ওই কারনিভালের লোকেরাই কাজটা করেছে!'

টম বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

কিশোর বলল, 'হতে পারে, না-ও পারে। তবে কারনিভালের লোক যদি হয়ও, মিস্টার বুমার এর কিছুই জানেন না, এটা শিওর। যদিও তিমিটা সরাতে পারলে তাঁর লাভই সবচেয়ে বেশি।'

'আমার সন্দেহ বিটার ব্যাটাকে,' টম বলল। 'মারগো আর হোগারফকেও দুধে ধোয়া মনে হয় না।'

'খালি সন্দেহ দিয়ে কাজ হবে না। ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে প্রমাণ দরকার...'

'কিসের প্রমাণ?' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল মুসা।

'তুমি এলে কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ইয়ার্ডে গিয়েছিলাম। শুনলাম, এখানে এসেছ।'

'স্ক্রিমশের নেশা শেষ?'

'শেষ নয়,' গাল চুলকাল মুসা। 'তবে ভাঁড় সাজতেই বেশি ভাল লাগছে। তা ছাড়া খাবার যা দেয়! এই তো, কারনিভালের এক স্টল থেকে ডজনখানেক প্যানকেক সাবড়ে এলাম।'

'দারুণ একখান চাকরি পেয়েছ...'

রবিনের কথা শেষ হলো না, ঘরে ঢুকলেন মিসেস ওয়াকার। হাতে বড় একটা ট্রেতে গরম গরম পিজা। মুসাকে দেখে হাসলেন, 'আরি, মুসা এসেছ। আমার পিজা বানানো সার্থক হলো।'

'খেতে পারব না, খালাম্মা,' করুণ দৃষ্টিতে পিজাগুলোর দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'পেট ভর্তি।'

'তাই?' ট্রে-টা টেবিলে রেখে ছুরি দিয়ে পিজা কাটতে লাগলেন মিসেস ওয়াকার।

গন্ধে আর লোভ সামলাতে পারল না মুসা। বলল, 'যা থাকে কপালে, খেয়েই ফেলব। পেট বেশি ভরে গেলে নাহয় সারাদিনে আর কিছু খাব না।'

হেসে ফেলল সবাই।

মিসেস ওয়াকার বেরিয়ে যাওয়ার পর তিমিটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। চোর কে হতে পারে, অনুমানের চেষ্টা করল। এক পর্যায়ে কিশোর বলল, 'মারগোর হাতে একটা অদ্ভুত উল্কি দেখেছি, বুঝলে।' কি দেখেছে খুলে বলল সে। 'এর সঙ্গে তিমি চুরির কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'কি জানি,' হাত ওল্টাল টম। 'আমার মনে হয় না। কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে।'

'কয়টা কাকতালীয়?' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'হোগারফের বুকেও তিমি আঁকা আছে।'

দ্বিধা করল টম। 'তারপরেও আমি বলব কাকতালীয়। ও হলো উল্কি-মানব। যে কোন ছবি আঁকা থাকতে পারে। তিমি থাকলেই বা অবাক হওয়ার কি হলো?'

মানতে পারল না রবিন। 'তারপরেও...'

'আরও একটা তিমি আছে!' মুখের কাছে গিয়ে পিজা ধরা হাতটা থেমে গেছে মুসার।

সবাই তাকাল তার দিকে।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'তুমি বলেছ না, ক্রিটার বেনসনের কাছে মূর্তি বেচার প্রস্তাব দিয়েছে ব্ল্যাকরাইট বলে এক লোক?'

'হ্যাঁ, বলেছি। তাতে কি?'

'ব্ল্যাকরাইটও একটা তিমি!'

সাত

'কি করে জানলে?' প্রশ্ন করল বিস্মিত কিশোর।

'স্ক্রিম্‌শ থেকে,' জবাব দিল মুসা। 'বিদ্যাটা শিখতে গিয়ে তিমি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হয়েছে আমাকে। অনেক তথ্য জেনেছি। রীতিমত একজন তিমি বিশেষজ্ঞ বলতে পারো এখন আমাকে।''

তিক্ত কণ্ঠে রবিন বলল, 'কিশোরের মত লেকচার মারা শিখলে কবে থেকে?'

তার কথায় পাত্তাই দিল না মুসা। জ্ঞান দান করার একটা মজা আছে, সেইটাই উপভোগ করছে এখন সে। প্রফেসারি ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'অনেক জাতের তিমি আছে। প্রথমেই বড় দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—দাঁতওয়ালা তিমি, আর বেলিন বা ছাঁকনিওয়ালা তিমি। দাঁতওয়ালাদের মধ্যে রয়েছে স্পার্ম, কিলার, বটলনোজ এ সব। ছাঁকনিওয়ালাদের মধ্যে পড়ে তিমির বৃহত্তম প্রজাতি, নীল তিমি—টম আর বিড যেটা নিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছিল। এদের দাঁত নেই। মুখের মধ্যে বড় বড় সব পাতের মত রয়েছে, যেগুলো ছাঁকনির কাজ করে। মুখ হাঁ করে সাগরের পানিতে সাঁতার কাটতে থাকে নীল তিমি। টন টন পানি মুখে ঢুকে যায়। তাতে থাকে তিমির খাবার ক্রিল, কুঁচো চিংড়ি আর ছোট ছোট মাছ। মুখ বন্ধ করলে ছাঁকনি দিয়ে পানি বেরিয়ে যায়, আটকে থাকে খাবার। সেগুলো তখন গিলে ফেলে তিমি।'

'এ সব জানি,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'আসল কথা বলো। ব্ল্যাকরাইটের কথা শুনতে চাই।'

মিটিমিটি হাসছে মুসা। বইয়ের পোকা রবিন আর 'সবজান্তা' কিশোর পাশাও জানে না, এমন তথ্য তার কাছে আছে জেনে মজা পাচ্ছে। বলল, 'সেই কথায়ই তো আসছি।'

'তাহলে এত ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলা কেন বাপু?' অনুযোগ করল বিড।

'আমি তো তাড়াতাড়িই করতে চাই, তোমরাই দেরি করাচ্ছ।'

'হয়েছে,' গুঙিয়ে উঠল টম, 'বলো এবার।'

'বেশ, তিমির প্রজাতি ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজন মনে করছি না। বুঝলে বোঝো না বুঝলে ক্ষতি নেই। রাইট হোয়েল বলে একজাতের তিমি আছে। ওগুলোর একটা প্রজাতি কালো রঙের। এবং কালো বলেই নাম হয়েছে ব্ল্যাকরাইট।'

'ব্যস, এই?' হতাশ মনে হলো বিডকে।

'বিস্তারিত বলতে আর দিলে কই? খালি তো বাগড়া।' আবার পিজায় কামড় বসাল মুসা।

'এতেই চলবে,' কিশোর বলল। 'তথ্যটা জানিয়ে ভাল করেছ, মুসা। কোন সময় কাজে লেগেও যেতে পারে।' ঘড়ি দেখল সে। 'আমি আর রবিন বেরোব।

কারনিভালে যাব। তুমি যাবে না? ভাঁড়ামির চাকরি শেষ?'

'নতুন লোক জোগাড় করতে বলে দিয়েছি মিস্টার বুমারকে। মানুষকে হাসানো যা কঠিন কাজ রে ভাই! নিত্য-নতুন হাসির খোরাক কোথায় পাব? বুমার অবশ্য অনুরোধ করেছিলেন, রকি বীচে যতদিন কারনিভাল থাকবে, আমি যেন কাজটা করি। মানা করে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার কি স্ক্রিমশ?'

'না, ওটাও আর ভাল্লাগছে না। চলো, তোমাদের সঙ্গেই যাই।'

কারনিভাল শুরু হতে দেরি আছে। বুমারকে অনুরোধ করল কিশোর, 'মারগোর ওয়াগনটায় আরেকবার ঢুকতে চাই আমরা, মিস্টার বুমার।'

'কেন?'

'আরেকবার খুঁজে দেখতে চাই নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'বেশ, চলো, আমিও যাচ্ছি।'

চাবি দিয়ে তালা খুলে দিলেন বুমার। ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। বুমারও ঢুকলেন ওদের সঙ্গে।

একধার থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। ওয়াগনের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখবে, কোন জিনিস বাদ দেবে না। কি খুঁজছে জানে না কিশোর। তবে মনে হচ্ছে মূল্যবান কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারে।

একটা সময় আশা ছেড়ে দিল মুসা, 'নাহ্, কিছুই নেই।'

কিশোরও হাল ছেড়ে দিল।

কয়েকটা ম্যাগাজিন ঘাঁটছে রবিন। কোলের ওপর রেখেছে ম্যাগাজিনগুলো। একটা একটা করে দেখে ছুঁড়ে ফেলছে মারগোর বাংকে। ওরকম একটা ম্যাগাজিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল একটা পোস্টকার্ড। ওল্টানোর সময়ই রবিন দেখেছে ওটা, কিছু বোঝেনি। কিন্তু কিশোরের চোখ আটকে গেল ওটার ওপর। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল। হাতে নিল কার্ডটা।

স্যান ডিয়াগো থেকে পাঠানো হয়েছে। একটা মাত্র বাক্য লেখা। যার মানে করলে দাঁড়ায় **'পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠছে, বেলুগা।'**

'বেলুগা!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'তোমাদের বলেছিলাম! আশা করি এবার বিশ্বাস করবে?'

'কী?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'শ্বেত তিমির আরেক নাম বেলুগা। টমের মত বলো, এটাও কাকতালীয়?'

কিন্তু সে-রকম কিছু বলল না কিশোর। গম্ভীর হয়ে গেল। নিচের ঠোঁটে দ্রুত চিমটি কাটল দুইবার। বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হচ্ছে তিমির নামগুলো কোন ধরনের সঙ্কেত। এর মধ্যে রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি।' মনস্থির করে ফেলল সে, স্যান ডিয়াগোতে যাবে।

বুমার শুনে অ. উঠলেন, 'তাহলে আমার পকেটমার ধরবে কে?'

'চুরি আর হবে বলে মনে হয় না, মিস্টার বুমার। চোর ওই একজনই ছিল। কিংবা পালের গোদাটা ধরা পড়ায় ভয় পেয়ে অন্যেরা সটকে পড়েছে। তবে যদি মনে করেন এখানে এখনও গোয়েন্দা থাকা জরুরী, তাহলে দু-জন লোকের ব্যবস্থা

করতে পারি।'

'কে?'

'চেনেন ওদেরকে। বিড আর টম।'

'ওরা পারবে?'

'পারবে। টমের গোয়েন্দাগিরিতে ভাল অভিজ্ঞতা আছে। বিডও খারাপ না। তা ছাড়া ওদের বিশ্বাস করতে পারেন।'

ভেবে দেখলেন বুমার, 'ওরা রাজি হবে?'

'আমি বললে অবশ্যই হবে।'

'ঠিক আছে তাহলে। ওদের সঙ্গে কথা বলে আমাকে জানিয়ো।'

'জানাব।'

'আচ্ছা, শোনো, স্যান ডিয়াগোতে গিয়ে থাকবে কোথায়?'

'কোন হোটেল-টোটেলে,' জবাব দিল মুসা। 'থাকার জায়গার কি আর অভাব হবে নাকি?'

'হবে,' মাথা ঝাঁকালেন বুমার। 'তিমির সঙ্গে সম্পর্ক। মনে হচ্ছে নাবিকরা জড়িত আছে এতে। তোমাদের থাকতে হবে সাগরের ধারে, বন্দরের কাছাকাছি। ওখানে ভাল থাকার জায়গার খুব অভাব। এক কাজ করতে পারো। আমার এক বোন আছে, ওনিডা। তার বাড়ি আছে ওখানে। একা থাকে। তার কাছে গিয়ে থাকতে পারো।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' কিশোর বলল। 'অবশ্য তিনি যদি আমাদের থাকা খাওয়ার পয়সা নেন।'

বুমারের বোনের নাম-ঠিকানা লিখে নিল রবিন। বোনের নামে একটা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি।

কারনিভাল থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'থানায় চলো,' কিশোর বলল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল রবিন। 'থানায় কেন?'

'দরকার আছে।'

অফিসেই আছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। গোয়েন্দাদের দেখে অবাক হলেন। 'তোমরা?'

'স্যার,' কিশোর বলল, 'আপনার একটা সাহায্য দরকার।'

ভুরু কোঁচকালেন পুলিশ চীফ। 'কি সাহায্য?'

'সান্ধ্য কাগজগুলোতে একটা ভুয়া খবর ছাপতে দিতে হবে।'

একটা ভুরু উঁচু করলেন ক্যাপ্টেন, 'ফাঁসাতে চাও নাকি আমাকে? এত দিনের চাকরিটা খেতে চাও?'

'না, আপনার সুনাম আরও বাড়াতে চাই। পুলিশের কাজে সহযোগিতা করতে চাই। সে-জন্যেই চাই পুলিশও আমাদের সাহায্য করুক।'

'হুঁ,' মুচকি হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে। 'এই না হলে কিশোর পাশা। তো মিথ্যেটা কি বলতে হবে আমাকে?'

'রিপোর্টারদের বলতে হবে, চোরাই বেলুনগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা।

তিমিটা কি ভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বুঝে ফেলেছি।'

'এটা তো সত্যি কথাই, মিথ্যে হলো কি করে?'

'বলছি। আপনাকে বলতে হবে, তিমিটা কোথায় আছে তা-ও জেনে গেছি আমরা। জেনেছি, তিমিটা উধাও হওয়ার পেছনে বড় একটা রহস্য আছে। সেটা কি, তা-ও জানি। তিমিটা তুলে এনে আবার শো-এর ব্যবস্থা করা হবে শীঘ্রি।'

হাসি উধাও হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের ঠোঁট থেকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'আমি শিওর, কারনিভালের কিছু লোক এই তিমির সঙ্গে জড়িত। তবে শুধু ওরাই নয়, বাইরের লোকও জড়িত আছে। ফাঁকি দিয়ে ওদেরকে আড়াল থেকে বের করতে চাইছি।'

'যে ফন্দি করেছ, বেরোতে হয়তো পারে। কিন্তু সেই সাথে তোমাদের ওপরও নজর পড়ে যাবে ওদের। ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটাতে পারে।'

'এ ছাড়া ওদেরকে বের করে আনার আর কোন পথ নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। তবে কথা দিচ্ছি, সাবধানে থাকব আমরা।'

আবার চিন্তা করলেন ক্যাপ্টেন। মাথা ঝাঁকালেন। 'বেশ, বলব আমি মিথ্যে কথা। তবে যে মুহূর্তে বুঝবে জীবনের ওপর হামলা আসছে, সঙ্গে সঙ্গে সরে আসতে হবে।'

'আচ্ছা,' কথা দিল কিশোর।

ইয়ার্ডে এল তিন গোয়েন্দা।

মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা দু-জনের কেউই নেই। ফ্রেড ওয়ালকিনকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন। শহর দেখাতে নিয়ে গেছেন।

অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। ওঅর্কশপে বসে কথা বলতে লাগল তিনজনে।

বিকেল পাঁচটায় উঠে দুই সহকারীকে নিয়ে কয়েক ব্লক দূরের স্টেশনারি দোকানটায় এল কিশোর।

দোকানের মালিক হুবার্ট ওদের চেনে। দেখেই হাত নেড়ে ডাকল। কাছে গেলে বলল, 'পত্রিকায় তো নাম উঠে গেছে তোমাদের।'

'তাই নাকি?' অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর।

'এই তো, প্রথম পৃষ্ঠায়ই। দেখোনি?'

'না। কই, দেখি?'

পত্রিকার গাদার সবচেয়ে ওপরের পত্রিকাটা টেনে নিয়ে কাউন্টারে বিছাল হুবার্ট। 'এই যে, দেখো।'

পড়তে পড়তে গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল হুবার্ট।

'জানল কি করে ওরা?' ভুরু কুঁচকে বলল কিশোর। 'এখনও অনেক কাজ বাকি আমাদের। সব শেষ না করে...এই পত্রিকাওলারা বড় সাংঘাতিক! কি করে যে খবর বের করে ফেলে ওরাই জানে!'

হুবার্টকে ধন্যবাদ দিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'অভিনয়টা করলে কেন?'

'করলাম, হুবার্ট যাতে খবরটা আরও ছড়ায়।'

ইয়ার্ডে ফিরতেই ফোন বাজল। ধরল কিশোর। স্থানীয় একটা টিভি স্টেশন থেকে ফোন করেছে। ওদের সাক্ষাৎকার নিতে চায়, তিমিটার ব্যাপারে আলোচনা করবে।

দ্বিতীয় ফোনটা এল একটা রেডিও স্টেশন থেকে।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলো কিশোর।

আট

পরদিন স্যান ডিয়াগো রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। বিকেল বেলা পৌঁছল সেখানে। বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সি নিল। কিছুদূর এ োতেই মুসা লক্ষ করল, আরেকটা লাল গাড়ি ওদের পিছু নিয়েছে। চালাচ্ছে সোনালি চুল একটা মেয়ে। মেয়ে বলেই তেমন গুরুত্ব দিল না সে।

কিন্তু মিসেস ওনিডা কেলটনের বাড়িতে আসার পর আবার যখন ফিরে এল গাড়িটা, গুরুত্ব আর না দিয়ে পারল না। বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকবার করে যাতায়াত করল ওটা। এখন ওটাতে আরও দু-জন লোক। গাড়ি চালাচ্ছে সেই মেয়েটাই।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'আমাদের পেছনেই লেগেছে!'

ছোটখাট মানুষ মিসেস কেলটন। বুমারের কথা বলে নিজেদের পরিচয় দিতেই সাদরে গ্রহণ করলেন গোয়েন্দাদের। দোতলায় ওদের থাকার জায়গা করে দিলেন।

সেদিন আর বেরোতে মন চাইল না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

বেরোল পরদিন সকালে।

প্রথমেই এল মিউজিয়ামে। মুসার মতে, এটা খুব বিখ্যাত জাদুঘর। বিশেষ করে স্ক্রিম্‌শ শিল্পের জন্যে। অনেক পুরানো জিনিস আছে এখানে। তারপর যাবে বন্দরে। বেলুগার খোঁজ নিতে। প্রথমে ওখানেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিশোরের, মুসার চাপাচাপিতে এখানে এসেছে।

দেখার মত অনেক জিনিসই আছে মিউজিয়ামে। স্ক্রিম্‌শগুলোর দিকেই মুসা নজর দিল বেশি।

বেলা এগারোটা নাগাদ মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বন্দরের দিকে হেঁটে চলল ওরা। লাল গাড়িটা আসে কিনা নজর রেখেছে।

জেটির একধারে, ব্যস্ততা থেকে দূরে নোঙর করে আছে পুরানো আমলের তিমি শিকারিদের একটা জাহাজ। নাম **দি নারহোয়েল**। জাহাজের কাছে

ডাঙায় একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আড্ডা দিচ্ছে কয়েকজন নাবিক। রোদে পোড়া চামড়া, বহুদিন সাগরে কাটিয়ে আসার স্বাক্ষর।

এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। নীল শার্ট পরা একজনকে দেখাল। অন্য একটা বেঞ্চে বসে আছে। ফিসফিস করে বলল, 'ওই লোকটা লাল গাড়িতে ছিল না?'

ভাল করে দেখল মুসা আর রবিন। ওদেরও মনে হলো ওই লোকটাই, তবে নিশ্চিত হতে পারল না।

'এক কাজ করো, তোমরা জাহাজটায় ওঠোগে। আমি লোকটার সঙ্গে কথা বলে দেখি।' বেঞ্চটায় এসে বসল কিশোর। জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থেকে যেন আনমনেই বলল, 'খুব সুন্দর। পুরানো জাহাজ। নিশ্চয় অনেক ইতিহাস আছে এর।'

'তা আছে,' জবাব দিল নীল শার্ট পরা লোকটা।

'জাহাজটার ব্যাপারে জানে এমন কাউকে পেলে ভাল হত। কথা বলতে পারতাম।'

'এক ডলার দিলে নিয়ে যেতে পারি। জাহাজের ভেতরটাও দেখতে পারবে, কথাও বলতে পারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে এক ডলার বের করে দিল কিশোর।

'আমার নাম টপ,' হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল লোকটা।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল কিশোরের। এই লোকটার হাতেও মারগোর হাতে আঁকা তিমির ছবির মত একটা ছবি।

কিশোরকে নিয়ে জাহাজে উঠল টপ। ক্যাপ্টেনের পোশাক পরা একজনের সঙ্গে কথা বলছে মুসা আর রবিন, ওদের পাশ কাটিয়ে এগোল দ্রুত। বোঝা গেল জাহাজটা চেনে সে। বড় বড় কয়েকটা ডিঙি দেখাল, তিমির পিছু নেয়া হয় এগুলোতে করে। ইঁটের তৈরি অনেক বড় চুলা দেখাল, তিমির তেল বের করা হয় এই চুলায় বড় বড় কড়াই চাপিয়ে দিয়ে। প্রাচীন পদ্ধতি।

চট করে একবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখল কিশোর, গুটি গুটি এগিয়ে আসছে মুসা আর রবিন।

কিশোরকে ডেকের নিচে নিয়ে এল টপ। জাহাজের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে বিশাল এক তিমির মেরুদণ্ড। কোন প্রাণীর হাড় যে এতবড় হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বকবক করতে লাগল টপ। বলল, ওক কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে জাহাজটা। চ্যাপ্টা ফলাওয়ালা কতগুলো হারপুন দেখাল। বুঝিয়ে দিল, ওগুলো দিয়ে প্রথমে তিমিকে গাঁথা হয়। সরু, চোখা ফলাওয়ালা আরেক ধরনের হারপুন আছে, ওগুলো আহত তিমির হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে প্রাণীটাকে খুন করা হয়।

চকচকে সাদা দানবীয় হাড়টার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয়েছে অনেক মোটা একটা লোহার শেকল। নিচু হয়ে শেকলের রিঙগুলোতে হাত ছুঁইয়ে কিশোর বলল, 'সত্যি এগুলো তুলতে পারে মানুষ...'

বিচিত্র একটা শব্দে ঢাকা পড়ে গেল তার কথা। ঝট করে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে তিমির হাড়টা। পেছনে লাফ দিল সে।

মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে সরে গেল। মুহূর্ত আগে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেখানটায় পড়ল হাড়টা।

ছুটে এল মুসা আর রবিন। কিশোরকে ধরে তুলল। উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগল, 'ঠিক আছ তো তুমি! লেগেছে কোথাও! ভাঙেটাঙেনি তো!'

'আমি ঠিকই আছি! টপ গেল কোথায় দেখো!'

'গ্যাঙওয়ে দিয়ে চলে গেছে। হাড়টা ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দৌড় দিয়েছে।'

'এসো, ধরতে হবে!'

দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ডেকে উঠে এল ওরা। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট উঠে এসেছে এখন। তীরের কাছে যেখানে সাগরের ঢেউ ভাঙছে সেখানেও লোকের ভিড়।

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল রবিন, 'এই ভিড়ের মধ্যে ওকে বের করতে পারব না! তবে নামটা জেনেছি।'

তার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি করে?'

'ক্যাপ্টেন হ্যানসনের কাছ থেকে। ডেকে যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'হুঁ।'

টপের হাতেও যে উল্কি দিয়ে তিমি আঁকা আছে, সহকারীদের জানাল কিশোর। তারপর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চলল।

তাঁর জাহাজে অমন ঘটনা ঘটেছে, শুনে রেগে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'টপ হানিবারের সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। এখানকার কেউই কিছু জানে না। অনেকটা ভবঘুরে বলা চলে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, আপনারা তো তিমির ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। স্টাফ করা একটা তিমির কথা কিছু শুনেছেন কখনও?'

চিন্তা করলেন ক্যাপ্টেন। মাথা নাড়লেন। 'না, আমি শুনিনি। দাঁড়াও, দেখি।'

এগিয়ে গিয়ে জাহাজের গলুইয়ের কাছে দাঁড়ালেন তিনি। নিচে বেঞ্চে বসা একজন নাবিককে ডাকলেন, 'মারফি, শুনে যাও তো একটু।'

উঠে এল একজন বুড়ো নাবিক। স্টাফ করা তিমির কথা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

হাসল বুড়ো। সামনের অনেকগুলো দাঁত নেই। 'নিশ্চয় শুনেছি। চল্লিশ বছর আগে ভেসে এসে তীরে ঠেকেছিল একটা মরা তিমি। কারনিভালের এক লোক তুলে নিয়ে গিয়েছিল স্টাফ করার জন্যে।'

আগ্রহে এক পা এগিয়ে এল কিশোর। 'তার নাম বলতে পারেন?'

মাথা নাড়ল বুড়ো। ফিরে গেল তার বেঞ্চে।

'অনেক উপকার হলো, ক্যাপ্টেন,' কিশোর বলল। 'আরেকটা কথা। সেজউইক স্টোকস নামে কাউকে চেনেন?'

'সেজউইক? শুনেছি। নাবিকই ছিল। জাহাজে করে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কয়েক বছর আগে বেআইনী কি যেন করে পুলিশের তাড়া খেয়েছিল।'

'এখন কোথায় আছে জানেন?'

ক্যাপ খুলে নিয়ে মাথা চুলকালেন ক্যাপ্টেন। 'ঠিক জানি না। শুনেছি শহরের মাঝখানে কোথাও থাকে। সেটা অবশ্য দু-মাস আগের খবর।'

'ক্যাপ্টেন, কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে। অনেক উপকার করলেন।'

'না না, এ আর কি এমন...সেজউইকের কথায় আরেকটা কথা মনে পড়েছে। দুই দিন আগে আরও একজন এসে ওর খোঁজ নিয়ে গেছে।'

'কে?'

'রিক অ্যান্ডারসন।'

নয়

আরও কিছুক্ষণ বন্দরে ঘোরাঘুরি করে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করল গোয়েন্দারা। তারপর ফিরে এল মিসেস কেলটনের বাড়িতে। খাওয়া সেরে আবার বেরোল। নাবিকদের আড্ডাখানা, সস্তা রেস্টুরেন্ট, হোটেলগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগল টপ হানিবার আর রিক অ্যান্ডারসনের খোঁজে। কয়েকজন বলল টপকে চেনে, তবে গত ক'দিন ধরে দেখছে না। কোথায় আছে তা-ও বলতে পারল না।

মুসার তাগাদায় একটা ড্রাগস্টোরে ঢুকে সোডার অর্ডার দিল ওরা।

কিশোর আর রবিনেরটা অর্ধেক হওয়ার আগেই একটা শেষ করে আরেকটা সোডা চাইল মুসা। সেটাও শেষ করে ফেলল দেখতে দেখতে। বন্ধুদের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আসলে ইচ্ছে করে তাড়াতাড়ি করছি আমি, তা না। জিনিসটা এতই ভাল, আপনাআপনি চলে যাচ্ছে পেটের মধ্যে।'

হেসে ফেলল রবিন।

'আরও খাব।' তুড়ি বাজিয়ে বয়কে এদিকে আসতে ইঙ্গিত করল মুসা।

সোডা শেষ করে কয়েকটা গুদামের মত বাড়ি দেখিয়ে কিশোর বলল, 'আমরা ওদিকে যাচ্ছি। তুমি বসে *আপনাআপনি* চালাতে থাকো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না ফিরলে ভাববে বিপদে পড়েছি। উদ্ধার করতে যেয়ো।'

এই প্রস্তাবে খুব খুশি হলো মুসা। ঝিলিক দিয়ে উঠল তার সাদা দাঁত।

সন্ধ্যা ঘনাল। আঁধার নামছে। তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে যেন আকাশে কালো মেঘের দল। তার মধ্যে লুকোচুরি খেলছে একফালি বাঁকা চাঁদ।

'ব্যাটা কি গা ঢাকা দিল নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কে?'

'আর কে, টপ।'

'দিতে পারে। আরি, ওই দেখো! ওই তো, মুদী দোকানটার কাছে!'

আবছা অন্ধকারে রবিনও দেখল লোকটাকে। রাস্তার অন্য পাশ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। 'আরি, টপই তো!'

'আস্তে। শুনতে পাবে।'

রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চট করে একটা বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল

কিশোর। লোকটা কোনদিকে যায় দেখতে চায়।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে টপ। যেন কেউ দেখে ফেলার ভয় করছে। সাগরের কিনারে একটা ছাউনির দিকে এগিয়ে গেল। কেউ চোখ রাখছে কিনা আরেকবার দেখে নিয়ে দরজা খুলে চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ছুটে গেল দুই গোয়েন্দা।

ঘরে আলো নেই। মনে হলো, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে লোকটা।

পনেরো মিনিট পর অস্থির হয়ে উঠল রবিন। সত্যি আসবে তো?

এল ওরা। দুই জন। আবছা দুটো ছায়ামূর্তি, একজনের তুলনায় আরেকজন বিশালদেহী। পা টিপে টিপে এগোল জরাজীর্ণ ছাউনিটার দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে চারবার আলতো টোকা দিল একজন। দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল সে। পেছনে তার সঙ্গী।

হ্যারিকেনের আলো জ্বলল ভেতরে। দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল পাতলা একফালি আলো।

সেখান দিয়ে উঁকি দিল কিশোর আর রবিন।

পায়চারি করছে তিনজন লোক। একজন রয়েছে দরজার কাছাকাছি। চিনতে পারল তাকে গোয়েন্দারা। লাল গাড়ির সেই লাল-চুল মেয়েটা।

'ডিউক!' কথা বলল টপ।

ফিরে তাকাল বিশালদেহী লোকটা, 'কি?'

পরের কথাটা এত নিচু স্বরে বলল টপ, বাইরে থেকে বোঝা গেল না। ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে অন্য আরেকজনকে চোখে পড়েনি এতক্ষণ গোয়েন্দাদের, এবার পড়ল। অল্প বয়েসী এক তরুণ, কিশোরদের চেয়ে সামান্য বড় হবে। মাথায় বালিরঙা চুল। কোন দিক দিয়ে ঢুকল সে, এতক্ষণ কোথায় ছিল, বোঝা গেল না। ওদিকে মেয়েটা গায়েব। তাকে এখন চোখে পড়ছে না।

'কাজটা শেষ হলে বাঁচি!' ছেলেটা বলল।

'কি করে করবে? উপায় নেই, কিটি।'

'শেষ করে দিলেই তো হয়! খামাখা বসে বসে সময় নষ্ট!'

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল ওদের। কথা থেকে বোঝা গেল, ছেলেটার নাম কিটি নুবার। কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে সে। শেষে বলল, 'দূর, এখানে থেকে আর কি করব! চলো, যাইগে!'

গটমট করে দরজার কাছে এসে হ্যাঁচকা টান মেরে খুলে বেরিয়ে এল সে। আরেকটু হলেই বাড়ি খেয়েছিল গোয়েন্দাদের গায়ে। উত্তেজিত রয়েছে বলে ওদেরকে চোখে পড়ল না। এগিয়ে গেল।

হ্যারিকেন নিভিয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্য দু-জনও। পথের মোড়ে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। চলে গেল গাড়িটা।

'ওদের পিছু নিতে পারলে ভাল হত,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

'গাড়ি ছাড়া নেব কি ভাবে?' কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'কিশোর! কারনিভালে সে-রাতে ফোন বুদের ওপর নজর রেখেছিলাম মনে আছে! উঁকিঝুঁকি মারছিল একজন, বলেছি! সে কিটি!'

'ঠিক চিনেছ?'

'চিনেছি।'

'হুঁ। ভাবছি কোন কাজটা শেষ করার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠল সে?'

'বুঝলাম না। হবে হয়তো তিমিটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছু। একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম—শুধু কারনিভালের কয়েকজনই তিমি চুরির সঙ্গে জড়িত নয়, বিরাট একটা দল আছে এর পেছনে। কেন চুরি করেছে এখন সেটাই প্রশ্ন। এলাম বেলুগার খোঁজ নিতে, বেরোল টপ, কিটি আর ডিউক। আরও কতজন বেরোবে কে জানে! কেঁচো খুঁড়তে অজগর বেরোবে মনে হচ্ছে।'

'আস্তে আস্তে সব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, কিশোর। আজ আরেকটু হলেই তিমির হাড়ে চাপা পড়ে মারা যেতে তুমি। যাদের বিরুদ্ধে লেগেছি তারা খুনী, খুন করতেও দ্বিধা করে না। পুলিশকে গিয়ে বলা দরকার।'

'কি বলব? কিছুই তো জানি না আমরা।'

'তিমির হাড় ফেলে তোমাকে মারতে চেয়েছিল টপ, এ কথাটা তো অন্তত বলতে পারব।'

'প্রমাণ কি? সে স্রেফ অস্বীকার করবে। বলবে সে ফেলেনি, আপনাআপনি পড়েছে ওটা, অ্যাক্সিডেন্ট। পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই। এসো, ভেতরে ঢুকে দেখি।'

ঘরে ঢুকে দেশলাই জ্বেলে হ্যারিকেন ধরাল কিশোর।

দুটো জিনিস আবিষ্কার করল ওরা। একটা লাল পরচুলা, আরেকটা বেত—বুমারের কারনিভালের জিনিস, স্যুভনির।

দশ

পরচুলাটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'তারমানে কিটিই মেয়েমানুষ সেজে ছিল। তাই তো বলি, হঠাৎ করে একজন গায়েব হয়ে গিয়ে আরেকজন উদয় হলো কি করে!'

'আর এই বেতের কি মানে?'

'ওদের অন্তত একজন বুমারের কারনিভালের লোক।'

আরও খোঁজাখুঁজি করল ওরা। কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না ছাউনিতে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'বেলুগা কে, তার আসল নাম কি, এখনও জানি না আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

আর কিছু করার নেই এখানে। ঘড়ি দেখল কিশোর। প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। দেরি করলে মুসা এসে হাজির হতে পারে। বেরিয়ে এল ওরা।

ড্রাগস্টোরে এসে দেখল এক মজার কাণ্ড ঘটছে। দশ-বারোজন ওদেরই মত কিশোর আর তরুণ মুসাকে ঘিরে রেখেছে।

একজন বলল, 'নিশ্চয় পারবে।'
আরেকজন বলল, 'আস্তে আস্তে খাও।'
তৃতীয়জন বলল, 'আমার মনে হয় না অসুবিধে হবে। এখনও তোমার পেটে প্রচুর জায়গা আছে।'
চতুর্থজন বলল, 'আরে দেখোই না চেষ্টা করে, চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারো।'
ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে রবিন আর কিশোর দেখল, গুম হয়ে চেয়ারে বসে আছে মুসা। ওদের দেখে দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল।
'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।
'সোডা খাওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করছে ও,' বলে টেবিলে সারি দিয়ে রাখা কতগুলো সোডার বোতল দেখাল একটা ছেলে।
গুনে দেখল রবিন। 'এত গুলো বোতল শেষ করেছ তুমি!'
রবিনের কনুইয়ের কাছ থেকে বলে উঠল একটা মেয়ে, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? ও-ই খেয়েছে। এবং এখনও তার খাওয়া শেষ হয়নি।'
'ঠিক,' বলল এক তরুণ। 'সবচেয়ে বড় বোতলটা বাকি এখনও।'
কিশোর আর রবিনের কাছে যেন কৈফিয়ত দিল মুসা, 'কি করব, এত ভাল সোডা জিন্দেগীতে খাইনি। খেতে খেতে কখন যে শেষ করে ফেললাম···স্টোরের মালিকের চোখে পড়ে গেল সেটা। এখন আরও খেতে চাপাচাপি করছে।'
কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো লোকটা হাসল। সে-ই মালিক। কিশোরকে বলল, 'তোমার এই বন্ধুটি একজন জিনিয়াস। খাওয়ার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। আমি শিওর, যে কোন খাওয়ার প্রতিযোগিতায় সে চ্যাম্পিয়ন হবে।'
মুসা বলল, 'আমি তাকে বললাম, যে অতটা বাহাদুর আমি নই। কিছুতেই শুনবে না। তার বানানো সবচেয়ে বড় সোডাটা খেতে হবে আমাকে। তাহলে কোনটারই পয়সা নেবে না। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, মাপ চাই, আর পারব না।'
গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে, 'পারবে! অবশ্যই পারবে! নিশ্চয় পারবে! তুমি না পারলে আর কে পারবে।'
'তাহলে এনে দেব বড় বোতলটা?' হেসে জিজ্ঞেস করল মালিক।
নিচের ঠোঁট কামড়াল মুসা। ভাবছে, এতটাই যখন সম্মান দেয়া হচ্ছে, দেখবে নাকি চেষ্টা করে?
একজন বুদ্ধি দিল, 'কাজ করো; রাস্তায় গিয়ে একটা দৌড় দিয়ে এসো। পেট খালি হয়ে যাবে। তাহলেই পারবে।'
বুদ্ধিটা ভালই মনে হলো মুসার। হাসি ফুটল মুখে। উঠে দাঁড়াল।
'যদি বমি করে পেট খালি করে ফেলে?' সন্দেহ প্রকাশ করল মেয়েটা। 'কিংবা পালায়?'
তিক্ত হয়ে গেল মুসার মন। 'এই মেয়েগুলোর যত কুচুটে বুদ্ধি!' না ভেবে পারল না সে।
'আমি সঙ্গে যাব,' তৈরি হয়ে গেল একজন।
গেল আসলে দুইজন।
মিনিট দশেক পর মুসাকে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে ফিরে এল তার দুই

সঙ্গী। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মুসা—রকি বীচের মান রাখতেই হবে তাকে। মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটাকে ইশারা করল সোডার বোতল আনার জন্যে।

আনার লোকের অভাব হলো না। হই হই করে কয়েকজন ছুটে গেল নিয়ে আসার জন্যে।

বিরাট বোতল। চার রকমের সুগন্ধী দেয়া, প্রচুর পরিমাণে নানা জাতের বাদাম আর ফলের কুচি মেশানো। আধ ইঞ্চি পুরু মাখনের দলা ভাসছে ওপরে, তার ওপরে যেন চুপটি করে বসে আছে টুকটুকে লাল এক চেরিফল।

চামচ তুলে নিল মুসা। তলোয়ার হাতে নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা শত্রুর ঘাড়ে কোপ মারার আগে যে দৃষ্টিতে তাকায় যোদ্ধা, সেই ভঙ্গিতে তাকাল সোডার দিকে। তারপর খেতে আরম্ভ করল।

স্তব্ধ হয়ে গেল গুঞ্জন। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে প্রতিটি দর্শক। ভয় হলো কিশোরের, পেট ফেটে না মারা যায় মুসা!

খেয়েই চলেছে সে, খেয়েই চলেছে। থামাথামি নেই।

বোতলের অর্ধেক খালি হয়ে গেল। জোর গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে।

চার ভাগের এক ভাগ রইল আর।

আরও জোরে গুঞ্জন উঠল। পিঠ চাপড়ে বাহবা আর উৎসাহ দিল তাকে কয়েকজন।

আইসক্রীমের শেষ টুকরোটা যখন মুখে পুরল মুসা, ফেটে পড়ল যেন সারা ঘর। হাততালি, চিৎকার আর শিসের শব্দ শোনা যেতে লাগল চারপাশ থেকে।

এই বুনো উল্লাস ভাল লাগল না কিশোরের। এই ধরনের ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতাগুলো কোনদিনই ভাল লাগে না তার। মারাও যেতে পারত তার বন্ধু।

জোর করে তাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল সে। পেছন পেছন আসতে লাগল মুসার ভক্তরা। দেড় ব্লক মত আসার পর শেষ ভক্তটিও যখন খসে পড়ল, বকা লাগাল তাকে কিশোর, 'কাজটা মোটেও উচিত করোনি তুমি, মুসা!'

'বাদ দাও,' হাত নাড়ল মুসা। 'ব্যাটাদের দেখিয়ে তো দিলাম। বহুদিন মনে রাখবে। তা তোমরা কতটা করে এলে?'

'লাল-চুল মেয়েটা একজন ছেলে,' রবিন বলল।

অবাক হলো মুসা। 'খাইছে! তাই নাকি?'

সব কথা খুলে বলল রবিন।

শোনার পর মুসা বলল, 'ওহ্হো, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। স্ট্রেচ বিটার এসেছিল তোমাকে খুঁজতে।'

'আমাকে!' কিশোর অবাক।

'হ্যাঁ। কোথায় উঠেছি জানে সে। বলল, ওখানে দেখা করবে।'

'তুমি কিছু জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছি। কেবল বলল, মিস্টার বুমার পাঠিয়েছেন।'

'আশ্চর্য!'

মিসেস কেলটনের বাড়িতে ওদের সঙ্গে দেখা করল বিটার। জানাল, মেসেজ পাঠিয়েছেন বুমার—রকি বীচ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অন্য এক জায়গায় চলে যাচ্ছে কারনিভাল। কোন প্রয়োজন হলে যেন সেখানে তাঁর খোঁজ করে কিশোররা।

শুধু এই কথাটা বলার জন্যে এত দূরে স্যান ডিয়াগোতে লোক পাঠালেন বুমার? অবাক লাগল গোয়েন্দাদের।

'আর কিছু বলেননি?' জানতে চাইল কিশোর।

'একটা নোট লিখে দিয়েছেন,' বলে পকেট হাতড়াতে শুরু করল বিটার। উদ্বেগ ফুটল মুখে। 'হায় হায়, মনে হচ্ছে হারিয়ে ফেলেছি!'

কোন পকেটেই নোটটা খুঁজে পেল না সে। কি লিখেছেন বুমার, বলতেও পারল না।

কি আর করা? চিন্তিত হয়ে পড়ল কিশোর। নিশ্চয় জরুরী কোন কিছু, নইলে বিটারকে পাঠাতেন না।

রাতে একই ঘরে শুলো ওরা চারজন।

পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। বিটারের বিছানার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল। খালি বিছানা। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাথরুমে খুঁজে এল। সেখানেও নেই সে। তবে কি পালাল? না বলে এ ভাবে চলে যাওয়ার অর্থ কি? মুসা আর রবিনকে ডেকে তুলল সে।

বিটারের বালিশের নিচ থেকে বেরোল তার মানিব্যাগটা। রাতে রেখেছিল যে, সকালে পালানোর সময় নিশ্চয় আর মনে ছিল না।

আরও অবাক হলো ওরা, যখন মানিব্যাগের ভেতর থেকে বেরোল এক টুকরো কাগজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে আঁকা একজন মানুষের মুঠি। বুড়ো আঙুলের গোড়া, তর্জনীর গোড়া আর ডগায় আঁকা তিনটে আলাদা নকশা, এক করায় হয়ে গেছে একটা তিমির ছবি।

দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি মনে হয় বিটারকে?'

'বিশ্বাসঘাতক!' একসঙ্গে জবাব দিল মুসা আর রবিন।

এই সময় খুলে গেল দরজার পাল্লা। ঘরে ঢুকল বিটার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাসে উঠতে যাব, এই সময় মনে পড়ল মানিব্যাগটা ফেলে গেছি।...ও, পেয়ে গেছ তোমরা!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'এটাও পেয়েছি।' কাগজটা দেখাল সে।

'এটা কি?'

'সে-কথা তো আপনি আমাদের বলবেন।'

'আরি, এটাই তো মিস্টার বুমার আমাকে দিয়েছিলেন! খুলেও দেখিনি! মানিব্যাগে গেল কি করে? তবে কি ভুলে ওতেই রেখেছিলাম? যাই হোক, বাঁচলাম, হারায়নি। মিস্টার বুমার আমাকে আস্ত রাখতেন না। হোগারফের বাংকের কাছে পাওয়া গেছে। জরুরী কোন সূত্র ভেবে সেটা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে বিটারের দিকে তাকাল কিশোর। 'কিছু না বলে সকাল বেলা চোরের মত ওভাবে পালালেন কেন?'

'পালালাম কোথায়? তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছেন মিস্টার বুমার। তোমরা

ঘুমাচ্ছিলে। ডেকে আর বিরক্ত করলাম না।'

বিটার বেরিয়ে গেলে রবিন বলল, 'কি মনে হয় তোমার, কিশোর?'

'জানি না। সত্যিও বলতে পারে, কিংবা মিথ্যে। অনেকগুলো রহস্য এসে জট পাকিয়েছে একখানে। কোনটা আগে ছাড়াব বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে তিমিটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমস্ত রহস্যের জবাব।'

'এক কাজ করতে পারি কিন্তু। পত্রিকা অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে পারি তিমিটার ব্যাপারে। অতবড় এক তিমি এসে তীরে ভিড়ল, সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্টাফ করল কারনিভালের লোক, ব্যাপারটা নিশ্চয় নিউজ হয়ে গিয়েছিল। পুরানো পত্রিকা ঘাঁটলে সূত্র মিলতে পারে।'

'খুব ভাল কথা মনে করেছ! আজই যাব পাবলিক লাইব্রেরিতে।'

এগারো

নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতেই ওদেরকে নিয়ে এল লাইব্রেরিতে।

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল ডেস্কে বসে আছে একটা মেয়ে। লাইব্রেরিয়ানের সহকারী। জিজ্ঞেস করতে পুরানো খবরের কাগজের মাইক্রোফিল্মগুলো কোন অংশে আছে দেখিয়ে দিল সে।

মারফি বলেছে চল্লিশ বছর আগে তীরে ঠেকেছিল তিমিটা। তারমানে অত বছর আগের পত্রিকাগুলো ঘাঁটতে হবে। কাজে লেগে গেল ওরা। জটিল কাজ। অনেক ধৈর্য দরকার।

কত লোক আসছে যাচ্ছে লাইব্রেরিতে। নীরবে সরে যাচ্ছে বড় দেয়াল ঘড়িটার কাঁটাগুলো। কিন্তু আর কোন দিকে মন নেই কিশোর আর রবিনের, মোটা মোটা ইনডেক্সগুলোর পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে ওরা।

মুসার এই কাজে তেমন মন নেই, একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগছে। সে কেবল উসখুস করছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। দেখল, লম্বা একটা টেবিলের ওধারে বসে পত্রিকা পড়ার ভান করছে অল্প বয়েসী এক তরুণ, আর বার বার ওদের দিকে তাকাচ্ছে। কেমন চেনা চেনা লাগল মুসার। সন্দেহ হলো, ওদের ওপরই চোখ রাখছে। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে রবিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সে।

লোকটার দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল রবিনের হাত। ফিসফিস করে বলল, 'আরে, ও-ই তো কিটি নুবার!'

কথা শুনতে না পেলেও ছেলেদের ভাবভঙ্গিতে বুঝে ফেলল নুবার, সে ধরা পড়ে গেছে। আর মুহূর্ত দেরি না করে উঠে দাঁড়াল। ওর নাকের ডগায় কালো একটা বড় অদ্ভুত তিল নজর এড়াল না গোয়েন্দাদের।

ঘুরে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল নুবার।

লাফিয়ে উঠে মুসাও তার পিছু নিল। কিশোর আর রবিনও বসে থাকল না।

হলে পৌঁছে নুবারকে হারিয়ে ফেলল মুসা। ওপরে আর নিচে যাওয়ার সিঁড়ি দুটো সহ মোট পাঁচটা পথ আছে হল থেকে বেরোনোর। কোনটা দিয়ে গেছে নুবার?

নিচে নামার সিঁড়ির দিকে ছুটল মুসা। তার পেছনে কিশোর আর রবিন।

এগিয়ে এল একজন গার্ড। 'অ্যাই, এ ভাবে ছোটাছুটি করছ কেন? লাইব্রেরিতে গোলমাল করা নিষেধ।'

'জানি,' জবাব দিল কিশোর। 'একটা ক্রিমিনাল ঢুকেছিল এখানে, তাকে ধরার চেষ্টা করছি।' নুবারের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখেছেন নাকি?'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'না। আমি এইমাত্র এলাম ম্যানুস্ক্রিপ্ট রুম থেকে।'

দেরি হয়ে গেছে। কোন পথে গেছে নুবার জানা থাকলেও এখন তাকে ধরা কঠিন হত। তাকে আপাতত পাওয়ার আশা ত্যাগ করে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল গোয়েন্দারা।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রবিন আবিষ্কার করল লেখাটা।

খুব ছোট্ট সংক্ষিপ্ত খবর। জানা গেল, ওটা নীল তিমিই ছিল। তুলে নিয়ে গেছে অ্যাবারিন গাউফ নামে এক লোক, সার্কাস কোম্পানির মালিক, স্টাফ করে রেখে মানুষকে দেখানোর জন্যে।

আর কোন তথ্য পাওয়া গেল না। তবে যা পেয়েছে যথেষ্ট। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে কাছেই একটা পার্কে বসল ওরা আলোচনার জন্যে।

কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস এই তিমিটাই আমাদের হারানো তিমি। গাউফকে পেলে কাজ হত। অনেক কিছু জানা যেত।'

'অনেক দিন আগের কথা,' রবিন বলল। 'এতদিন বেঁচে থাকলে হয়। অনিশ্চিতের পেছনে ছোটাছুটি করে মরার চেয়ে আসল লোকটাকে এখন খুঁজে বের করা দরকার—সেজউইক স্টোকস। কি বলো, কিশোর?'

'হ্যাঁ। বেলুগাকেও খুঁজতে হবে।'

ক্যাপ্টেন হ্যানসনের কাছ থেকে তিনটে ঠিকানা লিখে এনেছে রবিন, যে সব জায়গায় বৃদ্ধ নাবিকেরা বাস করে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে প্রথম ঠিকানাটা বলল সে। পনেরো মিনিট পর তিন তলা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। জানালার শাটার আর শিক সাদা রঙ করা। সদর দরজার পাশে লেখা কথাটার বাংলা করলে দাঁড়ায়: **বৃদ্ধ নিবাস**।

ভেতরে ঢুকে ডেস্কে বসা ক্লার্কের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'দেখুন, বৃদ্ধ একজন নাবিককে খুঁজছি আমরা। তাঁর নাম সেজউইক স্টোকস। তিনি কি এখানে থাকেন?'

'থাকত। সাত-আট দিন হলো চলে গেছে। কবে আসবে বলে যায়নি।'

'ও। অবশ্য তাঁর বন্ধুকে পেলেও চলে আমাদের। রিক অ্যান্ডারসন। তিনি আছেন?'

'তা বোধহয় আছে। সেজউইক চলে যাওয়ার দুই দিন পর এসেছে। তার কাছে কি দরকার?'

'ব্যক্তিগত।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন ভাবল ক্লার্ক রুম নম্বর দেবে কিনা, তারপর দিয়ে দিল।

ক্লার্ককে ধন্যবাদ দিয়ে মুসা আর রবিনকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল কিশোর। নম্বর বের করতে সময় লাগল না। ঘরের দরজার সামনে কান পাতল সে। কোন শব্দ নেই ভেতরে।

দরজার কাছ থেকে সরে এল সে। ফিসফিস করে বলল, 'লোকটা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা দু-জন দরজার দু-পাশে দাঁড়াও। আমি টোকা দিচ্ছি।'

প্রথমবার টোকা দেয়ার পর সাড়া এল না।

থাবা দিল কিশোর।

জবাব এল এবার, 'কে?'

খুলে গেল দরজা।

মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল তিনজনে।

'খাইছে! আপনি!' বলে উঠল মুসা।

বারো

'তোমরা এখানে কি করছ?' জানতে চাইলেন গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন। ছেলেদের দেখে তিনিও ওদেরই মত অবাক হয়েছেন। দ্রুত একবার বারান্দার এদিক ওদিক দেখে নিলেন কেউ তাকিয়ে আছে কিনা। হাতের ইশারায় ওদের ঢুকতে বলে ভেতরে সরে গেলেন।

পুরানো পোশাক পরেছেন সাইমন। চুলে আর মুখে রঙ করে চেহারাটাকে বয়স্ক করে তুলেছেন, বৃদ্ধ নিবাসে থাকার উপযোগী। খুব বেশি পরিচিত কেউ না হলে চট করে দেখে তাঁকে চিনতে পারবে না। বাঁ হাতে উল্কি দিয়ে আঁকা একটা নোঙর।

হেসে ফেলল কিশোর। নোঙরটা দেখিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি, নাবিকের ছদ্মবেশটা জোরাল করার জন্যে এঁকেছেন। পরে উঠবে তো?'

সাইমনও হাসলেন। 'উঠবে। নকল কালি দিয়ে আঁকা।'

'আপনিই তাহলে রিক অ্যান্ডারসন,' রবিন বলল।

'কার কাছ থেকে খবর পেলে?' জানতে চাইলেন সাইমন।

আরাম করে সোফায় বসে তাঁকে সব কথা জানাল তিন গোয়েন্দা। সেজউইক স্টোকসের সঙ্গে হাতির দাঁতের মূর্তিটার কি সম্পর্ক, কিছু জানেন কিনা সাইমনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ক্রিটার বেনসনের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেটার খামের মুখ আটকানো ছিল টেপ দিয়ে। তাতে আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করেছি আমি। জানলাম ওই ছাপ সেজউইক স্টোকসের। তার ওপর তোমাদেরও চোখ পড়ল কেন?'

মারগোর ওয়াগনে পাওয়া কাগজের টুকরোটার কথা জানাল রবিন, যেটাতে স্টোকসের নাম লেখা আছে।

'তারমানে মারগোর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। আরও একটা লোকের সঙ্গে থাকতে পারে। টপ হানিবার।'

'আপনিও তাকে চেনেন?'

'ঠিক চিনি না। তবে জেনেছি টপ হানিবারের সঙ্গে কথা বলার পরই তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে গেছে স্টোকস। তোমরা টপকেও চেনো মনে হচ্ছে?'

কি করে টপের সঙ্গে দেখা হয়েছে জানাল কিশোর। বলল, 'এখন তো মনে হয় আপনার আর আমাদের কেসটা একই কেস। তিমি চুরির সঙ্গে মূর্তি নিখোঁজের কোন সম্পর্ক আছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল রবিন।

হাসলেন সাইমন। মুসার দিকে তাকালেন। 'প্রথম কাজ কিছু খেয়ে নেয়া।'

'ঠিক বলেছেন!' চটাস করে তুড়ি বাজাল মুসা। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে নিচে নামলেন সাইমন। ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল, 'ওরা আপনার কি হয়?'

'দেশের লোক,' হেসে জবাব দিলেন সাইমন। 'খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'যান।'

ইঁদুরের মত ছুঁচাল মুখওয়ালা এক লোক হাতে একটা ময়লা কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। ক্লার্ককে বলল, 'স্টোকসের পুরানো শার্ট আছে কয়েকটা। কি করব এগুলো?'

'আমি কি জানি?' হাত ওল্টাল ক্লার্ক। 'রাখার জায়গা না থাকলে ফেলে দাও। পুরানো কাপড় রাখার গুদাম খুলে বসিনি আমরা।'

'ব্যাগটা স্টোকসের? শিওর জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন সাইমন।

'হ্যাঁ,' ইঁদুর মুখো লোকটা জবাব দিল। 'একগাদা ময়লা শার্ট।'

'তার ঘরে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ফেলে দেয়াটা ঠিক না। হয়তো ভুলে রেখে গেছে। দিন, আমার কাছে দিন। আমি রেখে দেব।'

ব্যাগটা সাইমনকে দিয়ে দিল ক্লার্ক। ঝামেলা মুক্ত হলো।

'ঘরে রেখে আসি,' বলে সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন ডিটেকটিভ। তাঁর সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন সাইমন। ব্যাগ উপুড় করে কাপড়গুলো ঢেলে দিলেন মেঝেতে। বললেন, 'ভাগ্য ভাল হলে এর মধ্যে সূত্র পেয়ে যেতে পারি।'

মোট বারোটা শার্ট। কয়েকটা অতিরিক্ত পুরানো—ছেঁড়া, দাগ লাগা।

শার্টগুলোর পকেট হাতড়াতে শুরু করল সবাই মিলে।

'দেখুন তো এটা!' পুরানো একটুকরো কাগজ সাইমনের দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা।

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল রবিন আর কিশোর।

জোরে জোরে পড়লেন ডিটেকটিভ:

> 'যতই দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে
> বুঝতে পারছি না। হংকঙের কাজটা বোধহয় মার খেতেই চলল।
> কি ঘটে না ঘটে জানাব। ডার্ক বিলি।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'বিলি তাহলে মূর্তি চোরদের একজন। কিন্তু এখন জেনে আর কি হবে? সে তো মৃত।'

খবরটা সাইমনের কাছে নতুন।

বাকি শার্টগুলোর পকেটও তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। ব্যাগের ভেতরে হাতড়ে দেখল কিশোর। কিছু না পেয়ে টেনে ভেতরের দিকটা বের করে এনে উল্টে ফেলল ব্যাগটা। পাওয়া গেল আরও তথ্য। নিচের জোড়ার সেলাইয়ের কাছে ইনডিয়ান ইংক দিয়ে লেখা:

উল্কি তিমির সমাজ:

ব্ল্যাকরাইট, বেলুগা, ব্লু, বটলনোজ এবং পিগমি।

মাথা দোলালেন সাইমন। 'আঙুলের ছাপ থেকে বোঝা গেছে স্টোকসের সাঙ্কেতিক নাম ব্ল্যাকরাইট। বাকিগুলো কাদের? টপ হানিবার? মারগোও এই দলের?'

'সত্যি কি তিমি সমাজ বলে কোন দল আছে নাকি? নাকি এটাও কোন পুরানো ডাকাত দলের সাঙ্কেতিক নাম?' রবিনের প্রশ্ন। 'পুলিশকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এই কৌশল করেছে?'

'অসম্ভব না।' একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন সাইমন। তারপর বললেন, 'কিশোর, একটা কাজ করবে? লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যাবে?'

'আপনি বললে যাব। কি দরকার?'

'তিমি সমাজের খোঁজ নিতে হবে। ওখানকার পুলিশের কাছে গায়ে উল্কি আঁকা অপরাধীদের বিশাল রেকর্ড আছে। প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ অপরাধীকে পাকড়াও করে তারা। তাদের মধ্যে উল্কি আঁকা অপরাধী থাকে প্রচুর। সবার রেকর্ড রেখে দেয় পুলিশ।'

'আজকেই যেতে বলেন?'

'যাও।'

'মুসা, কিশোর আর রবিন যাক। তুমি থাকো। আমার একজন সহযোগী দরকার।'

'বেশ, থাকব,' জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু কথা হলো, আর কতক্ষণ না খেয়ে থাকব?'

'তাই তো! তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। খিদের ঘড়িটা তো আসলে তোমার কাছে। আমাদেরগুলো সব বেকার।'

ভাল একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে খাবার খেল ওরা।
এরপর কি করতে হবে বলে দিলেন সাইমন।

ট্যাক্সি নিয়ে মিসেস কেলটনের বাড়ি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল তাঁর বাড়ি থেকে। ওদেরকে খুব পছন্দ হয়েছে মিসেস কেলটনের। স্যান ডিয়াগোতে এলে যেন আবার তাঁর বাড়িতে ওঠে, বলে দিলেন।

সুটকেস নিয়ে মুসা চলে গেল বৃদ্ধ নিবাসের দিকে। কিশোর আর রবিন চলল বিমান বন্দরে।

সেখানে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নেমে টারমিনালের দিকে এগোতে এগোতে রবিন বলল, 'কি মনে হয়, কিশোর, লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে কাজ হবে?'

'হতে পারে। ক্রিটার বেনসনকে নিয়ে বেশিদিন মাথা ঘামাবে না ব্ল্যাকরাইট। একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে ওদের চলবে না। আমেরিকায় আরও অনেক ধনী সংগ্রাহক আছে, যারা বেনসনের মত সৎ নয়। ওদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করলে মূর্তিটা বেচে ফেলতে পারবে সে। অহেতুক একজনের আশায় বসে থাকবে কেন?'

টিকেট কাউন্টারে এসে জানা গেল লস অ্যাঞ্জেলেসের প্লেন ছাড়তে ঘণ্টা চারেক দেরি আছে। টিকেট কেটে বসে থাকা ছাড়া গতি নেই। সুটকেসে ট্যাগ লাগিয়ে কনভেয়র বেল্টে ছেড়ে দিয়ে মেইন লবিতে চলে এল দু-জনে। নিউজস্ট্যান্ড থেকে দুটো ম্যাগাজিন কিনে নিয়ে এসে বসল নির্জন একটা জায়গায়। অনেকগুলো চেয়ার ফেলে রাখা হয়েছে ওখানে।

ম্যাগাজিনে ডুবে গেল ওরা। খসখস শব্দ হলো পাশের চেয়ার থেকে। মুখ তুলল না একজনও। পড়ায় মগ্ন।

ভোঁতা গলায় কথা বলল লোকটা, 'অ্যাই বিচ্ছুরা!'

চমকে মুখ তুলে তাকাল দুই গোয়েন্দা। কিশোরের পাশে বসে আছে ডিউক। রবিনের পাশে কিটি নুবার। এত খোলাখুলিতে যখন এসেছে, নিশ্চয় তৈরি হয়েই এসেছে, ভাবল কিশোর। চুপ করে বসে রইল। রবিনকেও চুপ থাকতে ইশারা করল।

'বুদ্ধি আছে,' ডিউক বলল। 'মারামারিতে যাওয়া উচিত না, বুঝতে পেরেছ।'

নুবার বলল, 'এবার লক্ষ্মী ছেলের মত উঠে চলে এসো তো আমাদের সঙ্গে।'

'কেন?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কেন-র অনেকগুলো জবাব। প্রথমে ধরো, চুল রঙ করা আর নকল উল্কি আঁকা বুড়ো গোয়েন্দাটা তাতে বিপদে পড়বে না। দুই, তোমাদের নিগ্রো সঙ্গীটাও অকালে অপঘাতে মরা থেকে বাঁচবে। আরও বলব?' ভুরু নাচাল নুবার।

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ডিউক বলল, 'বুঝতেই পারছ, বৃদ্ধ নিবাস থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের। তোমরা সহযোগিতা না করলে দু-জনের কাউকেই আর দেখতে পাবে না।'

তেরো

নীরবে চেয়ার থেকে উঠে ড়িউক আর নুবারের পিছু পিছু রওনা হলো দুই গোয়েন্দা।

দাঁতে দাঁত চেপে রবিন বলল, 'কাজটা ভাল করছ না তোমরা! পস্তাতে হবে এর জন্যে!'

'পস্তাতে হবে না, উপকৃত হব,' জবাব দিল ডিউক। 'করে দিতে পারলে অনেক টাকা দেয়া হবে আমাদের।'

'কে দেবে?'

'চুপ!' ধমক লাগাল ডিউক। 'আর একটা কথা বলবে না!'

ছেলেদেরকে পার্কিং লটে একটা সবুজ সেডান গাড়ির কাছে নিয়ে এল ডাকাতেরা। পেছনের দরজা খুলে দিয়ে ওঠার নির্দেশ দিল নুবার। কিশোর আর রবিন ওঠার পর সে-ও উঠল ওদের পাশে।

ড্রাইভিং সীটে বসল ডিউক। সিগারেট ধরিয়ে অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে।

শক্ত দড়ি দিয়ে দুই গোয়েন্দার হাত-পা বেঁধে ফেলল নুবার। মেঝেতে নিচু হয়ে বসার আদেশ দিল। একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল ওদের।

স্টার্ট দিল ডিউক।

সাংঘাতিক অসুবিধার মধ্যে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

'এয়ারপোর্টেই কিছু করা উচিত ছিল,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'উপায় যে ছিল না, তুমিও জানো,' কিশোর বলল।

'আমাদের ধাপ্পা দিল না তো? হয়তো ধরেইনি মিস্টার সাইমন আর মুসাকে। মিথ্যে কথা বলেছে।'

জুতোর ডগার খোঁচা পড়ল কিশোরের পিঠে। 'চুপ!' গাল দিল নুবার।

ডিউক বলল, 'আরে থাক, বলতে দাও। কি আর হবে? বেশিক্ষণ তো আর কথা বলতে পারবে না।'

হেসে উঠল নুবার।

রবিনের মনে হলো তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল একটা শুয়োর। কিশোরের কানে কানে বলল, 'একটা কিছু করা দরকার। ওরা আমাদের ছাড়বে না। ছালায় ভরে নদীতে ফেলে দিলেও অবাক হব না।'

রাস্তার গাড়ির শব্দ বলে দিচ্ছে কোন ব্যস্ত মহাসড়ক দিয়ে চলেছে ওরা।

দশ মিনিট একই গতিতে গাড়ি চালাল ডিউক।

'ডানে ঘোরো,' নির্দেশ দিল নুবার।

মোড় নিল গাড়ি। কয়েক সেকেন্ড পর পেছনে পড়ল রাস্তার গাড়ির শব্দ।

'কাঁচা রাস্তাটা দুই মাইল দূরে,' ডিউককে বলল নুবার। 'পুরানো একটা ওক

গাছ দেখতে পাবে। খেয়াল রাখো।'

বাঁধন খোলার চেষ্টা চালাল রবিন আর কিশোর। কোন লাভ হলো না।

'বোধহয় এটাই,' ডিউক বলল। 'খামারবাড়িটাতে মানুষ আছে বলে তো মনে হয় না। এক কাজ করি—ঘুরে ওদিকে চলে যাই। রাস্তায় কেউ না থাকলে গাড়ি ঘুরিয়ে এনে ওখানটায় রাখব। কি বলো?'

'ঠিক আছে।' জুতো দিয়ে আবার কিশোরকে খোঁচা মেরে নুবার বলল, 'খোদাকে ডাকো। তোমাদের শেষ সময় উপস্থিত।'

দরদর করে ঘামছে ছেলেরা।

রবিনের কানে কানে বলল কিশোর, 'গাড়ি থেকে বের করার সময় আঘাত হানতে হবে, বাঁধন খুলুক আর না খুলুক। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

'আচ্ছা।'

আচমকা চিৎকার করে উঠল ডিউক, 'আরি আরি, খেপে উঠল নাকি গাড়িটা!'

ধাতুর পাত ছেঁড়ার কুৎসিত শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে থেমে গেল গাড়িটা। দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল দুই গোয়েন্দা। হুটোপুটির শব্দ। গাল দিয়ে উঠল পেছনের সীটে বসা নুবার। টেনে বের করে নেয়া হলো তাকে।

'কিশোর! রবিন!' শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠের ডাক।

'মুসা!' চিৎকার করে জবাব দিল কিশোর।

হ্যাঁচকা টানে সরে গেল কম্বল। ভেতরে উঁকি দিল মুসার উদ্বিগ্ন মুখ। টেনেটুনে বের করল কিশোর আর রবিনকে। হাসিমুখে বলল, 'ভাগ্যিস আমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলে। নইলে তো মরতে। কে বাঁচাত?'

কিশোর দেখল, মাটিতে পড়ে আছে নুবার। ওঠার চেষ্টা করছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ডিউক।

'জলদি খোলো আমাদের!' কিশোর বলল।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘোলাটে চোখে তাকাল নুবার।

একটা পাথর তুলে ড্রাইভারের মাথায় বাড়ি মারল ডিউক। স্তব্ধ করে দিল তাকে। চেঁচিয়ে বলল নুবারকে, 'জলদি গাড়িতে ওঠো!'

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না ওকে। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল গাড়ির পেছনের সীটে। কিশোর আর রবিন বাঁধন মুক্ত হওয়ার আগেই ওদের সামনে দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল সবুজ গাড়িটা।

মাটিতে বসে পড়েছে ট্যাক্সি ড্রাইভার। আহত জায়গা ডলতে ডলতে মুসাকে বলল, 'বলেছ গোলমাল হতে পারে। পাথরের বাড়ি খেতে হবে বলোনি!'

'পাথরের বাড়ি গোলমালের মধ্যেই পড়ে,' জবাব দিয়ে দিল মুসা।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল ড্রাইভার।

গাড়িতে উঠল সবাই। আবার এয়ারপোর্টের দিকে চলল ট্যাক্সি। কি ভাবে এসেছে কিশোর আর রবিনকে জানাল মুসা। সে বৃদ্ধ নিবাসে ফিরতেই এয়ারপোর্টে চলে যেতে বললেন সাইমন, ওদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে। নির্দেশ মত এসে ট্যাক্সিতে বসে ছিল মুসা। কিশোরদেরকে গাড়িতে তুলতে দেখেছে সে। পিছু

নিয়েছে। মোটা টাকা দেয়ার লোভ দেখিয়েছে ড্রাইভারকে।

'চমৎকার!' প্রশংসা করল কিশোর।

'বলেছি না,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, ধাপ্পা দিয়েছে ব্যাটারা।'

এয়ারপোর্টে এসে প্লেন না ছাড়া পর্যন্ত লুকিয়ে রইল মুসা। কিশোর আর রবিনের ওপর কড়া নজর রাখল।

আর কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদেই প্লেনে উঠল কিশোররা। বিমান আকাশে উঠতেই সীট বেল্ট খুলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল ক্যাপ্টেনের ঘোষণায়—লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছে গেছে প্লেন।

বাকি রাতটা লস অ্যাঞ্জেলেসেই এক হোটেলে কাটিয়ে দিল ওরা। সকাল বেলা চলল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

বিশাল বাড়িটা থেকে খানিক দূরে নামল ট্যাক্সি থেকে। নামতে বাধ্য হলো। জটলা করছে দুই দল তরুণ আর কিশোর। ভিড় জমিয়ে দিয়েছে রাস্তায়। এক দল শ্বেতাঙ্গ, অন্য দল কালো। ভাবভঙ্গি ভাল না ওদের। সাংঘাতিক উত্তেজিত। মারামারি লেগে যেতে পারে।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। ওদেরকে লিখে দেয়া ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সার্টিফিকেটটা দেখাল। মিস্টার সাইমনের নাম বলে বলল, তিনি ওদের পাঠিয়েছেন।

কাজ হলো। একজন অফিসার বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।' তার নাম রোজার ডেন। ফাইল বের করতে ওদেরকে সাহায্য করল সে।

পাওয়া গেল তিমি সমাজ। দলের প্রতিষ্ঠাতা ডার্ক বিলি। মারা গেছে। খুন করা হয়েছিল তাকে। পুলিশের সন্দেহ, দলের লোকেই করেছে। বেঁটে ছিল লোকটা, মাত্র পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। সদস্যদের মধ্যে টপ হানিবার আর সেজউইক স্টোকসের নামও লেখা রয়েছে।

'আমার মনে হয় বিলির নামই পিগমি,' কিশোর বলল। 'বেঁটে বলে।'

'ব্ল্যাকরাইট হলো স্টোকস,' রবিন বলল। 'বাকি রইল বেলুগা, ব্লু, আর বটলনোজ।'

'বেলুগা সম্ভবত টপ হানিবার। স্যান ডিয়াগো থেকে পোস্ট কার্ডে করে মেসেজ সে-ই পাঠিয়েছে।'

'বাকি থাকল তাহলে ব্লু আর বটলনোজ। মারগোর নাম এর যে কোন একটা হতে পারে।'

ফাইলে লেখা তথ্যগুলোর একটা কপি পাওয়া যাবে কিনা, জানতে চাইল কিশোর।

'যাবে,' বলে ফাইলটা নিয়ে একটা মেশিনের দিকে চলে গেল ডেন। ফটোকপি করে কপিটা এনে দিল কিশোরের হাতে।

যা জানার জেনেছে। অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল কিশোর।

করিডরের মোড় ঘুরে একটা ওয়ান্টেড বোর্ডের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল রবিন। কিটি নুবারের ছবি সাঁটানো রয়েছে। পোস্টারে কি আছে পড়ার

জন্যে এগিয়ে গেল সে।

নুবার সম্পর্কে অনেক তথ্য দেয়া আছে। তাকে দেখে বয়েস যতটা কম লাগে আসলে ততটা নয়। ডাকাতির অভিযোগে জেল খেটে এসেছে একবার। অনেকগুলো অপরাধের অভিযোগে ক্যালিফোর্নিয়ার পুলিশ তাকে খুঁজছে। জেলে থাকতে ডিউক হ্যাগার্ড নামে আরেক চোরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। পুলিশের ধারণা সেই লোকটাও এখন সঙ্গে আছে তার।

'অনেক কাজ হলো এখানে এসে,' রবিন বলল। 'মিস্টার সাইমন না বললে আসতামও না। এত সব জানতেও পারতাম না।'

'হ্যাঁ। ভাবছি, এখন কি করব? বাড়ি ফিরে যাব, নাকি ফোন করব তাঁকে?' প্রশ্নগুলো নিজেকেই করল কিশোর।

রাস্তায় বেরোতেই পেয়ে গেল জবাবটা। সেই যে দুই দল ছেলে জটলা করছিল, ওদের উত্তেজনা চরমে পৌছেচে। ঝগড়া করছে। গালিগালাজ করছে একদল আরেক দলকে।

এই বাকযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলো না, বেধে গেল হাতাহাতি। তার মধ্যে পড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওরা।

পেছন থেকে কে যেন হাত চেপে ধরল ওদের। পিঠে ছুরির খোঁচা লাগল। কানের কাছে কঠিন স্বরে বলা হলো, 'খবরদার! নড়লেই মরবে!'

প্রথমে ভাবল ওরা, লড়ুয়েদেরই কেউ ধরেছে বুঝি, প্রতিপক্ষ ভেবেছে দু-জনকে। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল।

কিশোরকে ধরেছে কিটি, আর রবিনকে ডিউক। স্যান ডিয়াগো থেকে ওদের পিছু নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে এসেছে দুই ডাকাত।

চোদ্দ

কিশোর আর রবিনকে টানতে টানতে একটা বিশাল লরির অন্যপাশে নিয়ে আসা হলো। মাল খালাস করার জন্যে দাঁড় করানো হয়েছে গাড়িটাকে। মারামারি আর প্রচণ্ড গণ্ডগোলের মধ্যে কিশোরদের ব্যাপারটা লক্ষ করল না কেউ। পিঠে ছুরি ঠেকে থাকাতে ওরাও বাধা দিতে পারল না।

আড়ালে এনে শুয়োরের মত কিঁচকিঁচে গলায় বলল নুবার, 'মূর্তিটা কোথায়? জলদি বলো!'

'মূর্তি! কিসের মূর্তি?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'বেশি চালাকি কোরো না! আমরাও পত্রিকা পড়ি।'

'দেখো নুবার,' বলে উঠল রবিন, 'এ সব করে পার পাবে না তোমরা। পুলিশ তোমাদের খুঁজছে।'

অবাক হলো নুবার। 'আমার নাম জানলে কি করে?'

'আরও অনেক কিছুই জানি তোমার সম্পর্কে,' জবাব দিল কিশোর।

'জানলে জানোগে,' হিসিয়ে উঠল নুবার। 'মূর্তিটা কোথায় বলো। এক থেকে দশ গুনব, এর মধ্যে না বললে...'

ঝট করে বসে পড়ল কিশোর। নুবারের হাতের চাপ সামান্য ঢিল হয়েছিল, সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে সে। জুডোর প্যাঁচ কষে হাত ছাড়িয়ে নিয়েই বসে পড়েছে।

আচমকা এই ঘটনায় ডিউকও চমকে গেছে। ঢিল পড়ল তার আঙুলেও। মুহূর্তে তার হাত থেকে ছুটে গেল রবিন।

'দৌড় দাও!' বলেই রাস্তার দিকে ছুটল কিশোর।

ট্রাকের আড়াল ঘুরে রাস্তায় বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। পেছনে তাড়া করে এল নুবার আর ডিউক। তুমুল লড়াই চলছে দুই দল ছেলের মধ্যে। ভিড়ে ঢুকে আত্মগোপনের চেষ্টা করল কিশোররা।

শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। দ্রুত ছুটে এল অনেকগুলো গাড়ি। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েক গজ দূরে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নামল অফিসারেরা। পিস্তল তুলে ছুটে এল।

পুলিশ দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালাল কয়েকটা ছেলে। অন্যদেরকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। কিশোর আর রবিনও আটকা পড়ল পুলিশের ঘেরের মধ্যে।

বড় বড় দুটো লরি এসে থামল। ধরে ধরে ছেলেগুলোকে ওগুলোর মধ্যে তুলতে লাগল পুলিশ। গোয়েন্দাদেরও ছাড়ল না।

গলা বাড়িয়ে রাস্তার ভিড়ে নুবার আর ডিউককে খুঁজতে লাগল কিশোর। দেখল না একজনকেও।

ছেলেগুলোর সঙ্গে কিশোর আর রবিনকেও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হলো। ওদের ভাগ্য ভাল, ঢুকতেই চোখে পড়ে গেল অফিসার রোজার ডেনের। এগিয়ে এল সে।

কি ঘটেছে জানাল কিশোর।

ওদেরকে সরিয়ে নিল ডেন। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে বলল, 'তোমরা বসো। আমি দেখে আসি।'

কয়েক মিনিট পর হাসিমুখে ফিরে এল সে। 'সু-খবর আছে। কিটি নুবার ধরা পড়েছে। মনে হচ্ছে তোমাদের পিছু পিছু দাঙ্গার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে। আর বেরোতে পারেনি।'

'আর ডিউক?' জানতে চাইল রবিন।

'পালিয়েছে।'

'একটা ফোন করা যাবে?' অনুরোধ করল কিশোর।

'কোথায় করবে?'

'স্যান ডিয়াগোতে। মিস্টার সাইমনের কাছে।'

টেলিফোন দেখিয়ে দিল ডেন।

বৃদ্ধ নিবাসে ফোন করল কিশোর। ক্লার্ক জানাল, রিক অ্যান্ডারসন ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে যে নিগ্রো ছেলেটা ছিল, সে-ও নেই। কোথায় গেছেন

বলে যাননি অ্যান্ডারসন।

রিসিভার রেখে খবরটা রবিনকে জানাল কিশোর।

'কোথায় গেলেন?' কড়ে আঙুলের ডগা কামড়াতে কামড়াতে বলল রবিন।

'বুঝতে পারছি না!'

'আমাদের এখন কি করা উচিত? স্যান ডিয়াগোতে যাব আবার?'

'নাহ্, ওখানে আর কোন কাজ নেই। বাড়ি ফিরে যাব। তিমিটাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

ডেনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল দু-জনে। বাস স্টপেজের দিকে রওনা হলো। বাসে করে রকি বীচে ফিরবে।

ফেরার পথে মূর্তিটার কথা তুলল রবিন। বলল, 'আচ্ছা, নুবার আমাদের কাছে কিসের মূর্তি চাইল, বলো তো? কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'সেই জন্যেই তো তিমিটাকে খুঁজে বের করতে চাইছি। নুবার বলেছে "আমরাও পত্রিকা পড়ি", মনে আছে?'

'আছে। তাতে কি?'

'আমরা তিমিটা খুঁজে পেয়েছি, এই মিথ্যে খবরটা ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। ওদের ধারণা, তিমির ভেতরে যে জিনিস আছে, সেটাও পেয়ে গেছি আমরা। আমি শিওর এখন, ডেভিড টিয়ানের চুরি যাওয়া মূর্তিটা এখন ওই তিমির মধ্যেই আছে। ডার্ক বিলির মৃত্যুটাও নিশ্চয় সাধারণ মৃত্যু নয়। খুন করা হয়েছে তাকে। এবং খুন হওয়ার আগেই তিমির মধ্যে মূর্তিটা লুকিয়ে ফেলেছিল সে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'অনেকগুলো ব্যাপার এখন পরিষ্কার হয়ে আসছে!'

বাড়ি ফিরে চাচীর কাছে দুটো খবর পেল কিশোর। প্রথমটা তেমন অবাক করল না তাকে। মুসা রকি বীচে ফিরে এসেছে। এসেই ফোন করেছে মেরিচাচীকে। কিশোররা লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছে, ভাল আছে—এ খবর জানিয়েছে।

দ্বিতীয় খবরটা চমকপ্রদ। দিন দুই আগে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে চলে গেছে ফ্রেড ওয়ালকিন। বাড়ি থেকে এ ভাবে পালানো তার স্বভাব। তাই অবাক হননি মেরিচাচী।

না বলে চলে যাওয়ার জন্যে দুঃখিত—এটা জানিয়ে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে ফ্রেড।

চিঠিটা দেখতে চাইল কিশোর।

বের করে দিলেন চাচী।

কয়েকবার করে চিঠিটা পড়ল কিশোর। চেনা চেনা লাগছে হাতের লেখাটা। কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু করতে পারল না।

টিভি চলছে।

স্থানীয় খবর শুরু হলো।

অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। খবরে কান নেই। সে ভাবছে ফ্রেডের কথা। তবে কান খাড়া হয়ে গেল শিগগিরই। হারানো তিমিটার কথা যখন বলল সংবাদ পাঠক। বলছে:

মাটির নিচ থেকে পাওয়া স্টাফ করা নীল তিমিটার আর কোন

খবর আছে কিনা জানতে গিয়েছিল আমাদের রিপোর্টার। যে তিনজন খুঁজে পেয়েছে বলে দাবি করেছে তাদের দু-জন কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ড লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছে। তাদের বন্ধু মুসা আমান স্যান ডিয়াগো থেকে ফিরেছে। তার সঙ্গে কথা বলেছে আমাদের রিপোর্টার। সব ফাঁস করে দিয়েছে মুসা আমান। বলেছে তিমিটা এখনও পায়নি ওরা, তবে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারমানে ওটা খুঁজে পেয়েছে বলে কিশোর পাশা যে দাবি করেছে, সেটা মিথ্যে। তিমিটার নতুন কোন খবর পেলে আপনাদের জানানো হবে।

অন্য খবরে চলে গেল সংবাদ-পাঠক।

হাঁ করে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। সর্বনাশ করে দিয়েছে মুসা। ঠিক এই সময় মনে পড়ল হাতের লেখাটা কোথায় দেখেছে।

মুসার কথা ভুলে গিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল সে। মানিব্যাগ বের করে আনল। সেটা থেকে বের করল মারগোর ওয়াগনে পাওয়া কাগজের পোড়া টুকরোটা। ওটার লেখা আর ফ্রেডের চিঠির লেখার ধরন হুবহু এক।

তিমিটার কথা কিশোরকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন চাচী, তার আগেই বলে উঠল কিশোর, 'চাচী, ও ফ্রেড ওয়ালকিন ছিল না!'

'মানে?' দুই চোখ কপালে উঠল চাচীর।

'মানে, যাকে আমরা জায়গা দিয়েছিলাম, ওই লোক ফ্রেড ওয়ালকিন নয়। ছদ্মবেশী। ওর নাম মারগো। কারনিভালে ভাঁড়ের কাজ করত। কয়েক দিন আগে ওখান থেকে উধাও হয়েছিল সে। আমার ধারণা, চোর-ডাকাতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে তার।'

'সর্বনাশ! একটা ক্রিমিনালকে বাড়িতে জায়গা দিয়ে রেখেছিলাম! কিন্তু কোন জিনিস তো চুরি করেনি।'

'চুরি করার জন্যে আমাদের বাড়িতে আসেনি সে। নিশ্চয় দলের লোকের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। তারা ওকে খুঁজছে। প্রাণের ভয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে।'

ফোন বাজল। রবিন করেছে। সে-ও শুনেছে টিভির খবরটা। কিশোরকে বলল, 'মুসা তো দিয়েছে বারোটা বাজিয়ে!'

'হ্যাঁ। ওকে ফোন করো। ইয়ার্ডে চলে এসো দু-জনে। সাংঘাতিক খবর আছে।'

পনেরো

'সব ভজকট করে দিয়েছে মুসা!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে উঠল রবিন। 'ডাকাতগুলো এখন ঠিক বুঝে গেছে, আগাগোড়া ওদেরকে ধাপ্পা দিয়ে এসেছি আমরা!'

তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে কথা বলছে তিনজনে।

নীরবে টেবিলে কয়েক সেকেন্ড টাট্টু বাজাল কিশোর। তারপর বলল, 'হুঁ,

কাজটা এখনও শেষ হয়নি আমাদের। জটিল হয়ে যাবে সব কিছু। তিমিটা খুঁজে বের করার জোর চেষ্টা চালাবে এখন ওরা। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের।'

আরও একবার 'সরি' বলল টুলে বসে থাকা মুসা। এই নিয়ে অন্তত দশবার বলেছে।

ওর দিকে তাকাল রবিন, 'কেন বলতে গেলে, বলো তো?'

'আমি কি ইচ্ছে করে বলেছি নাকি?' হাত ওল্টাল মুসা। 'যত দোষ তো ওই পাজী রিপোর্টারটার। আমাকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ল। এমন ভাবে জেরা শুরু করল, মুখ ফসকে আসল কথাটা কখন যে বেরিয়ে গেল বলতে পারব না। ব্যাটা একটা আস্ত...'

'থাক,' বাধা দিল কিশোর, 'এখন আর ওটা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কাজের কথায় আসা যাক। কাল সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। আকাশপথে খুঁজতে বেরোব তিমিটাকে।'

'আবার প্লেনে করে?'

'না। এবার হেলিকপ্টার ভাড়া নেব। চালাতে পারবে তো?'

'তা পারব,' মাথা কাত করল মুসা। 'প্লেনের চেয়ে হেলিকপ্টার চালানো সহজ লাগে আমার কাছে।'

'প্লেন নয় কেন? তাহলে মিস্টার সাইমনেরটাই নিতে পারতাম আমরা,' জানতে চাইল রবিন।

'প্লেনের চেয়ে হেলিকপ্টারে খোঁজার সুবিধে অনেক। ওঠানো-নামানোর সুবিধে...তা ছাড়া...' চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'তা ছাড়া?'

'উঁ?...অনেক রাত হয়ে গেছে,' হাই তুলল কিশোর। 'ঘুম পেয়েছে। যাও, বাড়ি যাও। ভোরে উঠে চলে আসবে।'

পরদিন সকালে উঠেই একটা প্রাইভেট এভিয়েশন ক্লাবে চলে এল তিন গোয়েন্দা। হেলিকপ্টারও পাওয়া গেল। ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিল কিশোর। খরচটা আদায় করে নেবে মিস্টার সাইমনের কাছ থেকে।

হেলিকপ্টারে উঠে কিশোর আর রবিন যখন সীট বেল্ট বাঁধায় ব্যস্ত, মুসা তখন ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে রোটর ছাড়ল। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল মাথার ওপরের বিশাল ব্লেডটা।

ধীরে ধীরে শূন্যে উঠল কপ্টার। রানওয়ে ধরে নিচু দিয়ে উড়ে গেল কয়েক গজ, তারপর দ্রুত উঠে গেল ওপরে।

আগের বার বিমানে করে ওড়ার সময় বেলুনগুলো যেখানে পেয়েছে, তার একটা নকশা এঁকে রেখেছিল কিশোর। সেটা বের করে কোলের ওপর বিছাল। ঝড়ের মধ্যে কোন পথে যেতে পারে বেলুনগুলো, হিসেব করে বের করেছে। দাগ দিয়ে রেখেছে ম্যাপে। সেই পথ ধরে গতি কমিয়ে এগোনোর নির্দেশ দিল মুসাকে।

চারটে জায়গায় লাল কালি দিয়ে ক্রস দিয়ে রেখেছে। তিমিটা থাকার সম্ভাব্য জায়গা সেগুলো।

প্রথম দুটো জায়গায় অনেক সময় নষ্ট করল অহেতুক। নেই ওটা।

রবিন বলল, 'বাকি দুটোতেও যদি না থাকে, কি করব?'

'দেখাই যাক না আছে কিনা,' কিশোর বলল। 'পরের কথা পরে। আগে থেকেই অত চিন্তা করার কিছু নেই।'

পনেরো মিনিট পর একটা মাঠ চোখে পড়ল। গাছপালায় ঘেরা। তার ওধারে একটা লেক, চকচক করছে পানি। সেদিকে তাকিয়ে বলল সে, 'ওই লোকগুলো কি খুঁজছে? আমাদের মত ওরাও তিমি হারিয়েছে নাকি?'

দূরবীনটা আরও ভাল করে চোখে ঠেকাল সে। তিনজন লোক। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মাটিতে খোঁজাখুঁজি করছে কিছু।

মুসাকে সেদিকে এগোতে বলল কিশোর।

নিচু দিয়ে উড়ে গেল মুসা।

ওপর দিকে তাকাল লোকগুলো। পরক্ষণেই দৌড় দিল বনের দিকে। ওদেরকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'টপ হানিবার আর ডিউক হ্যাগার্ড! হোগারফও আছে!'

বনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। খানিক পরই বনের কিনারের দিকে হালকা ধোঁয়া দেখা গেল। কপ্টারের প্লেক্সিগ্লাসের আবরণ ভেদ করে কিশোরের মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট। গুলি করছে লোকগুলো। শাঁই করে আরেক দিকে কপ্টারের নাক ঘুরিয়ে দিল মুসা।

'গেছিলাম আরেকটু হলে,' লম্বা দম নিল কিশোর।

'রেঞ্জের বাইরে নিয়ে এসেছি,' মুসা বলল। এয়ারপোর্টের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করে ওদের অবস্থান জানাল, গুলি করা হচ্ছে এটাও বলল। তিন অপরাধীর নাম বলে টাওয়ার অপারেটরকে অনুরোধ করল পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে খবরটা জানিয়ে দেয়ার জন্যে।

রবিন বলল, 'ভাল করে দেখলে হোগারফের হাতেও উল্কি দিয়ে তিমি আঁকা দেখতে পেতাম। কে খেয়াল করে! সারা গায়ে যে ভাবে আঁকিবুঁকি করে রেখেছে!'

'চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে,' একমত হলো কিশোর। 'হাতের দিকে তাই আর নজরই পড়ে না।'

বনের ওপরে ঘুরে বেড়াতে লাগল মুসা। তিনজনের একজনকেও চোখে পড়ল না আর। ওদের পেছনে সময় নষ্ট না করে তিমিটাকে খুঁজে বের করা বেশি জরুরী।

মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'ওদের ব্যাপারে যা করার পুলিশই করবে। আমাদের কাজ আমরা করি, চলো।'

'হুঁ,' বলে কপ্টারের নাক ঘোরাল মুসা। বন পেরিয়ে এসে লেকের কিনারের একটা কেবিনের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কেবিনের কাছে জেটিতে একটা স্পীডবোট বাঁধা। ঘরটার ওপর চক্কর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ভেতরে লোক আছে কিনা। কেউ বেরোল না ঘর থেকে।

লেকের দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

রবিন বলল, 'লেকে পড়েছে ভাবছ নাকি?'

'পড়তে বাধা কি? মুসা, পানির ওপরে ঘুরতে থাকো! আমার বিশ্বাস লেকেই

পড়েছে। পানিতে ডুবে না থাকলে এতদিন লোকের চোখে পড়ে যেত।'

টলটলে পরিষ্কার পানি। তলার আগাছা আর বালি পর্যন্ত দেখা যায়। মাঝে মাঝে খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে আছে।

লেকের অন্য প্রান্তে এসে ঝটকা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ওই দেখো!'

পানিতে ডুবে থাকা বিশাল তিমির কালচে অবয়ব দেখতে পেল তিনজনেই।

ষোলো

'পেলাম তো,' হাসিমুখে বলল মুসা। 'এবার কি করা?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'রকি বীচে তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ক্ষমতায় কুলাবে না এই কপ্টারের।'

'না, যাবে না।'

রবিন বলল, 'দেখে যখন ফেলেছি, এখানে এ ভাবে ফেলে যেতে মন খুঁতখুঁত করবে। হোগারফেরাও এদিকে এসেছে। ওরাও দেখে ফেলতে পারে।'

কিশোর বলল, 'তা তো পারেই।' রবিনের সীটের পেছনে এক বান্ডিল শক্ত নাইলনের দড়ি পড়ে আছে। এ ধরনের কোন প্রয়োজন হতে পারে ভেবেই বান্ডিলটা নিয়েছিল কিশোর। সেটা দেখিয়ে বলল, 'বয়ে নিতে না পারি, টেনে ডাঙায় তো তুলতে পারব।'

'তা পারব,' মুসা বলল। 'কিন্তু বাঁধব কি করে?'

'ওস্তাদিটা তোমাকেই দেখাতে হবে। আমাদের দু-জনকে দিয়ে হবে না। রবিনকে সীটটা ছেড়ে দাও, কপ্টার সামলাক। তুমি নেমে যাও পানিতে। কি বলো?'

রবিনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নির্দ্বিধায় উঠে চলে এল মুসা। শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল। কাজটা আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে তার কাছে। পানির গভীরতা ওখানে কম, দশ-বারো ফুটের বেশি না।

পানির বারো ফুট ওপরে কপ্টার নামিয়ে আনল রবিন। রোটরের বাতাসের ঝাপটায় তোলপাড় উঠল পানির ওপরের অংশে।

শার্ট-প্যান্ট, জুতো-মোজা খুলে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল মুসা।

দড়ির বান্ডিল খুলে একমাথা একটা সীটের পায়ার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধল কিশোর। আরেক মাথা ফেলল পানিতে। সেটা নিয়ে পানিতে ডুব দিল মুসা।

কপ্টার আরও নিচে নামাল রবিন।

বাতাসে পানির ওপরটা অশান্ত হয়ে গেছে বলে অত কাছ থেকেও সে কিংবা কিশোর দেখতে পেল না মুসাকে।

পানিতে ডুবে থাকা একটা তিমিকে বাঁধা চাট্টিখানি কথা নয়। লেজের দিকটা সামান্য উঁচু হয়ে থাকাতেই কেবল পারল মুসা। লেজের গোড়া আর তলার

বালির মাঝখানে বেশ কিছুটা ফাঁক। সেখান দিয়ে ঢুকে দড়িটা যতটা সম্ভব শক্ত করে বাঁধল। এর জন্যে কয়েকবার ডুবতে ভাসতে হলো তাকে।

শেষবার ভেসে উঠে ওপরে তাকিয়ে হাত তুলে ইঙ্গিত করল, কাজ শেষ। সাংঘাতিক পরিশ্রম করেছে। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।

মুসা নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার আগে টান দিল না রবিন।

ভীষণ ভারি একটা তিমি। স্টাফ করা না হলে আরও অনেক ভারি হত। তবে যা আছে তা-ও অনেক। টানটান হয়ে গেল দড়ি। ভয় হতে লাগল কিশোরের, ছিঁড়ে না যায়।

ছিঁড়ল না। কিছুক্ষণ টানাটানির পর অবশেষে নড়ে উঠল তিমিটা। পানিতে ওজন অনেক কমে গেছে। ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করল। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে রোটর। চাপের চোটে এখন ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশ। পানিতে পড়বে কপ্টার।

তীর বেশি দূরে না। সাঁতরে আগেই ডাঙায় উঠে গেল মুসা। তিমিটা উঠল তার অনেকক্ষণ পর।

তীরের কাছের বালিতে তিমির পুরো শরীরটা উঠে গেল। অনেক টানাটানি আর কসরৎ করে চিত করানো হলো ওটাকে। ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে দিল মুসা। তিমির কাছেই কপ্টার নামাল রবিন।

তিনজনে ঘিরে দাঁড়াল তিমিটাকে।

রবিন বলল, 'দৈত্যকে তো তুললাম। কাটা শুরু করব কোনখান থেকে?'

'সেই জন্যেই চিত করে শোয়াতে বলেছি,' কিশোর বলল। 'মূর্তিটা থাকলে পেটের কাছে থাকবে। গলার নিচ থেকে লেজ পর্যন্ত চিরে ফেলব।'

তিমির শক্ত চামড়ায় ছুরি চালাল ওরা। ভীষণ কঠিন কাজ। কয়েক ফুট চিরতেই হাত ব্যথা হয়ে গেল কিশোরের। এরপর দায়িত্ব নিল মুসা।

পেট চেরা হতে তিনজনে মিলে ভেতর থেকে টেনে টেনে বের করতে লাগল খড়, পাতলা কাঠের ফালি, ইত্যাদি—যে সব দিয়ে স্টাফ করা হয়েছে। সেটা আরও কঠিন কাজ।

'একটা তিমির পেটে যে এত খড় আঁটে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না!' রবিন বলল।

হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল কিশোর। পেশী ব্যথা হয়ে গেছে। বার বার হাত ঝাড়া দিতে লাগল। 'খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছি।'

'সুচটা ছয় ফুট লম্বা,' মাথা ঝাড়া দিল রবিন, 'ছোট তো নয়। পাচ্ছি না কেন?'

লেকের অন্য প্রান্তে স্পীডবোটের ইঞ্জিনের ফটফট শব্দ শোনা গেল। জেটিতে বাঁধা বোটটা আসছে।

'খাইছে!' মুসা বলল, 'ওই তিন ব্যাটা নয় তো?' দৌড়ে গিয়ে কপ্টার থেকে দূরবীন বের করে আনল। দেখেটেখে বলল, 'মোটে তো একজনকে দেখতে পাচ্ছি। ইঞ্জিনের কাছে বসে আছে। জ্যাকেট আর মাথার হ্যাট দেখে জেলের মত লাগছে।'

'কৌতূহল হয়েছে আরকি,' রবিন বলল। 'দেখতে আসছে। হেলিকপ্টার দিয়ে লেকের তলা থেকে তিমি টেনে তুলতে তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় দেখে না।'

হেসে উঠল মুসা। 'তা বটে।'

আবার কাজে লাগল তিনজনে। খড়ের স্তূপ বানিয়ে ফেলল। ক্রমেই আরও বড় হচ্ছে স্তূপটা। অথচ বেরিয়েছে মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। বিরাট এক ফোকর হয়ে গেছে তিমির পেটে।

লম্বা একটা লাঠি নিয়ে এসে ফোকরের খড়ের মধ্যে খোঁচাতে শুরু করল রবিন। শক্ত কি যেন একটা লাগল।

ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনে। যে জায়গাটায় লেগেছে সেখানকার খড় বের করতে শুরু করল। হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়ল ক্যানভাসে মোড়া, দড়িতে বাঁধা জিনিসটার একটা মাথা। টেনেটুনে খড়ের ভেতর থেকে বের করা হলো ওটাকে। মাটিতে নামাল। প্রায় মানুষের সমান লম্বা।

ঘেমে গেছে তিনজনেই। কিন্তু থামল না। ক্যানভাসে পেঁচানো দড়ি খুলতে লাগল। বেরিয়ে পড়ল মূর্তিটা।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনজনে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। হাতির দাঁতে তৈরি অপূর্ব একটা মূর্তি। প্রতিটি ইঙ্গিতে দক্ষ শিল্পীর হাতের ছোঁয়া। চকচক করছে। কেবল খাঁজগুলোতে হালকা সবজে এক ধরনের আস্তর পড়েছে। বাঁধা অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকার লক্ষণ।

'দারুণ!' বিড়বিড় করল মুসা।

শিস দিতে লাগল রবিন, 'এ জন্যেই এটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ডাকাতগুলো। অনেক দাম পাবে।'

বোটের ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে। এগিয়ে এসেছে অনেক।

সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'জিন্দেগীতেও এমন জিনিস দেখেনি জেলেরা।'

'কোনটার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তিমি, না মূর্তি?'

'কোনটাই দেখেনি।'

তীর থেকে ফুট দশেক দূরে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল লোকটা। ঘ্যাঁচ করে তীরের বালিতে ঠেকল বোটের তলা।

আচমকা বোটের খোল থেকে লাফিয়ে উঠল দুটো মূর্তি। হোগারফ আর ডিউক!

হ্যাট ছুঁড়ে ফেলল চালক টপ হানিবার।

রাইফেল আছে ওদের কাছে। সুতরাং পালাতে পারল না তিন গোয়েন্দা। বাধাও দিতে পারল না। চোখের পলকে বন্দি হলো ওরা।

ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে, মূর্তিটা নিয়ে গিয়ে বোটে তুলল ডাকাতেরা। ধাক্কা দিয়ে বোটটাকে পানিতে নামিয়ে আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। রওনা হয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, গোয়েন্দাদের মনে হলো অবাস্তব। যেন দুঃস্বপ্নে রয়েছে।

সতেরো

'গাধামি করে ফেলেছি!' নিজেকেই যেন গাল দিল কিশোর। 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। সতর্ক হলেও পারতাম। জানতামই তো, কাছাকাছি আছে তিন ডাকাত।'

'এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

'কষ্ট করে বের করলাম আমরা,' নিমের তেতো ঝরল মুসার কণ্ঠে, 'আর ফলটা ভোগ করবে এখন ওরা! গাঁটের টাকা খরচ করে, গায়ের ঘাম ঝরিয়ে, স্রেফ ব্যাটাদের গোলামি করেছি!'

বাঁধন খোলার অনেক চেষ্টা করল ওরা। সামান্যতম ঢিলও করতে পারল না। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিশ আসার অপেক্ষায় রইল।

মুসা বলল, 'বাঁধা ছিলাম, ছিলাম, এতটা অসুবিধে হত না। কিন্তু পেট যে একেবারে খালি। গুড়গুড় করছে।'

'খড় খাও,' রসিকতা করল রবিন। 'মুখের কাছেই তো আছে।'

'রাতের মধ্যে পুলিশ না এলে তা-ই করতে হবে হয়তো।'

ধীরে কাটছে সময়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, তারপর রাত। আধখানা চাঁদ উঠল আকাশে। হলদে আলো ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করল নির্জন লেকের পাড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে এল মশা।

'বাপরে বাপ, খেয়ে ফেলল!' রবিন বলল। হাত বাঁধা থাকায় চাপড়ও মারতে পারছে না। মহা অশান্তি। 'খুদে ভ্যাম্পায়ার একেকটা!'

আঁতকে উঠল মুসা। ভয়ে ভয়ে তাকাল অন্ধকার বনের দিকে। কাঁপা গলায় প্রতিবাদ করল, 'আহ্, ওসব অলুক্ষুণে কথা বোলো না তো!'

কিশোর বলল, 'আমি ভাবছি, পুলিশ আমাদের খুঁজে বের করতে এত দেরি করছে কেন? টাওয়ার অপারেটর কি খবর দেয়নি?'

মশার কামড় থেকে শরীর বাঁচানোর জন্যে যতটা সম্ভব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল ওরা। কিন্তু তাতে কি আর লাভ হয়? যেন চিরকালের ক্ষুধার্ত মশাগুলো। যে যেখানে পারছে বসে যাচ্ছে।

'এত্ত হা-ভাতে মশা আর জিন্দেগীতে দেখিনি!' খাপ্পা হয়ে বলল মুসা।

'হা-ভাতে নয়,' শুধরে দিল কিশোর, 'হা-রক্তে। মশা তো ভাত খায় না, রক্ত খায়।'

'এ সময়ে তোমার রসিকতা আসে কি করে?'

'তো কি হাউমাউ করে কাঁদব? ভূতের কথা ভাব, ভয় পেলে মশার কামড়ের জ্বালা ভুলে যাবে।'

'ধ্যাত্তোর! আবার ওসব মনে করে!'

যেন বহুযুগ পর অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে দুটো টর্চের আলোর নাচন চোখে

পড়ল ওদের।

মুসার চোখেই পড়ল প্রথমে। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'আমরা এখানে! এখানে! লেকের পাড়ে!'

ঘুরে গেল টর্চের আলো। ছুটে আসতে লাগল।

খানিক পরই ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল ছয়জন পুলিশ। দড়ি কাটতে শুরু করল।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ডাকাতগুলোকে ধরেছেন? মূর্তিটা ওরা নিয়ে গেছে।'

'না, ধরতে পারিনি,' জবাব দিল একজন। 'খবর দিতে দেরি করে ফেলেছে অপারেটর।'

দড়ি খুলতেই ঝিঁ-ঝিঁ করে উঠল হাত-পা। দীর্ঘক্ষণ বাঁধা থাকায় রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেছে। ডলে ডলে স্বাভাবিক করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। উঠে দাঁড়াতে ওদের সাহায্য করল পুলিশ।

কপ্টারটা ওখানেই রইল। পাহারায় রইল দু-জন পুলিশ। বাকি চারজন গোয়েন্দাদের নিয়ে রওনা হলো গাড়ির দিকে।

গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে পেছনের সীটে এলিয়ে থাকা রবিন বলল, 'কিশোর, এটাই আমাদের প্রথম ব্যর্থ কেস। বোকামি করে সব শেষ করলাম!'

'বোকামি করে নয়,' কিশোর বলল, 'অসতর্ক হয়ে। তিমিটা দেখার পর আমাদের শিওর হয়ে নেয়া উচিত ছিল, ডাকাতগুলো আশেপাশে আছে কিনা। ওদের হেলিকপ্টার ছিল না, তুলতে পারত না।'

'ওদের হয়ে আমরাই কাজটা করে দিলাম,' ঝাঁঝাল স্বরে বলল মুসা। 'খুব হাসছে ওরা এখন। বোকা পাঁঠা বলে গাল দিচ্ছে আমাদের।'

'তা দিচ্ছে না। আমরা নাক না গলালে ওটা এত সহজে বের করতে পারত না ওরা। হেলিকপ্টারে করে খোঁজার কথা মাথায়ই আসেনি ওদের। তাহলে আগেই বের করে ফেলত।'

বাড়ি ফিরে মেরিচাচীর একচোট বকা খেয়ে, গরম পানিতে গোসল সেরে খেতে বসল কিশোর। সে টেবিলে থাকতেই মিস্টার সাইমনের ফোন এল। তিনি বললেন, সব শুনেছেন। পরদিন সকালে কিশোররা যেন তাঁর বাড়িতে চলে আসে। আরেকটা খবর দিলেন তিনি, সেজউইক স্টোকসকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন।

সকালে সাইমনের বাড়িতে গেল তিন গোয়েন্দা।

কোমল স্বরে ডিটেকটিভ বললেন, 'মন খারাপ করার কিছু নেই। মূর্তিটা বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তোমাদের। সেটা তোমরা করেছ। পরে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, সেটা তোমাদের দোষ নয়। তোমাদের কাজে আমি খুশি। আমি ধরে নেব, কেসটাতে তোমরা বিফল হওনি।'

খুশি হতে পারল না গোয়েন্দারা। ধরে নেয়ানেয়ির ব্যাপার যেখানে আছে, সেটাকে ব্যর্থই বলা ভাল। এ সব স্রেফ সান্ত্বনা, আর কিছু না।

রবিন বলল, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, স্যার, মূর্তিটাকে ওরা কি ভাবে বের করে নেবে? আকাশ পথে?'

'সম্ভবত। একবার নিয়ে গেলে আর ওটাকে খুঁজে বের করতে পারব বলে মনে

হয় না…’

‘উফ্, আমি একটা গাধা!’ কপালে চাপড় মারল কিশোর।

অবাক হলো সবাই। তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, ‘পাগল হয়ে গেলে নাকি?’

‘না!’ উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর, ‘মূর্তিটা কোথায় নিয়ে যাবে জানি আমি!’

‘কোথায়!’ একসঙ্গে জানতে চাইল রবিন আর মুসা।

‘স্যান ডিয়াগোতে। সেই ছাউনিটায়। যেটাতে রাতের বেলা মিলিত হয়েছিল টপ, ডিউক আর কিটি নুবার। রবিন, মনে আছে কাপড়-চোপড়, বেডিংপত্র আর খাবার জমিয়ে রাখা হয়েছে ঘরটাতে? তারমানে আপাতত ওখানেই বাস করতে যাবে ডাকাতগুলো।’

‘পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত!’ রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

‘হ্যাঁ। মিস্টার সাইমন, আপনার কি মনে হয়?’

‘মনে হয় তোমার ধারণাই ঠিক। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। এখুনি স্যান ডিয়াগোয় রওনা হব। তোমাদের যেতে অসুবিধে আছে?’

নেই, জানাল তিনজনেই। যার যার বাড়িতে একটা করে ফোন করে জানিয়ে দিল মিস্টার সাইমনের সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে ওরা।

ল্যারি কংকলিনকে প্লেন রেডি করতে নির্দেশ দিলেন সাইমন। ঘণ্টাখানেক পরই স্যান ডিয়োগোর উদ্দেশে আকাশে উড়ল বিমান।

শহরের বাইরের একটা প্রাইভেট বিমান বন্দরে প্লেন নামাল ল্যারি।

ঠিক হলো, রাতের বেলা ছাউনি আক্রমণ করবে গোয়েন্দারা।

শহরে ঢুকে একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিল পাঁচজনে—তিন গোয়েন্দা, ল্যারি এবং সাইমন। গোধূলি বেলায় ট্যাক্সি নিয়ে বন্দরে রওনা হলো। ছাউনির তিন ব্লক দূরে এসে নামল গাড়ি থেকে।

সন্ধ্যা হলো। রাত নামল। তবে চাঁদ থাকায় অন্ধকার হলো না। ছাউনির দিকে হেঁটে চলল দলটা। অন্ধকার ছায়ায় গা ঢেকে ঢেকে।

ছাউনি থেকে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ‘ওই দেখুন, আলো।’

দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। তারমানে লোক আছে ভেতরে।

‘তোমার অনুমান ঠিক,’ সাইমন বললেন। ‘সাবধান থাকবে। শব্দ করবে না। শুধু মূর্তিটা পেলেই চলবে না, ডাকাতগুলোকেও ধরতে হবে।’

পা টিপে টিপে ছাউনির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। নীরব হাসি খেলে গেল ঠোঁটে। অন্ধকারে হাসিটা দেখতে পেল না কেউ।

মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে মূর্তিটা, তেরপলে মোড়া।

ডিউক বলল, ‘শোনো, সাগরেই ফেলতে হবে। কেউ জানবে না তাহলে।’

‘আমার কোন আপত্তি নেই,’ হোগারফ বলল। ‘টপ, তুমি কি বলো?’

সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল টপ।

সরে এল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, ‘ওরাই। কিন্তু মূর্তিটা সাগরে ফেলতে চায় কেন ওরা বুঝতে পারছি না।’

‘জানার একটাই উপায়,’ মুসা বলল, ‘ব্যাটাদের আটক করা।’

মুসা আর ল্যারি গিয়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজায়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল পাঁচজনে। তাজ্জব হয়ে গেল তিন ডাকাত।

সবার আগে উঠে দাঁড়াল হোগারফ।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল মুসা। গিয়ে পড়ল লোকটার পেটে। নিগ্রো-খুলির প্রচণ্ড আঘাতের স্বাদ বুঝল উল্কি-মানব। হুঁক করে শব্দ বেরোল মুখ থেকে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল দেহটা। তাকে নিয়ে মাটিতে পড়ল মুসা।

ডিউককে আক্রমণ করল কিশোর আর রবিন। একসঙ্গে চলল জুডো আর কারাত। কয়েক সেকেন্ডের বেশি টিকতে পারল না সে। শরীরটা বিরাট হলে কি হবে, মারপিটের কায়দা জানে না।

টপকে কাবু করে ফেললেন সাইমন আর ল্যারি মিলে।

শক্ত করে হাত-পা বাঁধা হলো তিন ডাকাতের।

কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা বলল, ধরে নিয়ে গিয়ে এখন লেকের পাড়ে ফেলে রাখা উচিত। মশার কামড় খাক। মজা বুঝবে। খুদে ভ্যাম্পায়াররা...’

তার কথা শেষ হলো না, গোঙানি শোনা গেল তেরপলের মোড়কের ভেতর থেকে।

মুসা ভাবল, মূর্তিটাই গুঙিয়েছে। ‘খাইছে! ভূত!’ বলেই দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

তার হাত ধরে ফেলল কিশোর।

দড়ির প্যাঁচ খুলতে শুরু করল ল্যারি আর সাইমন। তেরপলের ভেতর থেকে বেরোল একজন জীবন্ত মানুষ।

মারগো দ্য ক্লাউন!

‘সর্বনাশ!’ বলে উঠল রবিন, ‘এই ভাঁড় বেচারাকে সাগরে ফেলতে চেয়েছিল ওরা!’

‘আরও আগেই ফেলা উচিত ছিল!’ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল টপ হানিবার। ‘শয়তান!’

‘চুপ!’ ধমক দিলেন সাইমন। ‘মারগো, তোমাকেও বাঁধতে হবে?’

‘না, স্যার, আমি পালাব না।’

‘তাহলে বলে ফেলো তো তোমার এই অবস্থা কেন?’

বিচিত্র এক গল্প শোনাল মারগো। তিমি সমাজের সদস্য সে, তার সাঙ্কেতিক নাম বটলনোজ। হোগারফের নাম ব্লু। পিগমি ডার্ক বিলি কাজ করত অ্যাবারিন গাউফের সার্কাসে। স্টাফ করা তিমির মধ্যে মূর্তিটা সে-ই লুকিয়েছিল। পরিস্থিতি তখন এতটা গরম ছিল, বিক্রি করার সাহস পায়নি ওটা। রকি বীচে খেলা দেখাতে গিয়েছিল গাউফ। তখন তার সার্কাসের করুণ দশা। ওখানে থাকতেই ফতুর হয়ে গেল গাউফ, ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলল। ভেঙে দিল সার্কাস। বিশাল তিমিটা নিয়ে পড়ল বিপদে। কেউ কিনতে রাজি হলো না। দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসার ট্রাক ভাড়াও নেই তখন তার কাছে। অগত্যা মাটিতে পুঁতে নিষ্কৃতি পেল।

ইতিমধ্যে খুন হলো বিলি।

'কিশোর, তোমার বন্ধুরা কিনে নিয়ে গেল তিমিটা,' মারগো বলছে। 'ভাবলাম, কোন একটা বুদ্ধি করতে হবে, যাতে তিমির পেট থেকে মূর্তিটা বের করে আনা যায়। কিন্তু তার আগেই শয়তানি শুরু করল হোগারফ। সবাইকে ঠকিয়ে নিজে গেলার চেষ্টা করল।'

জানা গেল, রহস্যময় সেই ইনফর্মার মারগো ছিল না, ছিল হোগারফ। সে বুঝতে পারল, এতদিন পরও মূর্তিটা খোলা বাজারে বিক্রি করা বিপজ্জনক, তাই যে ভাবে সম্ভব কিছু টাকা বাগিয়ে নিতে চাইল।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মারগোর দিকে তাকাচ্ছে উল্কি-মানব।

পরোয়া করল না ভাঁড়। তার কথা বলে যাচ্ছে।

মারগোর ওয়াগনে হোগারফই ঢুকেছিল। বাংকের নিচে লুকানো বাক্স বের করে কাগজপত্র সব পুড়িয়ে সমস্ত তথ্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল।

'বুঝে ফেলেছিলাম,' মারগো বলছে, 'ও আমার পেছনে লেগেছে। ভয় হলো, বিলির মত আমাকেও খুন হতে হবে। তাই লুকাতে চাইলাম। কিশোর, সেদিন বিকেলে কারনিভালে খেলা দেখানোর সময় তোমাদের হাতে একটা ছবি দেখেছিলাম। তোমাদের সব কথা শুনেছিলাম। ভাবলাম, ফ্রেড ওয়ালকিন সেজে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'পালালেন কেন আবার এত তাড়াতাড়ি?' জানতে চাইল কিশোর।

'ভয় পাচ্ছিলাম, কোন দিন আবার আসল ফ্রেড চলে আসে। তা ছাড়া কারনিভালটা চলে গেছে তখন রকি বীচ থেকে। হোগারফও দূরে সরে গেছে। তার ভয় আর ততটা পাচ্ছিলাম না।'

কিন্তু বেরিয়ে ভুল করেছে মারগো। কিশোরদের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর পরই ধরা পড়ে, কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় হোগারফের সাগরেদরা। ওদেরকে বুঝিয়েছে হোগারফ, আসল শয়তান মারগো, সবাইকে ঠকিয়ে মূর্তিটা বিক্রি করে সব টাকা একাই মেরে দিতে চায়। পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে সে, দলের সবাইকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। যে শয়তানিটা হোগারফ নিজে করেছে, সেটা চাপিয়ে দিতে চেয়েছে মারগোর ওপর।

'এবং দলের লোকে বিশ্বাসও করেছে ওর কথা,' মারগো বলল।

আসল সত্যিটা জেনে গিয়ে সাংঘাতিক খেপে গেল ডিউক আর টপ। মুক্ত থাকলে এখন গিয়ে গলা টিপে ধরত হোগারফের। কিন্তু সেই সুবিধা নেই, তাই আপাতত গালাগাল ছাড়া আর কিছু করতে পারল না।

মারগোকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আমাকে ফেরিস হুইলে কে বেঁধেছিল? আপনি?'

'না, আমি বাঁধতে যাব কেন? ওই হোগারফ।'

হোগারফের দিকে ফিরল রবিন, 'আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন?'

'তো কি করব? মারতে না পারায় আফসোসই হচ্ছে। তিনটে বিচ্ছুকেই খতম করে দিতে পারলে আজ আর এই অবস্থা হত না আমাদের। শেষ পর্যন্ত ধরাই যদি পড়লাম, এতগুলো বছর অপেক্ষা করলাম কিসের জন্যে!'

'কিসের জন্যে?' সাইমন বললেন, 'সেই পুরানো প্রবাদটা বলতে হচ্ছে: অপরাধ কখনও সুফল আনে না।'

'তিমিটা বেলুনে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ফন্দিটা কার?' হোগারফকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার। স্টোকস, টপ আর কিটি সাহায্য করেছে আমাকে।'

'কিটি নুবারও কি তিমি সমাজের সদস্য?'

'না। ডিউক আর ওকে ভাড়া করেছিলাম কাজ করে দেয়ার জন্যে।'

'আর স্ট্রেচ বিটার?'

'ওই গাধাটা! ওকে দিয়ে কি হবে? ও এ-সবে নেই।'

'বিডকেও নিশ্চয় আপনিই পিটিয়ে বেহুঁশ করেছিলেন?'

আরেক দিকে তাকাল হোগারফ। জবাব দিল না।

'মূর্তিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন সাইমন।

চুপ করে রইল হোগারফ।

মারগো বলল, 'আমি জানি কোথায়। ঘাটে ওদের একটা নৌকা আছে। তার নিচে বেঁধে রেখেছে।'

'চলো, ওঠো, আমাদের দেখাবে।'

বন্দিদের পাহারায় রইল ল্যারি।

মারগোর সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা আর সাইমন।

জেটির একধারে ওদেরকে নিয়ে এল মারগো। ওখানটায় অন্ধকার। টর্চের আলোয় ছোট নৌকাটা দেখিয়ে দিল মারগো। ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

মুহূর্ত দ্বিধা করল না মুসা। জামা-কাপড় খুলে নেমে গেল পানিতে। নৌকার নিচে ডুব দিয়ে দেখে এসে মাথা তুলল। জানাল, আছে।

মারগোও পানিতে নামল। ওপর থেকে টর্চ ধরে রইলেন সাইমন। নৌকায় উঠল কিশোর আর রবিন।

দড়ি কেটে পানির নিচ থেকে মূর্তিটা তুলে আনল মারগো আর মুসা। নৌকায় তুলতে সাহায্য করল কিশোর ও রবিন। তারপর নৌকা বালিতে তুলে মূর্তিটা তীরে নামাতে আর অসুবিধে হলো না।

হেসে বলল রবিন, 'যাক, শেষ পর্যন্ত এই কেসটাতেও ব্যর্থ হলাম না আমরা।'

'বরং ডবল জেতা জিতলাম,' মুসা বলল। 'মূর্তি পেলাম, ডাকাত ধরলাম, আর কি চাই?'

'পুলিশকে খবর দিতে হয় এবার,' সাইমন বললেন।

মূর্তি আর ডাকাতের দলকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পরদিন ভোরবেলা রকি বীচে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

দু-দিন পর বিকেলে ইয়ার্ডে বসে আড্ডা মারছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় একটা ট্যাক্সি ঢুকল ভেতরে। পেছনের সীট থেকে নামল একজন লোক। চাঁদিতে কিছু চুল, ফুরফুরে দাড়ি, রোদে পোড়া চেহারা।

'খাইছে! ফ্রেড ওয়ালকিন!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা।

হেসে ফেলল রবিন।

তাড়াতাড়ি উঠে গেল কিশোর।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা।

এবার আর নকল নয়, আসল ওয়ালকিনই এসেছে।

সন্ধ্যায় চায়ের আসর বসল সাগর-ফেরা মেহমানের সম্মানে।

সাগরের গল্প শুনছে সবাই। এক কথা দু-কথা থেকে স্ক্রিমশের কথা উঠল।

আলোচনার মাঝে এক সময় পকেট থেকে গোল চাকতির মত একটা জিনিস বের করল মুসা। ধারগুলোতে সরু দাঁত কাটা। বেশ যত্ন করে সময় নিয়ে কাটা হয়েছে, বোঝা যায়। তিমির দাঁত কেটে তৈরি করেছে সে। মেরিচাচীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আন্টি, আপনাকে দিলাম। আমার নিজের হাতে তৈরি স্ক্রিমশ।'

'খুব সুন্দর তো,' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন চাচী। 'কিন্তু এটা দিয়ে কি হয় তা তো বুঝলাম না?'

'কেক, বিস্কুট, এ সবের কিনারে চমৎকার নকশা কাটতে পারেন। কিছু না, চেপে ধরে আস্তে আস্তে ঘোরালেই হয়ে যাবে।' হাত বাড়াল মুসা, 'দিন, দেখিয়ে দিই।'

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'আমাকে দেয়ার পেছনে নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে তোমার। ঠিক বলিনি?'

'উদ্দেশ্যটা তো সহজ,' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। 'রোজ তুমি কেক-বিস্কুট বানাবে। নকশা কাটতে গেলেই মনে পড়বে মুসা আমানের কথা। পেটুকটাকে বাদ দিয়ে কি আর একা খেতে পারবে তখন? দু-চারটে রেখে দেবেই ওর জন্যে।'

হেসে ফেললেন চাচী। 'বুদ্ধি আছে। বোস তোরা। কথা বল। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। এখনই কাজে লাগিয়ে দেব স্ক্রিমশ।'

****

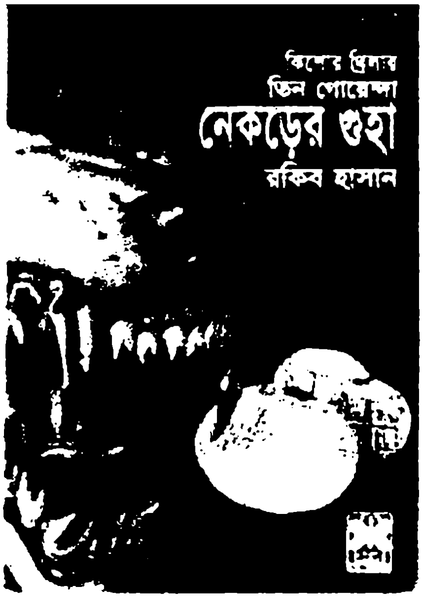

নেকড়ের গুহা

প্রথম প্রকাশঃ ২০০১

'মরবে আজ কেউ না কেউ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর পাশা।

থমকে দাঁড়িয়েছে সে ও তার চার বন্ধু। বনের মধ্যে রয়েছে ওরা। কাছের খাঁড়িটা থেকে কানে আসছে উচ্চকিত হাসি আর রাইফেলের গুলির শব্দ।

'শিকার করতে বেরিয়েছে, আরও সাবধান হওয়া উচিত ব্যাটাদের,' গম্ভীর কণ্ঠে রবিন বলল।

'চলো, কেবিনে চলে যাই,' তাগাদা দিল মুসা। 'এখানে দাঁড়িয়ে অকারণ গুলি খেয়ে মরার চেয়ে বরং অন্য কিছু খাইগে। আমার খিদে পেয়েছে।'

একমত হলো টম, 'ঠিক। আজ কেবিনেই থাকি। কাল বরং একটা ক্যাম্প-সাইট খুঁজে বের করব।'

'দেখো, কাল পর্যন্ত থাকে নাকি ওরা,' তিন গোয়েন্দার কথা বলল বিড হুফার, 'রহস্য তো ওদের পায়ে পায়ে ঘোরে। কখন জড়িয়ে যাবে!'

হেসে জবাব দিল কিশোর, 'সুযোগ একটা আছে অবশ্য...'

কথা শেষ হলো না তার। প্রাণ কাঁপানো শব্দ করে রবিনের মাথার ইঞ্চিখানেক ওপরে গাছে বিঁধল বুলেট।

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সব। তারপর কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, ঠিক আছ তো তুমি?'

গাছের বাকলে বুলেটের গভীর গর্তটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল রবিন। 'আমি ঠিকই আছি। তবে আর ইঞ্চিখানেক নিচ দিয়ে গেলেই...'

রাগে বিকৃত হয়ে গেল টমের সুদর্শন মুখটা। 'ব্যাটাদের শিকার আমি বের করতে যাচ্ছি!'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই তিন শিকারীকে দেখা গেল।

'অ্যাই!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'কি শুরু করলেন আপনারা? আরেকটু হলেই তো মেরে ফেলেছিলেন আমাদের একজনকে!'

'শিকার করছেন, করুন,' টম বলল। 'সাবধানে গুলি করলেই হয়।'

'সরি, বয়েজ,' জবাব দিল এক শিকারী। তার দুই সঙ্গী হাঁটতেই থাকল। ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। শিকারের সন্ধানে।

'সরি বললেই কি হয়ে গেল নাকি?' রেগে উঠল মুসা।

'কারও গায়ে লাগেনি যখন, সরিই তো যথেষ্ট,' জবাব দিল শিকারী। 'কেউ তো আর মারা যায়নি।'

'গেলে কি খুব ভাল হত নাকি!' টমও রেগে গেল ভীষণ। 'মনে হচ্ছে খুব আনন্দ পাচ্ছেন?'

আর তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে দুই সঙ্গীর সঙ্গে প্রথম শিকারীও ঝোপে ঢুকে পড়ল।

'নাম্বার ওয়ান বেয়াদব!' বন্ধুদের দিকে ফিরল রবিন, 'গেছিল আজ তোমাদের এক পার্টনার। লোকগুলো এমন করছে কেন?'

পাঁচজনে মিলে টাকা দিয়ে বনের মধ্যে একটা কেবিন ভাড়া করেছে ওরা। এটাকে ঘাঁটি বানিয়ে, এখান থেকে রকি বীচের উত্তরে গভীর বনে অভিযান চালানোর ইচ্ছে। বুনো জীবন দেখবে। পিকনিক করবে। বাইরে রাত কাটানোর উপযুক্ত একটা ক্যাম্প-সাইট খুঁজতে বেরিয়েছে সে-জন্যে।

'দেখোগে আবার এর মধ্যে কোন রহস্য-টহস্য আছে কিনা,' রবিনের প্রশ্নের জবাবে বলল বিড। 'তোমাদের সঙ্গে বেরোলে কি আর শান্তি আছে। বেরোব এক কাজে, জড়াবে আরেকটায়।'

'এদের নিয়ে সমস্যাই হলো সেটা,' টম বলল। 'আজকের পুরো দিনটা যে ওরা আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেল—সেটাই এক আশ্চর্য।'

'অত বোলো না,' কিশোর বলল, 'চান্স একটা আছেই যাওয়ার। ওমরভাই গেছে একটা কেসের তদন্ত করতে। বলা যায় না, যে কোন সময় আমাদের সাহায্য চেয়ে বসতে পারে।'

গুঙিয়ে উঠল বিড। 'গেল তারমানে আমাদের ক্যাম্প-সাইট খোঁজা! আগে বলোনি কেন? তাহলে আসতামই না।'

হাসল কিশোর, 'সত্যি কথাটা হলো, কেস একটা হাতে নিয়েই আমি এসেছি এখানে।'

'কি!' চেঁচিয়ে উঠল বিড।

'মনে আছে ঢোকার মুখে স্টোরটায় হ্যারি হ্যারিসন নামে একজন লোকের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম আমি?' কিশোর বলল। 'ওর ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিল আমাকে ওমরভাই। এই বনেই বাস করে হ্যারিসন। ওমরভাই বলেছে, তার কেসের জন্যে মূল্যবান তথ্য দিতে পারবে এই লোকটা।'

'থাক, কথা পরেও বলা যাবে,' আপাতত গোয়েন্দাগিরি নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না মুসা। 'আগে খাওয়া, তারপর অন্য কথা।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। অন্ধকার বাড়ছে। বনের মধ্যে এক টুকরো খোলা জায়গায় কাঠ দিয়ে বানানো কেবিনটার কাছে যখন পৌঁছল ওরা, কুয়াশা পড়তে আরম্ভ করেছে। দূর থেকে এখনও ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে রাইফেলের গুলির শব্দ।

মহা বিরক্তির সঙ্গে রবিন বলল, 'ওই গর্দভ শিকারীগুলো এখনও ওদের শয়তানি চালিয়েই যাচ্ছে!'

কেবিনে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা, 'চুপ!'

সবাই দাঁড়িয়ে গেল। কান পেতে আছে। মুসা বলল, 'একটা চিৎকার শুনলাম মনে হলো।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও আর কিছু না শুনে কেবিনে ঢুকল ওরা।

হ্যারিকেনটা জ্বালতে জ্বালতে টম বলল, 'গুলি খেয়ে কেউ জখম হয়নি তো?'

ফায়ারপ্লেসের আগুন ধরাতে গেল কিশোর আর রবিন। মুসা বসল চুলার কাছে খাবার তৈরি করতে।

'এখানে জখম হলে তো মহা বিপদে পড়বে,' বিড বলল।

সবচেয়ে কাছের শহর ডিকসনভিল থেকে দশ মাইল দূরে রয়েছে ওরা। একমাত্র পাহাড়ী রাস্তাটা কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু–কোথাও প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে নিচের দিকে। অযত্নে পড়ে থেকে জায়গায় জায়গায় ছাল উঠে গেছে। গাড়িটা ডিকসনভিল গ্যারেজে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে ওরা। শহরের হোটেল মালিক নীল ও'হারা এই কেবিনটা ভাড়া দিয়েছে ওদেরকে। আর মালিকের ছেলে কেটি জীপে করে ওদেরকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

'সাহায্য পাওয়াও বড় মুশকিল এখানে,' রবিন বলল।

'খাবার প্রায় রেডি,' ঘোষণা করল মুসা। 'যার যার চেয়ার টেনে এনে বসো…' থেমে গেল সে।

বাইরে ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এসেছে। মুহূর্ত পরেই ঘন ঘন থাবা পড়তে লাগল দরজায়। দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিল বিড। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে কেবিনের মালিক নীল ও'হারার ছেলে কেটি।

দুই

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল বিড।

'তিন গোয়েন্দার নামে হোটেলে একটা লং-ডিসট্যান্স কল এসেছে,' দম নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে কোনমতে কথাগুলো উগরে দিল কেটি।

'কোত্থেকে?' তিন লাফে দরজার কাছে চলে গেল কিশোর।

'জানি না,' কেটি বলল। 'লাইনে প্রচণ্ড গোলমাল। এটুকু কেবল বুঝতে পেরেছি, ঘণ্টাখানেক পর আবার ফোন করবে সেই লোক।'

'নিশ্চয় ওমরভাই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। ওমরকে মিস্টার ও'হারার ফোন নম্বর দিয়েছিল সে।

'তা-ই হবে,' রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরের পাশে।

'এক কাজ করো,' কিশোর বলল। 'মুসা, তোমরা খাওয়াটা সেরে ফেলো। আমি রবিনকে নিয়ে কেটির সঙ্গে যাচ্ছি।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। খোলা জায়গাটুকু পার হয়ে বুনোপথে ঢুকল কেটি। পেছন পেছন চলল দুই গোয়েন্দা। কুয়াশা কমেনি, বরং বাড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বন থেকে বেরিয়ে কেটির জীপে চড়ল ওরা। সামনের দুটো সীটে ঠাসাঠাসি করে বসল।

'শক্ত হয়ে বসে থাকো!' সাবধান করল কেটি। ভয়ানক খাড়া ঢাল বেয়ে গাড়ি

নামাতে শুরু করল সে। রাস্তার অবস্থা এমনই খারাপ, ঝাঁকুনিতে হাড় পর্যন্ত কেঁপে যায়।

বিশ মিনিট পর ডিকসনভিলের মেইন স্ট্রীটে ঢুকল গাড়ি। ও'হারা হোটেলের সামনে এনে গাড়ি থামাল কেটি। কিশোররা হোটেলের রিসিপশনে ঢোকার মুখেই টেলিফোনের শব্দ শুনল।

ওয়াল টেলিফোনের রিসিভারটা ছোঁ মেরে তুলে নিলেন নীল ও'হারা। চিৎকার করে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছে!' বলে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

'আমি পিটার ক্লিনসন,' স্পীকারে ভয়ানক খড়খড় শব্দ। সেই সঙ্গে প্রবল ঝড় বয়ে যাওয়ার মত সোঁ-সোঁ। শুনতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। 'ওমর আমাকে অনুরোধ করেছে তোমাদের জানাতে তোমাদের সাহায্য দরকার তার। অতি জরুরী।'

'ওমরভাই ভাল আছেন?' শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর।

তারের মধ্যে দিয়ে আসা খড়খড় শব্দ এত বেড়ে গেল কিছুই শুনতে পেল না কিশোর। খানিকটা কমে এলে শুনল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো লাকি লোডে।'

ডেড হয়ে গেল লাইন।

কিশোরের মুখে শুনে রবিন বলল, 'মিস্টার ক্লিনসনই ফোন করেছেন কি করে শিওর হব?'

পিটার ক্লিনসন ওমর শরীফের পুরানো বন্ধু। তার বাড়িতেই ওঠার কথা ওমরের।

'লাকি লোড থেকে করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' মিস্টার ও'হাবা বললেন। 'অপারেটর বলছিল লাকি লোড কলিং।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'কিছু একটা ঘটেছে ওখানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে যাওয়া দরকার আমাদের।'

রকি বীচের ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ফোন করে জানা গেল সকাল বেলা একটা ফ্লাইট আছে। তাড়াতাড়ি করলে তাতে করে রওনা হতে পারে ওরা।

বহু চেষ্টার পর লাকি লোডের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করা গেল। কখন আসছে ওরা, পিটারকে জানাল কিশোর।

'যাওয়ার আগে খেয়ে যাও,' মিস্টার ও'হারা বললেন। 'কেটির কাছে শুনলাম, খাবারের কাছ থেকে তুলে এনেছে তোমাদের।'

সাগ্রহে রান্নাঘরে গিয়ে মিস্টার ও'হারা আর কেটির সঙ্গে খাবার টেবিলে বসল দুই গোয়েন্দা। খেতে খেতেই ভবিষ্যতের প্ল্যান তৈরি করল দু'জনে। কেটিকে অনুরোধ করল ওদেরকে কেবিনে দিয়ে আসার জন্যে। এখান থেকে রকি বীচে রওনা হতে পারলে ভাল হত। জিনিসপত্র যা আছে কেবিনে, ওগুলো আপাতত না আনলেও চলত। কিন্তু মুসা রয়ে গেছে। টম আর বিডের কাছে মাপ চাওয়াটাও জরুরী, নইলে রেগে আগুন হয়ে যাবে।

ফিরে এসে গ্যারেজ থেকে গাড়িটা নিয়ে সারারাত চালিয়ে ভোরের আগে

আগে রকি বীচে পৌঁছাতেই হবে যে করেই হোক। তাই কেবিনে ফেরার পথে কেটিকে 'আরও জোরে, আরও জোরে' চালানোর তাগাদা দিতে গিয়ে ডেকে আনা হলো বিপত্তি। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা বড় পাথরে গাড়ি তুলে দিল কেটি। জীপের নিচে ঘষা লাগার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল গাড়ি। সামলাতে পারল না কেটি। রাস্তার পাশের গাছে গুঁতো লাগাল প্রথমে। তারপর গিয়ে পড়ল খাদে।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল কেটি। দেখেটেখে বলল, 'ভয় নেই। ঠেলা দিলেই রাস্তায় উঠে যাবে।'

'তুলে কি লাভ?' কিশোর বলল। 'কি হারে তেল পড়ছে দেখো। মেরামত সম্ভব না। আমরা বরং কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকি। তুমি শহরে গিয়ে মেকানিক নিয়ে এসো। পারলে আরেকটা গাড়ি।'

এ ছাড়া কোন উপায় নেই দেখে দ্রুতপায়ে ঢালু পথ ধরে রওনা হয়ে গেল কেটি। আর এবড়ো-খেবড়ো খাড়া পথ বেয়ে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। টর্চের আলো খুব সামান্যই ভেদ করতে পারছে ঘন কুয়াশার দেয়াল। পাথরে ঠোকর খেয়ে, গর্তে পড়ে হোঁচট খেতে লাগল অনবরত ওরা। কুয়াশাভেজা রাতের বাতাস অস্বস্তি জাগাচ্ছে চামড়ায়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কিসের শব্দ?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। বন থেকে ভেসে এল একটা অস্পষ্ট গোঙানি মেশানো কণ্ঠ।

'শুনলে!' বলে উঠল রবিন।

আবার শোনা গেল গোঙানি। সেই সঙ্গে চিৎকার, 'এই, কে আছো ভাই! আমাকে বাঁচাও!'

'মনে হচ্ছে কেউ বিপদে পড়েছে! চলো তো দেখি,' শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল কিশোর।

ডান দিকের বনে ঢুকে পড়ল দু'জনে। কুয়াশা ঢাকা বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল যতটা সম্ভব দ্রুত। মুখে বাড়ি মারছে নিচু ডাল। ওকের বেরিয়ে থাকা মস্ত একটা শিকড়ে হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল রবিন।

আবার কানে এল গোঙানি। জোরাল শোনা যাচ্ছে এখন। সাহায্যের আবেদনও করল আবার লোকটা।

'ওদিকে,' কুয়াশা যেদিকে সবচেয়ে ঘন সেদিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

সাবধানে এগিয়ে চলল ওরা। আবার হোঁচট খেতে চায় না।

গোঙানিটা শোনা গেল আবার। এবার আরও জোরে। মনে হচ্ছে একেবারে পায়ের নিচ থেকে আসছে।

কি আছে বোঝার জন্যে সামনে পা বাড়িয়েই ঝট করে ফিরিয়ে আনল কিশোর। 'সাবধান!' রবিনের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সামনে খাদ।'

অর্ধেক হেঁটে অর্ধেক পিছলে খাদের নিচে নেমে এল ওরা। কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেল কিশোর। তীব্র গোঙানি শোনা গেল আরেকটা। পড়ে থাকা দেহটার ওপর আলো ফেলল সে।

'রবিন, এই যে লোকটা,' চিৎকার করে উঠল কিশোর।
হাঁটু গেড়ে লোকটার পাশে বসে পড়ল দু'জনে।
'গুলি লেগেছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা। 'পায়ে!'
কোন্ পায়ে লেগেছে প্যান্টের ফুটো আর রক্ত দেখেই বুঝে গেল কিশোর। খুব সাবধানে কাপড় সরাল। 'রক্ত অত বেরোচ্ছে না এখন। তবে নাড়াচাড়া করলেই বেরোনো শুরু হবে আবার।'
দু'জনের দুটো রুমাল ক্ষতের ওপরে-নিচে শক্ত করে কষে বেঁধে দিল ওরা। ব্যথা পেলেও যতটা সম্ভব কম গোঙানোর চেষ্টা করল আহত লোকটা। কিন্তু যেই ধরে ওকে উঁচু করতে গেল ওরা, গেল বেহুঁশ হয়ে।
'অতিরিক্ত দুর্বল,' কিশোর বলল। 'তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার।'
কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'কেবিনটা যদি খুঁজে না পাই?' উদ্বেগে ভরা কণ্ঠ।
'পেতেই হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানে থাকলে মারা যাবে লোকটা।'

তিন

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় ভালই হলো। ধরাধরি করে লোকটাকে খাদের ওপর তুলে নিয়ে এল ওরা। কাঁধে তুলে নিল কিশোর।
'ভাগ্যিস ছোটখাট মানুষ,' বলল সে। 'ওজন কম।'
আগে আগে টর্চ জ্বেলে কুয়াশার মধ্যে পথ দেখে চলল সে। ক্রমে পাতলা হয়ে এল কুয়াশা। গাছপালার অবয়ব চোখে পড়ছে এখন আগের চেয়ে ভাল।
'এটা মনে হয় সেই ওকটা, যেটার শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম,' রবিন বলল। 'এখান থেকে বাঁয়ে যেতে হবে।'
গতি খুবই ধীর। অনিশ্চিত পদক্ষেপ।
কিশোর বলল, 'শীঘ্রি যদি রাস্তাটা চোখে না পড়ে, থেমে যেতে হবে আমাদের। বুঝতে হবে পথ হারিয়েছি আমরা। রাস্তার দিকে না গিয়ে গভীর বনের দিকে চলে যাচ্ছি।'
লোকটার ক্ষত থেকে রক্ত তেমন ঝরছে না, এটা একটা স্বস্তি। চলতে চলতে যখন পথ হারিয়েছে ভেবে ঘুরতে যাবে ওরা, এই সময় রবিনের পায়ের নিচে পাথর পড়ল। চিৎকার করে উঠল সে, 'এই যে রাস্তা!'
সাবধানে খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। বহু পরিশ্রমের পর উঠে এল ওপরে। ভেসে যাওয়া কুয়াশার স্তর এখানে কিছুটা পাতলা। টলোমলো পায়ে এগিয়ে চলল ওরা। অবশেষে সেই রাস্তাটা চোখে পড়ল, যেটা দিয়ে খোলা জায়গাটায় যাওয়া যায়। কয়েক মিনিট পর কেবিনটা পাওয়া গেল। দরজায় গিয়ে দমাদম কিল মারতে শুরু করল রবিন।
দরজা খুলে দিয়েই চিৎকার করে উঠল টম।

ধরাধরি করে দ্রুত অচেতন লোকটাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা। ঢেকে দিল কম্বল দিয়ে। টেবিল থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে এল বিড। লোকটার মুখের কাছে ধরল আলোটা। চামড়ায় বহুকাল খোলা আবহাওয়ায় কাটানোর ছাপ। ওর মলিন উলের হ্যাটটা খুলে নিল মুসা। বেরিয়ে পড়ল ঘন চুলের বোঝা।

লোকটার প্যান্ট কেটে ক্ষতটা পরীক্ষা করতে বসল কিশোর। কি ঘটেছে, বাকি তিনজনকে বলতে লাগল রবিন। ইতিমধ্যে ফার্স্ট-এইড-কিট খুলে ফেলেছে টম। সুপের ক্যান গরম বসিয়েছে মুসা।

'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার লোকটাকে,' ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে বলল কিশোর। 'গুলিটা মনে হয় ভেতরে রয়ে গেছে। বের করতে হবে।'

গুঙিয়ে উঠল লোকটা। কয়েকবার মিটমিট করে খুলে গেল তার চোখের পাতা। 'আ-আমি কোথায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

জানানো হলো তাকে।

'এটা গিলে ফেলুন,' কাপে করে সুপ নিয়ে এসেছে মুসা। 'আরাম লাগবে। পারবেন, না চামচ দিয়ে খাইয়ে দেব?'

কাপ দিয়েই খেতে পারল লোকটা। কাপটা তার মুখের কাছে ধরে রাখল মুসা।

'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে,' খানিকটা বল ফিরে পেল লোকটা। 'আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ। ঋণী হয়ে গেলাম তোমাদের কাছে।'

'সমস্যা এখনও শেষ হয়নি,' কিশোর বলল। 'আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কেটি ও'হারা ফিরে এলেই...' লোকটাকে চমকে উঠতে দেখে থেমে গেল কিশোর। 'কি ব্যাপার? কিছু হলো নাকি?'

'তোমাদের মধ্যে কিশোর পাশা বলে কেউ আছ নাকি?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

নিজের আর বন্ধুদের পরিচয় দিল কিশোর।

'এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে ওই গর্দভগুলো এ হাল করেছে আমার,' লোকটা বলল। 'তোমাদের সঙ্গেই দেখা করতে আসছিলাম আমি। ডিকসনভিলের স্টোরকীপার বলেছে তোমরা নাকি আমার খোঁজ-খবর করছিলে।'

'আপনিই তাহলে হ্যারি হ্যারিসন?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম।'

'আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমরা,' কিশোর বলল। 'আপনার কেবিনটা খুঁজে পেলেও আপনাকে বাড়ি পাওয়া যাবে কিনা সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিল তার। তার ধারণা, পেতে রাখা ফাঁদগুলোতে জানোয়ার ধরা পড়েছে কিনা দেখতে গভীর বনে চলে গেছেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারিসন। 'তা মাঝে মাঝেই যাই। তা ছাড়া কোথায় আছে জানা না থাকলে আমার বাড়িটা পাওয়াও কঠিন।' তেরছা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে কেন তুমি?'

'সেটা নাহয় পরেই শুনবেন,' কিশোর বলল। 'এখন আপনি ভীষণ দুর্বল।

কথা বলার অবস্থা নেই আপনার।'

কিন্তু শোনার জন্যে চাপাচাপি করতে লাগল হ্যারিসন। সুতরাং বলতে বাধ্য হলো কিশোর। জানাল, ওদের এক বন্ধু শখের গোয়েন্দা। একদল ডাকাতকে ধরতে মনটানায় গেছে।

'ওমরভাইর ধারণা, লাকি লোডের আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা,' কিশোর বলল। 'পঁচিশ বছর আগে নাকি সোনার খোঁজে ওই এলাকা চষে ফেলেছিল প্রসপেক্টররা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হয়েছিল চোর-ডাকাতের দল। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে প্রচুর গোপন আস্তানা ছিল ওদের। ওরকম কোন আস্তানাতে গিয়ে ঠাঁই নিতে পারে বর্তমানের ডাকাতরাও। ওমরভাইর আশা, আপনার কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে। কারণ সে-সময় আপনি ওই এলাকায় ছিলেন। সোনা খুঁজেছেন। বুনো অঞ্চলগুলো আপনার চেনা।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বুড়ো ট্র্যাপার। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কি ভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না। তবে জায়গাটা যে চিনি আমি, তাতে সন্দেহ নেই।'

'ডাকাতদের গোপন আস্তানা চিনতেন আপনি?'

'কিছু কিছু চিনি, মানে চিনতাম। একবার তো ডাকাতদের সঙ্গে টক্কর লেগে মরতে মরতে বেঁচেছি।'

'খুলে বলবেন?' কিশোর বলল।

'শুনবে? বেশ।' শুরু করল হ্যারিসন, 'দুই ভাই ব্রিড হ্যাংসন আর গ্রিড হ্যাংসন, এবং উফার গ্রেট নামে লাল চুলওয়ালা বিশালদেহী এক দুর্ধর্ষ লোকের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলাম আমি। বিটাররুট পাহাড়ের একটা পুরানো ক্লেইমে কাজ করতে করতে পেয়ে গেলাম একদিন ব্যাগ ভর্তি সোনা।'

'খনিতে ব্যাগ ভর্তি সোনা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারিসন। 'খনির সোনা বের করতে না পারলেও লুকিয়ে রেখে যাওয়া গুপ্তধন পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তিন বস্তা সোনার তাল আর এক বস্তা পুরানো মোহর পড়ে থাকতে দেখলাম পাথরের আড়ালে। ডাকাতির মাল, বোঝাই যাচ্ছিল; তবে কোন ডাকাত, কি তার নাম, জানতে পারিনি কোনদিন। লুকিয়ে রেখে যাওয়ার পর নিশ্চয় মরে গিয়েছিল, তুলে নিয়ে যেতে পারেনি আর।'

'তারপর?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে মুসা।

'আমাদের এই সোনা পাওয়ার খবর গোপন রইল না। কি ভাবে ছড়াল, তা-ও জানি না। মদের নেশায় কারও সামনে ফাঁস করে দিয়েছিল হয়তো আমাদের চারজনের কেউ। আমরা সোনাগুলো নিয়ে কেটে পড়ার আগেই আক্রমণ করে বসল তৎকালীন মনটানার সবচেয়ে কুখ্যাত ডাকাত ব্ল্যাক পেপারের দল। আমাদের কেবিন ঘিরে ফেলল ওরা। ভাবলাম, আর বাঁচাবাঁচি নেই, আজকেই আমাদের জীবনের শেষ!'

'বেরোলেন কি করে শেষে?' কৌতূহলে ফাটছে টম।

'প্লেন চালাতে পারত উফার, এক্স-পাইলট ছিল। একটা প্লেন ভাড়া করে এনে শৈলশিরার ওপর রেখে দিয়েছিল সে, ঘোড়ায় করে নেয়ার চেয়ে প্লেনে নিয়ে

যাওয়া অনেক সহজ ছিল বলে। ডাকাতরা যখন আক্রমণ করল, তখন সোনাগুলো কেবিনে ছিল না। ওরা আসার আগেই প্লেনে রেখে এসেছিলাম। আকাশ খারাপ ছিল বলে রওনা হতে পারেনি উফার।

'আমরা চালাকি করে ব্ল্যাক পেপার আর তার দলকে কেবিনের সামনের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এই সুযোগে উফার বেরিয়ে দৌড় দিল প্লেনের দিকে। কিন্তু দেখে ফেলল ডাকাতরা। তাড়া করল ওকে। একটু পরে প্লেনের শব্দ শুনে বুঝলাম আকাশে উঠে পড়েছে সে। ঠিক এই সময় শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। ডাকাতরা ফিরে আসার আগেই আমরাও পালালাম। ঝড়ের জন্যে আমাদেরকেও আর ধরতে পারল না ওরা।'

'সোনা নিয়ে কোথায় গেল উফার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

কুঁচকে গেল হ্যারিসনের মুখ। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'হেলেনায় দেখা করার কথা ছিল আমাদের। সোনাগুলো ভাগ করে নিতাম। কিন্তু কোনদিন আর উফার কিংবা ওই সোনার মুখ দেখিনি। তাকে সাংঘাতিক বিশ্বাস করতাম আমরা। লোকও সে খুব ভাল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভাল মানুষকেও খারাপ করে দিতে পারে সোনার লোভ, ধ্বংস করে দিতে পারে। যখন বুঝতে পারলাম উফারকে বিশ্বাস করে আমরা ভুল করেছি, তখন আর কিছুই করার ছিল না।'

'এরপর কোনদিন আর ওর খোঁজ পাননি?'

'না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। পাইনি। কোথায় যে গিয়ে লুকাল, কোন হদিসই পাইনি।'

'আপনাদের কেবিনটাতে গিয়েছিলেন আর?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, ওখানে কি আর যাই। গেলে আস্ত রাখত না ব্ল্যাক পেপার। প্রসপেক্টিঙের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। লাকি লোডেও ফিরে গেলাম না আর। হেলেনা থেকে চলে এলাম এখানে। ট্র্যাপিংকে নিলাম পেশা হিসেবে। ফাঁদ পেতে বুনো জানোয়ার ধরে চামড়া বিক্রি করি এখন। হ্যাংসন ভাইদের খবরও জানি না বহুদিন।'

বুড়োর কাহিনী শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সবাই। তারপর কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে পারবেন কোথায় গেলে এখনকার ডাকাতগুলোর দেখা পাবে ওমরভাই?'

শুকনো হাসি হাসল হ্যারিসন। 'সান, অপরাধী লুকিয়ে থাকার অসংখ্য জায়গা আছে ওখানে–মনটানা একটা বিরাট দেশ। বিশাল পর্বতের যেখানে খুশি লুকিয়ে থাকতে পারে ওরা।' ভ্রূকুটি করল বুড়ো। 'তবে একটা জায়গার নাম বলতে পারি, লোন ট্রী–একটা বক্স ক্যানিয়ন, উইন্ডি পীক-এ ওঠার মাঝামাঝি জায়গায়। গুজব আছে, এর আশেপাশেই ছিল ব্ল্যাক পেপারের আড্ডা। আমাদের ক্লেইমটাও ছিল লোন ট্রী এরিয়ায়।'

শুনে বলল কিশোর, 'তারমানে লোন ট্রী'তে গেলে এখনকার ডাকাতগুলোর খোঁজও পাওয়া যেতে পারে বলছেন?'

'যেতেও পারে,' জবাব দিল হ্যারিসন। 'দুর্গম এলাকা তো। অকারণে কেউ যায় না ওদিকটায়।'

'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল সে। 'আপনার কপাল খারাপ বলেই

আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন আজ। না বেরোলে আর গুলিটা খেতে হত না। তবে এটা পুষিয়ে দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব।'

কিশোর কি বলেছে, বুঝতে পেরে রবিন যোগ করল, 'আমরা মনটানায় গেলে উফারকে খুঁজে বের করব–যদি সে বেঁচে থাকে। আপনাদের সোনাগুলোও খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

'দেখো, যদি পারো,' হ্যারিসন বলল। 'তবে পাবে বলে মনে হয় না। সোনাগুলো যদি চুরিই করে থাকে উফার, পঁচিশ বছর পর সেগুলো কি আর রেখেছে মনে করো? বেচেটেচে দিয়ে নিশ্চয় ব্যবসা ফেঁদেছে। তবে,' বুড়োর কণ্ঠেও উত্তেজনার ছোঁয়া, 'যদি তোমরা সত্যিই খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব।'

মাথা চুলকাল হ্যারিসন। চিন্তা করল একটা মুহূর্ত। 'এতে কোন কাজ হবে কিনা জানি না, আমাদের ক্লেইমের একটা নকশা এঁকে দিচ্ছি তোমাদের।'

'তা দিন না!' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। 'এটাই হবে আমাদের প্রথম সূত্র।'

চার

নিজেদের জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করে নিতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ইতিমধ্যে একটা নকশা এঁকে ফেলল বুড়ো। একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে বলল, 'এখানটায় ছিল ক্লেইমটা। জায়গাটাকে লোন ট্রী বলার কারণ বিশাল একটা নিঃসঙ্গ ওক গাছ ছিল এখানে একটা পাহাড়ের চূড়ায়। তখনকার সবাই ওই লোন ট্রী'টা চিনত।'

ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল রবিন।

এ সময় দরজায় থাবা মারার শব্দ হলো। কেটি এসেছে। কিশোর আর রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ভাল আছ তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল, 'জীপের ট্যাংক মেরামত করা হয়েছে।'

হ্যারিসনকে কি ভাবে খুঁজে পাওয়া গেছে, কেটিকে জানাল কিশোর। সবাই মিলে একটা স্ট্রেচার মত তৈরি করে দিল, হ্যারিসনকে বহন করার জন্যে। বয়ে এনে জীপে তোলা হলো তাকে। মালপত্র তুলতে তিন গোয়েন্দাকে সাহায্য করল টম আর বিড।

'যাই তাহলে,' জীপের পাশে দাঁড়ানো টম আর বিডের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'গুড-লাক!' হাত নাড়ল টম।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল কেটি। শহরে পৌছে সোজা ডাক্তারের বাড়িতে গেল সে। তাড়া আছে তিন গোয়েন্দার। সকাল বেলা প্লেন ধরতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধৈর্য ধরে হ্যারিসনের বুলেট বের করার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

'পা'টা আপাতত ব্যবহার করতে পারবেন না উনি,' ধুয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে জানালেন ডাক্তার হুফার। 'সেবা-শুশ্রূষা দরকার। হাসপাতালে

ভর্তি করলে ভাল হয়।'

'না না, অত টাকা নেই আমার,' বাধা দিল হ্যারিসন। 'নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারব আমি।'

'না, তা আপনি পারবেন না,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'আপনাকে আমরা সঙ্গে করে রকি বীচে নিয়ে যাব। আমাদের বাড়িতে। আমার চাচী আর মিস কোয়াডরুপল আপনার দেখাশোনা করবে।'

কিন্তু 'না না' করতেই থাকল বুড়ো। অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কারও বিরক্তির কারণ হতে চায় না। কিশোরও তার সিদ্ধান্তে অটল থাকল। সে নিয়েই যাবে।

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা নিয়ে সারারাত চালিয়ে ভোরের দিকে রকি বীচে পৌঁছল ওরা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে কিশোরদের বাড়ির গেস্টরুমে নিয়ে গিয়ে তুলল বুড়োকে। তারপর চাচীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানাল সমস্ত ঘটনা। শুনে ওই বিপদের মধ্যে ঢোকার জন্যে কিশোরকে বকাবকি করলেন চাচী। তারপর গিয়ে মিস কোয়াডরুপলকে ডেকে তুললেন। দু'জনেই আন্তরিক ভাবে আহত মানুষটার সেবায় লেগে গেলেন।

'দেখে তো মনে হচ্ছে বহুকাল দানাপানি পেটে পড়েনি আপনার,' হ্যারিসনকে মিস কোয়াডরুপল বলল। 'বেঁচে ছিলেন কি করে এতদিন?' মিস কোয়াডরুপলের জিভটা কর্কশ হলেও অন্তরটা নরম। 'এখন যে কাজটা সবচেয়ে বেশি দরকার আপনার, তা হলো পেট ভরে খাওয়া।'

'চলো, এই সুযোগে আমরাও কাজগুলো সেরে ফেলি,' দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'প্রথমেই যার যার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও, লাকি লোডে যাচ্ছি আমরা।'

নিচে নেমে এল সবাই। রান্নাঘরে খাবার তৈরি করতে মিস কোয়াডরুপলকে সাহায্য করছেন মেরিচাচী। লাকি লোডে যাওয়ার কথা শুনে বললেন, 'বুনো পশ্চিমের আধুনিক ডাকাতদের পেছনে লাগতে যাচ্ছিস। দুঃখ আছে তোদের কপালে।'

চুপ করে রইল কিশোর। বেশি কথা না বলাই ভাল। কোন্‌টা থেকে কি ধরে বসবে চাচী, শেষে সাফ মানা করে দেবে—না, যাওয়া চলবে না।

এয়ারপোর্টে ফোন করে প্লেনের খবর নিল সে। দুই সহকারীকে জানাল, 'গোসল করা, এয়ারপোর্টে যাওয়া এবং টিকেট কাটার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে।'

'ক্যাম্পিঙের জন্যে জিনিসপত্র যে ভাবে বাঁধাছাঁদা করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো তো আর বদলাতে হবে না, কি বলো?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ওগুলো নিয়েই চলে যাই?'

তৈরি হতে সময় নষ্ট করল না ওরা। শীঘ্রি রওনা হয়ে পড়ল এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে। প্লেন ছাড়ার দশ মিনিট আগে ট্যাক্সি থামল টার্মিনালের বাইরে। টিকেট কাটল কিশোর। মালপত্র বুক করল লাকি লোডের সবচেয়ে কাছের এয়ারপোর্ট কোল্ড স্প্রিঙের ঠিকানায়। মুসা সাহায্য করল তাকে। রবিনও বসে

থাকল না। ওমরকে একটা টেলিগ্রাম করে দিল।

প্লেনে উঠে সীটে গা এলিয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'যাক, প্লেনটা ধরতে পারলাম শেষ পর্যন্ত।'

'কিন্তু এই শান্তিই শেষ শান্তি নয়। শিকাগো আর বুট-এ গিয়ে আবার বদল করতে হবে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

প্লেন আকাশে উঠতেই গরম গরম নাস্তা এল। খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিল ওরা। জেগে ওঠার পর নকশাটা বের করতে বলল কিশোর। বের করে দিল রবিন।

'ক্রেইমের আশেপাশের এলাকা বেশ ভালমত দেখানো আছে,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'তবে লাকি লোড থেকে সেখানে যেতে হবে কি করে, সেটা বলা হয়নি। অত তাড়াহুড়ায় জিজ্ঞেস করতেও মনে ছিল না।'

'সেটার জন্যে নিশ্চয় ভাবনা নেই,' মুসা বলল। 'লাকি লোডের মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।'

নকশাটা রবিনের কাছে আবার রাখতে দিল কিশোর। মানিব্যাগে রেখে দিল রবিন। পাইলট ঘোষণা করল শিকাগোর ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে। প্লেন থেকে নেমে এসে এয়ারলাইনের টিকেট কাউন্টারে যোগাযোগ করল ওরা। ক্লার্ক জানাল, যে প্লেনটা ধরতে চায় ওরা, তিন ঘণ্টা পরে ছাড়বে।

এই সময় পেছন থেকে শান্ত একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'তোমরা কি তিন গোয়েন্দা?'

ঘুরে দাঁড়াল তিনজনেই। বাদামী সুট পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিশোর জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমরা তিন গোয়েন্দা।'

'আমার নাম আরলিংস,' লোকটা জানাল। 'ওমরের কাছ থেকে আসা জরুরী মেসেজ আছে তোমাদের জন্যে। টেলিগ্রাম। দুঃখের বিষয়, অফিস থেকে ওটা নিয়ে আসার সময় পাইনি। তোমরা যদি আমার সঙ্গে আসো, দিয়ে দিতে পারি।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। আরলিংস নামে কারও কথা কখনও ওমরের মুখে শোনেনি। ওরা সন্দেহ করছে বুঝতে পেরে হাসল লোকটা। বলল, 'সাবধান হওয়া ভাল। তোমাদের সতর্কতা দেখে খুশি হলাম। কিন্তু করার কিছু নেই। আজ সকালে এসেছে ওমরের টেলিগ্রাম, আমার অফিসের ঠিকানায়। অফিস থেকে মোবাইল ফোনে আমার এক কর্মচারী আমাকে খবরটা জানিয়ে বলেছে, এই প্লেনে তোমরা আসছ। অফিসেই যাচ্ছিলাম। ফোন পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা চলে এসেছি এয়ারপোর্টে।'

ওমরের পরিচিত সবাইকেই ওরা চেনে না, চেনার কথাও নয়। লোকটা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। টেলিফোনে হয়তো আরলিংসের কথাও বলেছিলেন পিটার ক্লিনসন, কিন্তু লাইনের গোলমালের জন্যে ওরা শুনতে পায়নি।

'ওমরভাই এখন কোথায় আছে?' পরীক্ষা করার জন্যে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পিটার ক্লিনসনের ওখানে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল আরলিংস। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'শোনো, মেসেজটা নিতে চাইলে এক্ষুণি চলো। আমার জরুরী

কাজ আছে। যাওয়া না যাওয়া তোমাদের ইচ্ছে।'

লোকটা সত্যি কথা বলছে কিনা, তার সঙ্গে যাওয়া ছাড়া বোঝার আর কোন উপায় নেই।

'বেশ,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, 'চলুন, যাই।'

'আমার শোফার আর গাড়ি বাইরেই আছে,' বলে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল আরলিংস।

তার পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট কালো স্যালুন গাড়ি। পেছনের দরজা খুলে দিল শোফার। কিশোর আর রবিন উঠে বসল। মুসাকে সামনে উঠতে বলল আরলিংস। ওকে মাঝখানে রেখে অন্য পাশে উঠে বসল সে।

অবাক লাগল কিশোরের। পেছনে জায়গা থাকতে মুসাকে সামনে উঠতে বলল কেন?

জবাব পেয়ে গেল শীঘ্রি।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল শোফার। হঠাৎ দু'জন বিশালদেহী, গুণ্ডা চেহারার লোক এসে গাড়ির পেছনের দুটো দরজা খুলে দু'পাশে উঠে বসল।

তিন গোয়েন্দার কারোরই বুঝতে বাকি রইল না ধাপ্পা দেয়া হয়েছে ওদের। মুহূর্তে সামনে ঝুঁকে ইগনিশনে মোচড় দিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিতে চাইল মুসা। কিন্তু শোফার আর আরলিংস মিলে ধাক্কা মেরে তাকে সীটের ওপর ফেলে দিল।

'খবরদার!' ধমকে উঠল পেছনের একটা গুণ্ডা। 'কিচ্ছু করবে না! একদম চুপ! নইলে খুলি ফুটো করে দেব!'

পাঁচ

এত সহজে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন কিশোরের।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল সে।

ঘুরে তাকাল আরলিংস। 'গেলেই দেখবে,' খুশি খুশি কণ্ঠস্বর তার। 'মেসেজটার কথা মিথ্যে বলিনি আমি। তবে ওটা তোমাদের জন্যে ছিল না, এসেছে আমাদের জন্যে।'

'কার কাছ থেকে?'

'সেটা জানার প্রয়োজন নেই তোমাদের।' দুই গুণ্ডাকে হুকুম দিল সে, 'টনি, মারফি; যদি দেখো, এই দু'জন কিছু করতে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ঠেকাবে। কি ভাবে ঠেকাবে, সেটা তোমরা বুঝবে। সামনেরটাকে আমি সামলাব।'

সুটের পকেট থেকে ছোট একটা কালো ব্ল্যাকজ্যাক বের করল দেখাল মারফি। কিশোর আর রবিন চালাকির চেষ্টা করলে কি করবে, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।

যানবাহনের মাঝখান দিয়ে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। অনেকক্ষণ চলার পর চওড়া একটা রাস্তায় ঢুকল। দুই ধারে প্রচুর গাছপালা, ঝোপঝাড়। কিছুদূর এগোনোর পর গতি কমিয়ে, মোড় নিয়ে সরু একটা গলিতে নামল। পথের মাথায় এসে একটা পুরানো বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। বাড়ির পেছনে নিয়ে গিয়ে গাড়ি রাখল ড্রাইভার। পিস্তলের মুখে তিন গোয়েন্দাকে বের করে এনে বাড়িতে ঢোকানো হলো। নিয়ে আসা হলো ওপরতলার একটা হলওয়েতে। একপাশে লোহার রেলিঙ।

'যাও, ঢোকো!' ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির মাথার একটা ঘরে কিশোরকে ঢুকিয়ে দিল মারফি। মুসা আর রবিনকেও একই ঘরে ঢোকানো হলো। ঘরে একটামাত্র জানালা। পর্দা টানা।

'এ সব কি হচ্ছে?' জিজ্ঞেস না করে আর পারল না কিশোর।

ধমকে উঠল আরলিংস, 'পকেটে যা আছে বের করো!'

ওদেরকে ইতস্তত করতে দেখে হাতের মুঠো খুলে ব্ল্যাকজ্যাকটা দেখাল মারফি। বাধা দিতে গেলে অহেতুক মার খেতে হবে ভেবে যা করতে বলা হলো করল কিশোর।

মুসা আর রবিনও পকেটে যা ছিল বের করে দিল।

'আপাতত আর এগুলোর কোন প্রয়োজন হবে না তোমাদের,' টেবিলে রাখা টিকেট, চাবি আর টাকা-পয়সা দেখিয়ে বলল আরলিংস।

রবিনের মানিব্যাগ খুলে হ্যারিসনের এঁকে দেয়া নকশাটা পেয়ে গেল সে। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে। 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর, 'আমাদেরকে কি করবেন?'

জ্বলে উঠল আরলিংসের চোখ। 'নকশাটার কথা তাহলে বলবে না! দেখা যাক, কতক্ষণ না বলে পারো।' নকশাটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল সে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি, এটা দেখলে খুশি হবে বস্। এখন বেঁধে ফেলো এগুলোকে।'

দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভারটা। পকেট থেকে মোটা নাইলনের দড়ি বের করল। বোঝা যাচ্ছে তৈরি হয়েই এসেছিল। বেঁধে ফেলা হলো তিন গোয়েন্দাকে। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে গোড়ালিও বেঁধে দিল।

'আমি শহরতলিতে যাচ্ছি,' সহকারীদের বলল আরলিংস। 'ডোনার, গাড়িতে গিয়ে বসো।' শোফার বেরিয়ে গেলে টনি আর মারফিকে বলল, 'পরে তোমাদের একজনকে দরকার হবে আমার।'

'আমাকে নেবেন?' অনুরোধের সুরে জিজ্ঞেস করল টনি।

'তা নেয়া যায়।' ঘড়ি দেখল আরলিংস। 'এখন থেকে ঠিক তেইশ মিনিট পর একটা ট্যাক্সি আসবে তোমাকে তুলে নেয়ার জন্যে। রেডি থেকো।'

দরজার দিকে পা বাড়াল আরলিংস। রাগত স্বরে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাদের?'

'যতক্ষণ তোমাদের বন্ধু ওমর তার কেসের তদন্ত বন্ধ না করে,' জবাব দিল আরলিংস।

খানিক পর একটা গাড়িকে স্টার্ট নিয়ে চলে যেতে শোনা গেল। টনিকে বলল মারফি, 'নিচে চলো। লাঞ্চ সেরে ফেলিগে।'

'ছেলেগুলোকে ফেলে যাব?' যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না টনি। 'যদি পালায়?'

আড়চোখে ওঅরড্রোবটার দিকে তাকাল মারফি। পুরানো ধরনের একটা কাঠের খিল লাগানো আছে তাতে।

'এগুলোকে ওর মধ্যে তালা দিয়ে রাখলে কেমন হয়?' ভুরু নাচিয়ে মিটিমিটি হাসল সে। 'দরজা ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করলে শব্দ হবেই। দৌড়ে আসব তখন আমরা।'

'মন্দ হয় না,' বুদ্ধিটা ভালই মনে হলো টনির কাছেও। 'হলঘরের দরজাটাও আটকে দিয়ে যাব আমরা।'

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বিশাল ওঅরড্রোবটায় ভরা হলো তিন গোয়েন্দাকে। ওজন তো আর কম না তিনজনের, টানা-হেঁচড়া করে হাঁপিয়ে গেল দুই গুণ্ডা। খিল লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওরা ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় লেগে গেল তিন গোয়েন্দা। রবিনের কাছাকাছি রয়েছে মুসা। পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসল দু'জনে। রবিনের হাতের বাঁধন খোলায় মনোযোগ দিল মুসা। কব্জি বাঁধা রয়েছে তার, আঙুল নয়।

'গাধারাও আমাদের বোকামির কথা শুনলে হাসবে,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'কি ভাবে বোকার মত ওদের কথা বিশ্বাস করে চলে এলাম। অথচ ওমরভাই আগেই সাবধান করেছিল আমাদের, সে যে দলটাকে ধরতে চাইছে ওরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল, 'ওরা জানল কি ভাবে পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা?' ঢিল হয়ে আসতে লাগল তার বাঁধন। খুলে ফেলল আস্তে আস্তে। তখন মুসার বাঁধন খুলতে শুরু করল সে।

হাতের বাঁধন খোলা হয়ে গেছে। পায়ের বাঁধন খোলা তখন কিছুই না। নিজেরটা খুলে কিশোরেরটা খুলতে শুরু করল রবিন।

'কি করে জানল, পরে বোঝা যাবে,' কিশোর বলল। 'এখন এখান থেকে বেরোনোর চিন্তা করাটাই জরুরী।'

ওঅরড্রোবের মধ্যে হাতড়ানো শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে মুসা। হুকে ঝোলানো অবস্থায় একটা কোটের হ্যাঙ্গার পাওয়া গেল। স্টেনলেস স্টীলের তৈরি। 'এটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বলল সে। 'খিলের কাছে দরজার ফাঁকটা যথেষ্ট বড়। দেখি তো ঢোকানো যায় কিনা?...বাহ্, ঢুকে তো গেল! দারুণ!'

হ্যাঙ্গার দিয়ে ঠেলে খিলটাকে ওপরে তুলে দিল মুসা। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল তিনজনে। ওদের জিনিসগুলো টেবিলেই পড়ে আছে। টিকেট, টাকা, মানিব্যাগ। সব নিয়ে আবার পকেটে ভরল।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ওঅরড্রোব খোলাটা যত সহজ হয়েছে, ঘরের দরজা খোলা ততটা হবে না।'

পা টিপে টিপে একমাত্র জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। নিচে নোংরা একটা আঙিনা চোখে পড়ল।

'লাফিয়ে নামলে হাত-পা ভাঙতে হবে,' বলল সে। 'লোকগুলো এলে ওদের কাবু করেই বেরোতে হবে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার দু'পাশে সরে গেল ওরা—রবিন আর কিশোর একপাশে, মুসা অন্যপাশে।

দরজায় চাবি ঘোরার শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। ঘরে ঢুকল দুই গুণ্ডা। ওরা কল্পনাই করেনি, মুক্ত হয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন বন্দীরা। নিতান্ত অসতর্ক অবস্থায় ওদের ওপর হামলা চালাল তিন গোয়েন্দা। মাথা নিচু করে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেল মুসা। তার ভয়ানক শক্ত খুলির গুঁতো খেয়ে হুঁক করে উঠল মারফি। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল দেহটা। ঝট করে শরীর সোজা করল মুসা। ইচ্ছে করে মাথাটা লাগিয়ে দিল মারফির থুঁতনিতে। প্রচণ্ড ব্যথায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল মারফি। পর পর দুটো ভয়াবহ আঘাত সহ্য করতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

টনি তখন রবিন আর কিশোরকে সামলাতে ব্যস্ত। তার হাত ধরে এমন করে ঝুলে পড়ল রবিন, কোনমতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল বের করতে দিল না। এই সুযোগে সমানে পিটিয়ে চলল তাকে কিশোর। শেষমেষ কারাতের এক রদ্দা খেয়ে টনিও বেহুঁশ হলো।

'বেরোও! এক মুহূর্ত দেরি না আর!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

দৌড়ে নেমে এল ওরা সিঁড়ি বেয়ে। সামনের দরজা খুলে ছুটে বেরোল বাইরে। রাস্তায় বেরিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

'একেই বলে কপাল!' হাসিমুখে বলল রবিন। 'একেবারে সময়মত হাজির।'

ড্রাইভারের লম্বা মুখ, বাজপাখির মত বাঁকানো নাক। ওদের দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে তাড়াহুড়া করে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

'ও'হেয়ার এয়ারপোর্ট,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'যত জোরে পারেন চালান।'

ওদের তাড়াহুড়াটা বুঝল বোধহয় ড্রাইভার। গিয়ার দিয়েই একটানে সরে গেল মোড়ের কাছ থেকে। পেছনে বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। গলির মুখে এসে বড় রাস্তায় যখন উঠছে গাড়ি, এ সময় টনিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল।

'খেপা কুত্তা হয়ে গেছে নিশ্চয়!' ড্রাইভারের কান এড়িয়ে নিচু স্বরে বলল মুসা।

'এই যে, ভাই,' ড্রাইভারকে তাগাদা দিল কিশোর, 'আরেকটু জোরে চালান না। প্লেন ধরতে হবে আমাদের।'

আয়নায় ওর চেহারাটা দেখল ড্রাইভার। 'ঠিক আছে, শর্টকাটে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি হবে।'

পরের মোড়টায় এসে ডান দিকে ঘুরল সে। পর পর কয়েকবার এ গলি ও গলি করে শেষে আরেকটা চওড়া রাস্তায় উঠল। আবার মোড় নিল ডানে।

অবাক লাগল গোয়েন্দাদের। রাস্তাটা চেনা চেনা লাগল। মনে হলো যেদিক থেকে গিয়েছিল ওরা সেদিকেই ফিরে এসেছে। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, খপ্ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর।

ড্রাইভারের আইডেন্টিফিকেশন কার্ডটার দিকে ইঙ্গিত করল। কার্ডটায় দেখা যাচ্ছে গোলগাল চেহারার একজন মানুষের মুখ, বোতামের মত ছোট্ট নাক, মোটেও বাজপাখি-নাকওয়ালা ড্রাইভারের মত নয়।

মুসার আগে রবিন বুঝল ব্যাপারটা। ঢোক গিলল সে। এ গাড়ির আসল ড্রাইভার নয় লোকটা, আরলিংসের সহকারী। টনি আর মারফির হাত থেকে পালিয়ে এসে ওই দলেরই আরেক লোকের খপ্পরে পড়েছে ওরা।

ছয়

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। নির্বাক। কেন ওদের দেখে অবাক হয়েছিল ড্রাইভার, এখন বোঝা যাচ্ছে। সে নিশ্চয় অনুমান করে ফেলেছিল, টনি আর মারফির হাত থেকে পালিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু আশেপাশে বাড়িঘর আর রাস্তার লোকের সামনে ওদের কিছু করার সাহস পায়নি।

এমন হতে পারে—কিশোর ভাবল, ওদেরকে নিয়ে কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না লোকটা, তাই অকারণে ঘুরেফিরে সময় নিয়েছে ভাবার জন্যে। টনিকে বোধহয় সে-ও দেখতে পেয়েছে, তাই আবার পুরানো বাড়িটাতেই ফিরে যাচ্ছে সাহায্যের জন্যে

মুসা ভাবছে—দেব নাকি ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে থামিয়ে? নাহ্, অ্যাক্সিডেন্ট করে বসলে বিপদ আরও বাড়বে।

প্লেনের টিকেটের খামটার ওপর দ্রুত লিখে ফেলল কিশোর: প্রথম লাল বাতিটার সামনে থামার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়বে।

লেখাটা দেখাল দুই সহকারীকে।

আস্তে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

দুই ব্লক পরেই সামনে দেখা গেল ট্র্যাফিক সিগন্যাল। হলুদ বাতিটা জ্বলে উঠেছে। গতি বাড়িয়ে দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ড্রাইভার। কিন্তু বাঁ দিক থেকে আসা গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে ততক্ষণে। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সে। একটা সেকেন্ডও দেরি করল না কিশোর। পাশের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। মুসাও একই কাজ করল। কিশোরের পাশেরটা দিয়ে নেমে পড়ল রবিনও।

'অ্যাই, কি করছ! কি করছ!' চিৎকার করে বলল ড্রাইভার। 'জলদি গাড়িতে ওঠো!'

কিন্তু কে শোনে ওর কথা। রাস্তা পেরিয়ে ছুটল ওরা। দৌড় দিল মোড়ের দিকে। মোড়ের কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল। জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছে ড্রাইভার। বোঝা গেল না দূর থেকে। সবুজ বাতি জ্বলল। চলমান গাড়িগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও এগিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

'গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে,' কিশোর বলল। 'তার আগেই কেটে পড়া দরকার।'

'ওই যে আসছে আরেকটা ট্যাক্সি!' বলেই লাফ দিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল রবিন। দুই হাত তুলে রীতিমত নাচতে শুরু করল থামানোর জন্যে।

উঠেই বলল কিশোর, 'ও'হেয়ার এয়ারপোর্ট! জলদি করুন!' অবাক হয়ে ভাবল, এটাও আরলিংসের দলের না তো?

ছুটতে শুরু করল ট্যাক্সি। পেছনে তাকাল কিশোর। না, আর কোন গাড়ি ওদেরকে ফলো করছে বলে মনে হলো না।

'হাউফ!' করে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। কিশোরকে বলল, 'ভাগ্যিস আইডেন্টিফিকেশন ফটোটার ওপর চোখ পড়েছিল তোমার!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'শিওর, ব্যাটা চুরি করে এনেছে গাড়িটা। আইডেন্টিটিটাও জোগাড় করে নিয়েছে কোন ভাবে। সেটা অবশ্যই আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে নয়,' ফিসফিস করে কথা বলছে কিশোর, ড্রাইভার যাতে শুনতে না পায়। 'আমার ধারণা, ব্যাটা গাড়িটা চুরি করেছে অন্য কোন অকাজ করার জন্যে।'

'ঠিক,' একমত হলো রবিন। 'সে-জন্যেই ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় তেইশ মিনিট পর গাড়ি পাঠাবে বলেছিল আরলিংস। নিশ্চয় ওটা সেই গাড়ি। নইলে ওই চিপার মধ্যে গলিতে ট্যাক্সি ঢুকবে কি করতে? আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না ভাগ্য এত ভাল হলো কি করে আমাদের!...তা ডাকাতি-ফাকাতি করার প্ল্যান করেছে নাকি?'

প্লেন ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে হুড়মুড় করে টার্মিনালে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। প্লেনে ওঠার আগে শিকাগো পুলিশের ক্যাপ্টেন রুজলেনকে ফোন করল কিশোর। ওদের পালানোর ঘটনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে বলল চোরাই ট্যাক্সি নিয়ে সম্ভবত ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে একদল ডাকাত।

আরও জানাল, 'আসল ড্রাইভারের আইডেন্টিফিকেশন কার্ডে তার নাম লেখা রয়েছে হার্ভার্ট জাওয়ারদি।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'ট্যাক্সি কোম্পানির কাছ থেকে লাইসেন্স নম্বরটাও বের করে নিতে পারব আমরা। খবরটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

টেলিফোন বুদের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর রবিন। অস্থির ভঙ্গিতে কাঁচে টোকা দিয়ে ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করল রবিন। বোঝাল, সময় নেই। রিসিভার রেখে বেরিয়ে এল কিশোর। লোডিং গেটের দিকে দৌড় দিল তিনজনে।

'আরেকটু হলে তোমাদের রেখেই চলে যাচ্ছিলাম আমরা,' প্লেনে ওঠার পর ওদের স্বাগত জানিয়ে স্টুয়ার্ডেস বলল। জবাবে তার দিকে তাকিয়ে হাসল তিন গোয়েন্দা। যার যার সীটে বসে পড়ল।

'বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল, 'আমাদের লাকি লোডে যাওয়ার খবর আরলিংস জানল কি ভাবে?'

'দলের ওখানকার লোকেরা জানিয়েছে নিশ্চয়,' রবিন বলল। 'এ জন্যেই ওমরভাই যে পিটার ক্লিনসনের ওখানে আছে, সেটাও জানে আরলিংস।'

'তা-ই হবে,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'নকশাটার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন ওদের? হ্যারি হ্যারিসনের ক্লেইম আর ডাকাতদলের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে নাকি?'

'আমারও প্রশ্ন আছে,' রবিন বলল। 'ওমরভাই একবারও ফোন করল না কেন আমাদের? বার বার অন্যকে দিয়ে করানো…কোন বিপদ হয়নি তো? নাকি পিটার ক্লিনসনের নামে অন্য কেউ করেছে?'

'করতেও পারে,' মাথা দোলাল কিশোর, 'অসম্ভব না।'

প্লেনে লাঞ্চ সরবরাহ করা হলো। খাওয়ার পর ঢুলতে আরম্ভ করল তিনজনেই।

বুটে-তে নেমে খুব সাবধানে রইল ওরা। আগের স্টপেজের মত কোন বিপদে পড়তে রাজি নয় আর। যাত্রীদের কাছাকাছি থাকল সর্বক্ষণ। তবে এখানে কেউ আর ওদের বিরক্ত করল না। কিছুক্ষণ পর দুই ইঞ্জিনের একটা বিমানে করে লাকি লোডের ছোট্ট এয়ারপোর্ট কোল্ড স্প্রিঙের উদ্দেশে রওনা হলো।

নিচে রকি পর্বতের শৈলশিরার ওপর জমাট বাঁধা বরফ।

গন্তব্যে পৌঁছে যে রানওয়েটাতে নামল প্লেন, সেটাও বরফে ঢাকা। দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই চামড়ায় এসে তীক্ষ্ণ কামড় বসাল ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'একেবারে ভিন্ন জগতে এসে ঢুকলাম দেখি!'

ছোট্ট টার্মিনাল আর হ্যাঙ্গার ঘিরে মাঠগুলো এখন ধু-ধু বরফের রাজ্য। চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে পাইনের বন। নিষ্প্রাণ, নিরানন্দ। একনাগাড়ে বয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো বাতাস। মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে একটা হেলিকপ্টার, আর এক ইঞ্জিনের একটা খুদে বিমান। পশ্চিমে মাথা তুলে আছে বিটাররুট পর্বতমালা।

'বাপরে!' কেঁপে উঠল রবিন, 'কি ভয়ানক নিঃসঙ্গ! লোকগুলো থাকে কি করে এখানে?'

'মেরু অঞ্চলের চেয়ে তো ভাল,' কিশোর বলল। 'সেখানেও তো লোক থাকে।'

টার্মিনালের দিকে হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ম্যাকিনটশ পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। হ্যাট পরেননি। লম্বা, সুদর্শন, বিশালদেহী একজন মানুষ। টকটকে লাল মুখ। বাতাসে উড়ছে সাদা চুল। কাছে এসে বাজখাঁই কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিশোর, রবিন, মুসা?' জবাবের অপেক্ষা না করেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমি অ্যান্ডি টাওয়ার,' আন্তরিক ভঙ্গিতে ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি। 'ওমর শরীফ আমার কাজই করছে এখানে। আমি তোমাদের নিতে এসেছি।'

'ওমরভাই এলেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছে,' টাওয়ার জানালেন। 'গোটা দুই পাঁজরের হাড় ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে। মারাত্মক কিছু নয়। ডাক্তার টেপ আটকে দিয়েছে। বলেছে সেরে যাবে।'

কিশোরের চোখে সন্দেহ ফুটে উঠতে দেখে পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করলেন টাওয়ার। একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ওকিমুরো কর্পোরেশনের সামনে ওমরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তোলা তিন গোয়েন্দার ছবি। 'তোমরা সন্দেহ করতে পারো ভেবে আমার কাছে দিয়ে দিয়েছে ওমর।'

এর কোন বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে শিকাগোতে একবার ঠকে আসার পর আর কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় কিশোর। ওমরের কাছ থেকে ছবিটা কেড়েও আনা হতে পারে। ওমর সত্যি অসুস্থ, না ডাকাতদের হাতে বন্দী, সেটা বোঝার একটাই উপায় এখন–টাওয়ারের সঙ্গে চলে যাওয়া।

তার সন্দেহের কথাটা টাওয়ারকে বুঝতে দিল না কিশোর। বলল, 'সতর্ক থাকতেই হয় আমাদের। কিছু মনে করবেন না। চলুন।'

হাসলেন টাওয়ার। 'না না, বুঝতে পেরেছি। আমি কিছু মনে করিনি। টার্মিনালে কিছু জিনিসপত্র আছে আমার, ওগুলো নিয়ে আসি। তোমরা গিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠো।'

মাঠের ওপর দিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। হেলিকপ্টার থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ওরা তখনও, হঠাৎ লম্বা, হালকা-পাতলা একজন মানুষ লাফ দিয়ে হেলিকপ্টার থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে চলে গেল উল্টো দিকে।

'কে লোকটা?' মুসার প্রশ্ন।

'এয়ারপোর্টের লোকই হবে হয়তো,' জবাব দিল রবিন।

'তাহলে বনের দিকে গেল কেন?'

সন্দেহ কিশোরেরও হয়েছে। হেলিকপ্টারের কাছে এসে বলল, 'ভেতরে কি করছিল লোকটা, জানতে পারলে ভাল হত।'

দরজা খুলে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিল মুসা।

ভেতরে ঢুকে ভালমত খুঁজল। কিছুই ঘটল না দেখে বলল কিশোর, 'বাঁচা গেল। আমি তো ভেবেছি বোমা পেতে রেখেছে। আমাদের মালপত্রগুলো তুলে ফেলা যাক।'

কিন্তু খুঁতখুঁতিটা গেল না তার। ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের হ্যাচ খুলতে যাবে মুসা, বাধা দিল কিশোর। 'দাঁড়াও, দেখে নিই। এটাতেও কিছু রেখে যেতে পারে।'

ব্যাগ থেকে দড়ির বান্ডিল বের করে এক মাথা হ্যাচের হ্যান্ডেলে বাঁধল সে। রবিন আর মুসাকে সরে যেতে বলে দড়ির অন্য মাথাটা ধরে হাঁটতে শুরু করল। হেলিকপ্টার থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে টান মারল দড়িতে।

সাত

বুম্ করে বিকট শব্দ। কেঁপে উঠল কপ্টারটা। বারুদের ঝাঁজাল গন্ধ এসে নাকে লাগল।

'খাইছে!' জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে মুসা।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে তিনজনেরই। গায়ের কাঁপুনি যাচ্ছে না। মাল রাখার খুপরিটা পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেল ওরা। নল কেটে ফেলা একটা শটগান এমন কায়দায় বসানো রয়েছে ভেতরে, ট্রিগারে তার বেঁধে দেয়া হয়েছে, হ্যাচ খুললেই টান পড়বে ট্রিগারে, গুলি বর্ষণ করবে। করেছেও তাই। শক্তিশালী কার্তুজ ভরা ছিল ওটাতে।

গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে এলেন অ্যান্ডি টাওয়ার। সঙ্গে এল টারমিনালের এক কর্মচারী। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন টাওয়ার, 'কি ব্যাপার?'

খুলে বলল কিশোর। টাওয়ার আর সঙ্গের লোকটি গিয়ে খুপরিটা ভালমত দেখল। শটগানটায় আঙুল না ছোঁয়াতে অনুরোধ করল কিশোর। অপরাধীর আঙুলের ছাপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে। জানা গেল, টাওয়ারের সঙ্গের লোকটি এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। পুলিশকে খবর দিতে গেলেন তিনি।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিট বের করল কিশোর। শটগানে পাউডার ছড়িয়ে আঙুলের ছাপ নিতে তাকে সহায়তা করল মুসা আর রবিন। কোন ছাপ পাওয়া গেল না।

'হাতে দস্তানা ছিল লোকটার,' দৌড়ে পালানো লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। 'ছাপ পাইনি বটে, কিন্তু কিছু না কিছু তো পাবই। যে কোন সূত্র!'

শীঘ্রি দু'জন পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলো। কি ঘটেছে জানানো হলো ওদের। আঙুলের ছাপ খুঁজে যে ব্যর্থ হয়েছে, সে-কথাও বলল কিশোর। তারপর তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দেখাল।

'তারমানে তোমরা শখের গোয়েন্দা?' জিজ্ঞেস করল একজন অফিসার।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমাদের টীমের আরও একজন এসেছে তদন্ত করতে, ওমর শরীফ। লাকি লোডে আছে এখন।'

'মিস্টার ওমর,' মাথা ঝাঁকাল অফিসার,'দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। ডাকাতির কেসের তদন্ত করছেন। তাকে সাহায্য করতেই এসেছ, তাই না? ওয়েল, গুড লাক।'

শটগানটা পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিল কিশোর। তিন গোয়েন্দার সহায়তায় পুরো কপ্টারটা তন্নতন্ন করে খুঁজল অফিসাররা। সামান্যতম সূত্রও পাওয়া গেল না। তাদের জিনিসপত্র কপ্টারে তুলে নিল তখন তিন গোয়েন্দা।

ককপিটে গিয়ে বসলেন টাওয়ার। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'বন্দুকটা সম্ভবত আমার জন্যেই পেতে রাখা হয়েছিল।'

'আমাদের জন্যেও হতে পারে,' কিশোর বলল।

আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। নাক ঘুরিয়ে রওনা হলো বিটাররুট পর্বতমালার দিকে। শিকাগোতে ওদেরকে কিভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, টাওয়ারকে জানাল কিশোর।

নিজের কথা বললেন এরপর টাওয়ার। 'দশ বছর ধরে আমি একটা আর্মার্ড-কার সার্ভিস চালাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমার একটা ট্রাক হাইজ্যাক হয়ে গেছে। তাতে টাকার চালান ছিল। গাড়িতে যে দু'জন গার্ড ছিল, দু'জনকেই গুলি করে মেরে ফেলেছে। টাকাগুলোর বীমা করানো ছিল, কাজেই গচ্চা আমার যায়নি। কিন্তু হাইজ্যাকারগুলোকে ধরতে চাই আমি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অকাজ আর করতে না পারে। তা ছাড়া আমার কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাটাও জরুরী ছিল। ওমর শরীফের খোঁজ দিয়েছে আমার বন্ধু পিটার। ওমরের ওপর তার বিরাট আস্থা। সে-জন্যেই তাকে ডেকে এনে তদন্তের অনুরোধ করেছিলাম। পুলিশও কাজ করছে এ কেসে। তাদের সঙ্গে মিলে টাকাগুলো উদ্ধার করে ফেলেছে ওমর, দু'জন ডাকাতকেও ধরেছে, কিন্তু বাকি সব পালিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের এখানে ওখানে। খবর পাওয়া গেছে, দু'একজনকে নাকি ক্যানাডাতেও দেখা গেছে।'

'ওমরভাই তাহলে আর এখানে বসে আছে কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কারণ, তার ধারণা ডাকাত-সর্দার উলফ ক্রুপার এখনও লাকি লোডের আশেপাশেই লুকিয়ে আছে। তাকে না ধরে কোনমতেই যাবে না সে।'

'ওমরভাই জখম হলো কি করে?' জানতে চাইল মুসা।

'কাল বিকেলে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল,' টাওয়ার বললেন। 'উলফের লোক বলে সন্দেহ হওয়ায় পাহাড়ের ওপর তাকে তাড়া করেছিল ওমর।'

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'উলফ ক্রুপার ভয়ঙ্কর লোক,' টাওয়ার বললেন। 'তাকে ধরে জেলে ভরা না গেলে স্বস্তি নেই। পুলিশের ধারণা, দলের লোকজন সব অন্য শহরে পাঠিয়ে দিয়ে একা লুকিয়ে রয়েছে লাকি লোডে। কারণ বেশি লোক থাকলেই ধরা পড়ার ভয়।'

'তাই কি? না অন্য কোন কারণ আছে একা থেকে যাওয়ার?' কিশোরের প্রশ্ন।

প্রবল বাতাসে দুলে উঠল কপ্টার। বিশাল কোন অদৃশ্য থাবা যেন টান দিয়ে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। নিচে রুক্ষ বনাঞ্চল। ঘন বনে ছাওয়া উপত্যকাটা পুরোপুরি বরফে ঢাকা। কাটা কিংবা ঝড়ে ভেঙে যাওয়া গাছের গোড়াগুলো জমাট বরফে ঢেকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে বন পাহারা দিচ্ছে নিঃসঙ্গ বিচিত্র প্রহরীর দল।

বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে অবশেষে চিৎকার করে জানালেন টাওয়ার, 'আর বেশি দূরে নেই!'

সামনে, পাহাড়ের চূড়ার নিচে একটা শৈলশিরার দিকে হাত তুললেন টাওয়ার। লাকি লোড নামের ছোট্ট শহরটা রয়েছে ওখানেই। 'এই পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু চূড়ার নাম উইন্ডি পীক,' জানালেন তিনি। 'লাকি লোডের বাঁয়ে।'

ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর, 'ফ্লাইঙের অভিজ্ঞতা মনে হচ্ছে আপনার

বহুদিনের, মিস্টার টাওয়ার?'

'হুঁ!' করে জবাবটা যেন তিনি এড়িয়েই গেলেন মনে হলো।

'আপনি কি এই পশ্চিমেই আছেন জন্ম থেকে?'

এ প্রশ্নটারও জবাব এড়িয়ে গিয়ে টাওয়ার বললেন, 'এসে গেছি!'

হেলিকপ্টার নামাতে শুরু করলেন তিনি।

অবাক লাগল কিশোরের। প্রশ্নটা শুনতে পাননি তিনি? না অতীত নিয়ে কথা বলতে চান না?

আট

লাকি লোডের এক প্রান্তে পরিষ্কার করা এক টুকরো খোলা জায়গায় নিখুঁত দক্ষতায় হেলিকপ্টার নামালেন টাওয়ার। শহরের বাইরে একটা পাহাড়ের গোড়ায় পিটার ক্লিনসনের কেবিন। সেখানে মালপত্র বয়ে নিতে সাহায্য করলেন তিন গোয়েন্দাকে।

দরজায় টোকা দিল কিশোর। খুলে দিলেন লম্বা, রোগা-পাতলা একজন মানুষ। মাথার লাল চুলও পাতলা হয়ে এসেছে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল মুখে।

'এসে গেছ! এসো, এসো, ভেতরে এসো!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'তোমাদের অপেক্ষাই করছিলাম আমি আর ওমর।'

ঘরে ঢুকে গনগনে আগুনের সামনে ওমরকে বসে থাকতে দেখল তিন গোয়েন্দা।

'হালো!' উষ্ণ কণ্ঠে স্বাগত জানাল ওমর। 'চলে তাহলে এলেই। ক্যাম্পিং ট্রিপটা মাঠে মারা গেল তোমাদের। ধন্যবাদ।'

'এতে ধন্যবাদের কি হলো?' আগুনের আলোয় ঝলমল করে উঠল মুসার সাদা দাঁত। 'কেসের তদন্তে আপনাকে সাহায্য করার চেয়ে পিকনিক বড় হলো?'

টাওয়ারের দিকে তাকাল ওমর। 'এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ।'

খাবার আনতে রান্নাঘরে রওনা হলেন পিটার।

টাওয়ার গেলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

কথা বলতে লাগল ওমর আর তিন গোয়েন্দা। রকি বীচ থেকে বেরোনোর পরের সমস্ত ঘটনা ওমরকে জানাল ওরা।

গম্ভীর হয়ে গেল ওমর। বলল, 'শিকাগোয় উলফ ক্রুপারের লোকগুলোকে তোমাদের আসার খবর জানিয়েছে কেউ এখান থেকেই। কে সে?' রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, 'পিটার!'

দরজায় দেখা দিলেন তিনি। ওমর জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে যখন ওদের ফোন করলে, অ্যাগনির স্টোরে তখন কে কে ছিল?'

'সাধারণত যারা থাকে, স্টোভ ঘিরে বসে কথা বলছিল,' পিটার জবাব দিল। 'কানেকশন খারাপ ছিল বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে হয়েছে আমাকে। প্রতিটি কথা শুনেছে সবাই।'

'লাইন ট্যাপ করেও কেউ শুনে থাকতে পারে,' রবিন বলল।

'আরি, পুড়ে যাচ্ছে কি যেন!' চিৎকার করে উঠে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিলেন পিটার।

'খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া কেউ লক্ষ করছে।'

'ওমরভাই,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'উলফ ক্রুপার লাকি লোডেই আছে, এ ব্যাপারে এত শিওর হলেন কি করে?'

'পুলিশ জানিয়েছে,' জবাব দিল ওমর। 'যে দুটো ডাকাতকে ধরেছে, তাদের একজন বলে দিয়েছে উলফ ক্রুপার এ এলাকাতেই আছে এখনও, কি একটা জরুরী কাজ নাকি বাকি আছে তার। ডাকাতটা জানে না, কাজটা কি।'

'আপনি কিছু আঁচ করতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, আমিও পারিনি এখনও। উলফ ক্রুপারের খোঁজে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছিলাম। পিছু নিয়েছিলাম একটা লোকের। লোকটা হুড দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছিল। চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে-কারণেই সন্দেহটা বেশি হয়েছে আরও। পুরানো খনিগুলো যেদিকে আছে, ঘোড়ায় চেপে সেদিকে যাচ্ছিল সে। কিছুদূর এগোনোর পর বুঝলাম, আমার সন্দেহই ঠিক। বনের ভেতর থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে এল আরেক জন লোক। সে-ও বিশালদেহী। নাকে-মুখে এমন করে রুমাল বেঁধে রেখেছিল, তারও চেহারা চেনা যাচ্ছিল না। ধরতে না পারলেও গোপনে পিছু নিয়ে তার আস্তানার খোঁজ জেনে আসতে পারতাম, কিন্তু আমার ঘোড়াটা দিল সব ভজকট করে। ডেকে উঠল হঠাৎ করে। মুহূর্তে দু'জন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে দিল দু'দিকে। উলফ ক্রুপার বলে যাকে সন্দেহ হলো, তার পিছুই নিলাম। কিন্তু আবার গোলমাল করে দিল ঘোড়াটা। অপদার্থ জানোয়ার। পাথরে পা দিয়ে পিছলে পড়ে গেল।' তিক্ত হাসি হাসল ওমর। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'এখন তোমাদের কাজ হলো উলফ ক্রুপারের সেই গোপন আস্তানাটা খুঁজে বের করা। সেটা বের করতে পারলেই জেনে যাবে এখানে তার জরুরী কাজটা কি।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা। নানা রকম প্ল্যান করতে লাগল। খাওয়ার সময়ও আলোচনা বাদ দিল না।

খাবারটা বেশ পছন্দ হলো মুসার। ওয়েস্টার্ন শিক কাবাব, সীম, আর রুটি।

খাওয়ার পর টাওয়ার বললেন, 'যাই। কাজ আছে।'

'আপনার অফিস কি লাকি লোডে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, হেলেনায়। এখানে আছি কেসটার অগ্রগতি দেখার জন্যে। তোমাদের কোন কিছুর দরকার হলে, জানিও কিন্তু আমাকে।'

টাওয়ার চলে গেলে ওমর বলল, 'খুব ভাল লোক। বেশির ভাগ সফল মানুষেরই নিজের সম্পর্কে কিছু উঁচু ধারণা থাকে, কোন কথা বলতে গেলেই

নিজের উপমা টেনে আনে, কিন্তু টাওয়ার সে-রকম নয়। নিজের কথা প্রায় বলেই না। তবে এটুকু বোঝা গেছে, খুব সামান্য থেকে শুরু করেছিল, নিজের যোগ্যতায় আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।'

এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো ধুতে পিটারকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা।

এরপর শোয়ার ব্যবস্থা। বড় ঘরটার লাগোয়া কয়েকটা ছোট ঘর। বাংক আছে। থাকার অসুবিধে নেই। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। প্রচুর ধকল গেছে আগের রাত থেকে।

হঠাৎ চমকে জেগে গেল কিশোর। কেবিনের পেছন থেকে একটা ভারী আওয়াজ আসছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে শব্দটা। রবিন আর মুসারও ঘুম ভেঙে গেছে। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সবাই।

কেবিনের দেয়ালে এসে আছড়ে পড়ল কি যেন। কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ হলো।

পিটারের চিৎকার শুনে দৌড়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আগুন! আগুন!' রান্নাঘরের দিকে দেখালেন তিনি। লাল উজ্জ্বল আভা দেখা যাচ্ছে ওদিকে।

রান্নাঘরে ছুটল তিন গোয়েন্দা। আগুনের আলোয় দেখতে পেল বিরাট একটা পাথর পড়ে আছে রান্নাঘরে। পেছনের দেয়াল ভেঙে ঢুকে, ধাক্কা দিয়ে স্টোভটাকে উল্টে দিয়েছে। আগুন ধরে গেছে স্টোভের পাশে রাখা জ্বালানী কাঠে। কাঠের মেঝে বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনটা।

দৌড়ে লিভিং রুমে এসে কয়েকটা কম্বল তুলে নিয়ে ফিরে গেল ওরা। ছড়িয়ে দিল আগুনের ওপর। বাড়ি মারতে শুরু করল কাঠ দিয়ে। ওমরও উঠে এল বিছানা থেকে। কিন্তু তাকে কিছু করতে দিল না ছেলেরা। রান্নাঘরের পাম্প থেকে এক বালতি পানি ভরে নিয়ে এলেন পিটার। ছড়িয়ে দিতে লাগলেন আগুনের ওপর। ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে অবশেষে কমে এল এক সময় আগুনের তেজ।

'এ অঞ্চলে এ ভাবে পাথর গড়িয়ে পড়াকে বলে টারনেশান!' পিটার বললেন। 'অ্যাভালানশ্ বা ভূমিধসের কাছাকাছি একটা ব্যাপার।' হ্যারিকেন জ্বেলে আনলেন তিনি। ক্ষতি কতটা হয়েছে দেখতে লাগল সবাই।

'ভাল ক্ষতিই তো হয়েছে!' মুসা বলল। 'ছোটখাট একটা ঝড় বয়ে গেছে ঘরটার মধ্যে।'

ক্ষতি কি কি হয়েছে দেখতে লাগলেন পিটার। দেয়ালে মস্ত এক ফোকর হয়ে গেছে। মেঝে পুড়ে গেছে অনেকখানি। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কাল সারাটা দিন যাবে মেরামত করতে।'

গোল পাথরটাকে ঠেলে আবার ফোকর দিয়ে বাইরে বের করে দিতে গেল তিন গোয়েন্দা। এ সময় চোখে পড়ল লেখাটা। পাথরের গায়ে উজ্জ্বল লাল রঙ দিয়ে লেখা হয়েছে:

তিন গোয়েন্দা–শহর ছাড়ো!

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'তারমানে টারনেশন নয়। আপনাআপনি গড়িয়ে পড়েনি ওই পাথর।'

'কে ফেলল?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় উলফ ক্রুপার। ও ছাড়া আর কে বিদেয় করতে চাইবে আমাদের?'

নয়

পাথরের লেখাটা দেখে ওমর বলল, 'খুব সাবধান থাকতে হবে তোমাদের।'

'সে তো বুঝতেই পারছি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

ঠেলতে ঠেলতে পাথরটাকে বাইরে বের করে নিয়ে এল ওরা। পাহাড়ের ওপর দিকে তাকাল কিশোর। পুরো পার্বত্য অঞ্চলটাকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে ডুবে গেছে চাঁদ।

'কেউ ওখানে থাকলেও এখন আর দেখা যাবে না,' বিড়বিড় করে বলল মুসা।

বরফ-শীতল বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওরা। ফোকরটা দিয়ে ঢুকে পড়ল আবার আগুনে পোড়া রান্নাঘরের ভেতর। ততক্ষণে গরম কাপড় পরে ফেলেছেন পিটার। বেরিয়ে গিয়ে ঢুকলেন ঘরের পাশের ছাউনিটাতে। একটা তেরপল নিয়ে ফিরে এলেন। তেরপল লাগিয়ে পেরেক দিয়ে আটকে ফোকরটা বন্ধ করে দিলেন। তাঁকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। স্টোভটা খাড়া করে দিল আগের মত।

'আপাতত চলবে,' পিটার বললেন। 'বাতাস ঢুকতে পারবে না আর।'

ভোরে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়ল তিন গোয়েন্দা। নাস্তা সেরে বাইরে বেরিয়ে এল। উঠতে শুরু করল কেবিনের পেছনের বরফে ঢাকা ঢাল বেয়ে। বরফের গায়ে দাগ দেখে বোঝা গেল পাথরটা কোন দিক দিয়ে নেমেছে। কোনখান থেকে তুলে ঠেলে ফেলা হয়েছে সেই জায়গাটাও পাওয়া গেল। গর্ত হয়ে আছে।

'শাবলের চাড় দিয়ে তুলেছে,' মাটিতে হাঁটু গেড়ে দেখে বলল কিশোর। 'তারমানে যে কাজটা করেছে, তার গায়ে শক্তি আছে।'

'এই যে, লাল রঙ,' মাটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল মুসা।

গর্তটার চারপাশে অনেকখানি জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল ওরা। তুষারে কিছু পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোন সূত্র নেই।

ছাপ ধরে ধরে এগোল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে এল ওপর দিকে। ওপরে ঝোপঝাড়ের ভাঙা ডাল, দলিত ঘাস দেখে কিশোর বলল, 'এখান দিয়েই বেরিয়ে গেছে লোকটা।'

চলার চিহ্ন অনুসরণ করে বনে ঢাকা একটা শৈলশিরায় উঠে এল ওরা। শৈলশিরার সঙ্গে পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে নিচে লাকি লোডের প্রধান রাস্তাটা। হাঁটতে হাঁটতে এসে ছোট্ট জনবসতিতে ঢোকার আরেকটা সরু রাস্তা পাওয়া গেল। এটা দিয়ে মূল রাস্তায় নামা যায়।

'এদিক দিয়ে এসে থাকতে পারে লোকটা,' কিশোর বলল। 'নজর রাখো। সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

খাড়া, সরু রাস্তাটা ধরে ধীরে ধীরে নেমে চলল ওরা।

'একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'শহর থেকে এসেছিল লোকটা। পাহাড় থেকে নয়। কিন্তু উলফ ক্রুপারের তো থাকার কথা পাহাড়ের গুহায়!'

'শহরে গিয়েছিল রঙ আনার জন্যে,' সমাধান করে দিল রবিন। 'দোকানে। পাহাড়ের গুহায় তো আর রঙ নিয়ে বসে থাকে না কেউ।'

একটা জায়গায় এসে আর হদিস রাখা গেল না। অনেক ছাপ ওখানে। লোকের যাতায়াতের। সেগুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আলাদা করা গেল না আর বিশেষ ছাপটাকে।

নামতে নামতে একেবারে নিচে চলে এসেও আর কোন সূত্র পেল না ওরা। উঠতে শুরু করল আবার ওপরে শৈলশিরার দিকে।

খানিক পর এক টুকরো খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার একটা ভাঙা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। পাথরের ফলক দেখে বোঝা গেল এটা কবরস্থান।

ফলকগুলোর মাঝ দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলল ওরা। জায়গাটা বড় নির্জন। সোঁ-সোঁ করে সারাক্ষণই বইছে ঝোড়ো হাওয়ার মত জোরাল বাতাস। নিচের উপত্যকায় লাকি লোড শহরের পুরোটাই চোখে পড়ে এখান থেকে। ওটা নতুন শহর। পুরানো শহরটা শুরু হয়েছে কবরস্থানের ঠিক নিচ থেকে।

'কিশোর, দেখে যাও,' একজোড়া কবরফলকের কাছ থেকে ডাক দিল রবিন।

দৌড়ে গেল কিশোর আর মুসা। কবরফলক দুটোয় লেখা নামগুলো পড়ল কিশোর জোরে জোরে, 'ব্রিড হ্যাংসন! গ্রিড হ্যাংসন!' বিড়বিড় করে বলল সে, 'নিশ্চয় আবার ফিরে এসেছিল লাকি লোড শহরে। হ্যারিসনের মত চিরকালের জন্যে ছেড়ে যেতে পারেনি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন।

'সেই নতুন কাজটা কি?' মুসার প্রশ্ন।

জবাব দিতে পারল না কিশোর বা রবিন।

শহরে যাবে ঠিক করল ওরা। কবরস্থানের গেটের দিকে রওনা হলো। অলঙ্করণ করা পাথরের খুঁটিগুলোকে ঘিরে বড় বড় ঘাস জন্মে আছে। বেরিয়ে চলে গেল মুসা আর রবিন। কিন্তু থেমে গেল কিশোর।

'এই দাঁড়াও তো একটু!' চিৎকার করে উঠল সে। 'কি জঘন্য!'

ফিরে তাকাল অন্য দু'জন। মোটা দস্তানা পরা হাত দিয়ে প্যান্টের নিচের দিকে থাবা মারছে কিশোর। জায়গাটা চোরকাঁটায় ভর্তি। প্যান্টের নিচে লেগে গেছে। হাঁটতে গেলে বিরক্তিকর ভাবে খোঁচা মারতে থাকে চামড়ায়।

মুসা আর রবিনেরও লেগেছে, তবে কিশোরের চেয়ে অনেক কম। চোরকাঁটা যেখানটায় বেশি, সেখানে যায়নি ওরা। কিশোরের দেখাদেখি ঝাড়তে শুরু করল ওরাও।

আবার ঢাল বেয়ে নেমে চলল তিনজনে। ঢালের নিচে দাঁড়িয়ে আছে নির্জন, বিরূপ আবহাওয়ার অত্যাচারে জর্জরিত ধূসর হয়ে আসা পুরানো বাড়িঘরগুলো। জানালা-দরজার খুলে থাকা পাল্লাগুলো একবার খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায়। পুরানো কায়দায় তৈরি কাঠের ফুটপাথ। পায়ের চাপে মড়মড় করতে লাগল।

'লাকি লোডের এই অংশটা রীতিমত ভুতুড়ে,' মন্তব্য করল কিশোর। 'সত্যিকারের গোস্ট টাউন।'

'থামো থামো!' আঁতকে উঠে বলল মুসা। 'আমার মগজে কখন থেকে ঘুরছে এ সব কথা, মুখে আনছি না!'

মুসা ভূতের ভয়ের কথা বললে সাধারণত হাসে রবিন, এখন হাসল না। পরিবেশটা আসলেই ভুতুড়ে, ভূত থাক বা না থাক।

'লোক আছে, ওই দেখো,' হাত তুলে একটা পুরানো বাড়ি দেখাল কিশোর। এমন ভঙ্গিতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে উল্টে গিয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে। পাতলা ধোঁয়া বেরোচ্ছে চিমনি দিয়ে।

আচমকা ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা। একটা রাইফেলের নলের মাথা উঁকি দিল সেখান দিয়ে। গোয়েন্দাদের দিকে তাক করা।

ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। মাটিতে শুয়ে পড়বে না দৌড়ে পালাবে বুঝতে পারল না। তবে কিছু ঘটল না। সাহস করে দরজাটার দিকে এগোতে শুরু করল ওরা।

নলটাও ঘুরতে থাকল ওদেরকে নিশানা করে রেখে। সামনের আঙিনায় এসে দাঁড়াল ওরা। লাথি মেরে দরজা খুলে লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল এক বুড়ো। রাইফেলটা তুলে রেখেছে ওদের দিকে।

'এখানে কি?' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল সাদা-চুল বৃদ্ধ। সন্দেহে ভরা চোখ।

'এই এমনি, ঘুরতে এসেছি,' আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

'লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছি আমরা,' রবিন বলল। 'পিটার ক্লিনসনের ওখানে উঠেছি।'

রাইফেল নামাল বুড়ো। 'অ। পিটারের বন্ধু হলে আমারও বন্ধু। এসো, ভেতরে।'

'অন্য কাউকে আশা করছিলেন নাকি আপনি?' জরাজীর্ণ বাড়িটায় ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানি না!' আবার কর্কশ হয়ে উঠল বুড়োর কণ্ঠ। 'সারাক্ষণ কত আর সাবধান থাকা যায়! নার্ভের ওপর চাপ পড়ছে। ইদানীং অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে সেমিট্রি হিল-এ।'

কিশোর বুঝল, কবরস্থানটার জন্যে পাহাড়টার নামই এখন সেমিট্রি হিল হয়ে গেছে।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সে। সাধারণ একটা ঘর, অতি সাধারণ আসবাবপত্র। লাকড়ির চুলার সাহায্যে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। বুড়ো বলল, 'আমার নাম হগ বাউরি।' চুলা ঘিরে

বসানো চেয়ারগুলো দেখিয়ে বলল, 'আরাম করে বসো। গা গরম করো।'

'অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে বললেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি ঘটনা?'

'ভুতুড়ে কাণ্ড!' বুড়ো বলল। 'গত দুই হপ্তা ধরে শুরু হয়েছে এই উৎপাত।'

'ভুতুড়ে কাণ্ড!' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা। 'কি ভূত?'

'কখনও কখনও রাত দুপুরে নীল আলো জ্বলতে-নিভতে থাকে কবরস্থানের মধ্যে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাতে খাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে খানিক হাঁটাহাঁটি করা আমার নিয়মিত অভ্যেস। তখন দেখেছি।'

'আর কেউ দেখেছে ওই আলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'কি জানি। লাকি লোডে রাতের বেলা কেউ বেরোয় না,' গম্ভীর কণ্ঠে বুড়ো বলল। 'শুধু আলোই না। আলো জ্বলার ঘণ্টাখানেক পর কে যেন হেঁটে যায় এদিক দিয়ে। আমার ধারণা ওটা জেফরির ভূত। লাকি লোডের ড্যান্স হলে পিয়ানো বাজাত সে। আমার বাড়ির পাশের বাড়িটাই ড্যান্স হল। চল্লিশ বছর আগে এক গানফাইটের সময় গুলি খেয়ে মারা যায় সে। সেমিট্রি হিলে কবর দেয়া হয়েছে তাকে।'

নতুন আরেক রহস্য! কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'জেফরির ভূতই ওটা, এ বিশ্বাস কেন জন্মাল আপনার?'

'কারণ রাতের বেলা মাঝে মাঝে পিয়ানোর বাজনা শুনি আমি,' বুড়ো বলল। 'কোন সুর থাকে না। মাঝে মাঝে চাবি মোছার জন্যে চাবিগুলোর ওপর আঙুলগুলো যখন টেনে নিয়ে যেত জেফরি, যে রকম শব্দ হত, এখন বাজে সে-রকম।'

'নীল আলোটা শেষ কবে দেখেছেন?'

'পরশু রাতে।'

'সত্যি সত্যি ভাবছেন ওটা ভূত?'

'কি জানি! মানুষের বদমাশিও হতে পারে,' বুড়ো বলল। 'সে-জন্যেই তো ওটা হাতের কাছে রাখি।' দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা দেখাল সে।

অন্য প্রসঙ্গে গেল কিশোর। 'গ্রিড আর ব্রিড হ্যাংসনদের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?'

'জানি। পঁচিশ বছর আগে ওদের কাছ থেকে প্রচুর সোনা ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উফার গ্রেট নামে ওদেরই এক পার্টনার। তারপর থেকে এতই মনমরা হয়ে গেল ওরা, কাজকর্মে মন বসাতে পারল না আর। সারাক্ষণই মদে চুর হয়ে থাকত। এর পর আর বেশিদিন বাঁচেনি ওরা।'

'গল্পটা বলবেন?' বুড়োকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে দিল না কিশোর।

লোন ট্রী-র সেই একই গল্প শোনাল হগ বাউরিও, হ্যারি হ্যারিসন ওদেরকে যেটা শুনিয়েছে।

'আপনি নিশ্চয় ওদের দেখেছেন?'

'না। আমি এসেছি বছর বিশেক হবে। লোকের মুখে শুনেছি এ সব গল্প।'

'উফার গ্রেটের কি হলো, জানেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেউ জানে না,' হ্যারিসনের মত একই জবাব পাওয়া গেল হগ বাউরির

কাছেও।

'হ্যাংসন ব্রাদার, উফার গ্রেট–এদের দেখেছে, এ রকম কেউ আর আছে এখন লাকি লোডে?'

'না। পুরানো যারা ছিল হয় মরে গেছে, নয়তো শহর ছেড়ে চলে গেছে।'

সোনাগুলো একাই মেরে দেয়নি তো উলফ? দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। প্রশ্নটা ওদের মনেও জাগল কিনা বুঝতে চাইছে।

আর কিছু বলার নেই হগ বাউরির। যাওয়ার জন্যে উঠল কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, হগ, এত সব তথ্য জানানোর জন্যে।'

'যে কোন সময়, যা কিছু জানার দরকার হয়, নির্দ্বিধায় চলে এসো,' দাওয়াত দিয়ে রাখল হগ। 'তবে, গোরস্থানটার কাছ থেকে দূরে থেকো।'

দশ

লাকি লোডের সবচেয়ে জনবহুল অংশের প্রধান রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, নীল আলোটা কোন ধরনের সঙ্কেত হতে পারে।

রবিনও তাতে একমত। 'সেমিট্রি হিলটা শহরের সবখান থেকেই চোখ পড়ে। তা ছাড়া, হগ বলেছে আলোটা দেখা যাচ্ছে দু'সপ্তাহ ধরে। আর উলফ ক্রুপারও আত্মগোপন করেছে দু'সপ্তাহ ধরে। মিলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'পায়ের শব্দ যেটা শুনতে পায় হগ, সেটা উলফের কোন অনুচরের হতে পারে। আলোর সঙ্কেত দিয়ে তাকে ডাকে উলফ। কবরস্থানে দেখা করে দু'জনে। উলফ তার কাছ থেকে খবরাখবর নেয়। হগের বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করে লোকটা।'

'তাহলে নির্জন বাড়িতে পিয়ানো বাজার কি ব্যাখ্যা?' ভূতের ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে রাজি না মুসা।

'হতে পারে হগের কল্পনা,' রবিন বলল।

মেইন রোডের বাণিজ্যিক এলাকাটাতে ঢুকল ওরা। জেনারেল স্টোরের সামনে থামল কিশোর। 'চলো, ঢুকে দেখি লাল রঙের কোন খোঁজ বের করা যায় কিনা।'

ভেতরে রুক্ষ চেহারার একজন লোককে দেখা গেল কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছুরি দিয়ে কেটে বাক্স খুলছে। মালিক কে, জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমিই মালিক,' নীরস কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। 'আমি অ্যাগনি মুরান।'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। স্টোভ ঘিরে বসে আছে কয়েকজন লোক। তাদের সঙ্গে গোয়েন্দাদের পরিচয় করিয়ে দিল অ্যাগনি। কিশোর লক্ষ করল, লাকি লোড শহরের পোস্ট অফিস, টেলিফোন সুইচবোর্ড আর টেলিগ্রাফ অফিস ওই একই দোকানের মধ্যে রয়েছে।

'এ শহরের সব খবরা-খবর আপনার জানা, তাই না মিস্টার মুরান?' হেসে

জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাবে অ্যাগনিও হাসল।

'তারমানে আপনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, এখানে কোন দোকানে লাল রঙ বিক্রি হয়।'

হাসিটা বাড়ল অ্যাগনির। 'দোকান বলতে তো এখানে একটাই আছে, আমারটা। লাল রঙ আছে আমার কাছে। তোমার দরকার?'

'না, আমার দরকার নেই। তবে জানা দরকার, গত এক সপ্তাহের মধ্যে কেউ লাল রঙ কিনেছে কিনা।'

'না, কেনেনি,' ত্বরিৎ জবাব অ্যাগনির। 'কিনলে পরিষ্কার মনে থাকত, কারণ রঙ এখানে তেমন বিক্রি হয় না। কেন?'

আগের রাতে পাথর পড়ে পিটার ক্লিনসনের রান্নাঘর নষ্ট হওয়ার ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। বলার সময় লক্ষ রাখল শ্রোতাদের কারও মুখে অপরাধবোধের চিহ্ন ফোটে কিনা। কারোরই চেহারার পরিবর্তন হতে দেখা গেল না। হগ বাউরির কথা বলল তখন সে। সেমিট্রি হিলে ভুতুড়ে নীল আলো আর পিয়ানোর শব্দ শোনার কথা বলল।

হেসে উঠল অ্যাগনি। 'ওই বুড়োটার কাজই হলো উল্টোপাল্টা দেখা। সব ওর কল্পনা।'

টেনে টেনে হাসল স্টোভের সামনে বসা একজন। 'দিন পনেরো আগে মহাকাশ থেকে নেমে আসা ভিনগ্রহবাসীদের নাকি দেখেছিল ও।'

কোন মন্তব্য করল না তিন গোয়েন্দা। দোকান থেকে বেরিয়ে পিটারের কেবিনে ফিরে চলল। ফিরে এসে দেখল পিটার আর ওমর মিলে রান্নাঘরটা মেরামত করছে।

'আপনাকে না শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে, ওমরভাই?' কিশোর বলল।

'কত আর থাকব। শুয়ে থাকতে থাকতে ভাল লাগছিল না,' অপরাধীর ভঙ্গিতে হেসে জবাব দিল ওমর। 'হাত-পা জমে যাওয়া বন্ধ করার জন্যেও তো নড়ানো দরকার।'

লাঞ্চের জোগাড় করতে লাগলেন পিটার। যা যা জেনে এসেছে ওমরকে জানাতে বসল তিন গোয়েন্দা।

'হগ বুড়ো হয়েছে,' ডিশে তেল ছুড়ছুড় করতে থাকা মাংস আর ডিম ভাজা ঢালতে ঢালতে বললেন পিটার। 'কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, কোনমতেই এ কথা ভাবা ঠিক হবে না। তারপরেও নীল আলো আর পিয়ানোর শব্দ শোনার ব্যাপারটা কল্পনাই মনে হচ্ছে।'

দুপুরের পর ওমরকে জোর করে বিছানায় পাঠিয়ে দিল ছেলেরা। পিটারকে কেবিন মেরামতে সাহায্য করল। সন্ধ্যার মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ।

আগুনের সামনে বসে রাতের খাবারের অপেক্ষা করছে, এ সময় পিটার জানাল, ইচ্ছে করলে ওরা ঘোড়া ভাড়া নিতে পারে, উলফ ক্রুপারের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করার জন্যে। 'আমারও একটা ঘোড়া আছে। কিন্তু এত বুড়ো, পর্বতে চলার কাজ হবে না ওটাকে দিয়ে।'

'এ এলাকায় বেশ কিছু পরিত্যক্ত খনি আছে,' ওমর জানাল। 'ওগুলোতে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।'

'তবে টমি-নকারের ব্যাপারে সর্তক থাকবে,' হেসে বললেন পিটার।

'খাইছে! সেটা আবার কি জিনিস?' বিচিত্র শব্দটা অবাক করল মুসাকে।

'এক ধরনের ভূত, মাটির নিচে বাস করে। খনি শ্রমিকরা বলে, মাটিতে যদি থাবা দেয়ার শব্দ শোনা যায়, তাহলে বুঝতে হবে "খনিতে দুর্ঘটনা ঘটবে" এ ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছে টমিরা।'

'দিলেন তো মুসাকে ভড়কে,' রবিন বলল। 'আর এখন যেতে চাইবে না ও।'

'চাইবে না কেন?' কিশোর বলল। 'সাবধান থাকব আমরা। তেমন বুঝলে বেরিয়েও চলে আসা যাবে।' পিটারের দিকে তাকাল সে। 'আচ্ছা, লোন ট্রী এলাকাটা কোনখানে? হ্যারি হ্যারিসনদের ক্লেইম, যেখানে সোনার খোঁজ করছিল ওরা?'

'ক্লেইমটা ঠিক কোনখানে ছিল, এখন আর সঠিক ভাবে বলতে পারবে না কেউ,' মাথা চুলকে বললেন পিটার। 'লোন ট্রী এলাকাটাও বিশাল।'

একটা নকশা এঁকে দিলেন পিটার। লোন ট্রী এরিয়ার পরিত্যক্ত খনিগুলো কোথায় আছে দেখিয়ে দিলেন। সেটা সামনে নিয়ে পরদিন কোনটাতে খুঁজতে যাবে আলোচনা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

খাওয়ার পর আবার বেরোল ওরা। মেইন স্ট্রীটের কোন আস্তাবলে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যাবে, বলে দিয়েছেন পিটার। সেখানে এসে তিনটে ঘোড়া ভাড়া করল ওরা। ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল কেবিনে। ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন পিটার আর ওমর। ঘোড়াগুলোকে ছাউনিতে বেঁধে রেখে এল ওরা। এত তাড়াতাড়ি ঘুম এল না। রহস্যটা নিয়ে আলোচনায় বসল।

বাইরে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। চাবুকের মত আছড়ে পড়ছে বেড়ার গায়ে।

'ঝড়ই তো বইছে রীতিমত,' মুসা বলল এক সময়। 'ঘোড়াগুলোকে দেখে আসা দরকার। ভয় পেয়ে না আবার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে।'

সবচেয়ে ভারী জ্যাকেট গায়ে দিয়ে বাইরে বেরোল তিনজনে। বেশ মজবুত করেই বানানো হয়েছে ছাউনিটা, যাতে ঝড় সইতে পারে। ভেতরে আরামেই আছে জানোয়ারগুলো।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে কেবিনটার পাশ ঘুরে সামনের দরজার দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ চাপা স্বরে বলে উঠল মুসা, 'ভূত!'

কিশোর আর রবিনও স্পষ্ট দেখতে পেল। সেমিট্রি হিলে নীল আলো জ্বলছে-নিভছে।

এগারো

'চলো, গিয়ে দেখে আসি,' মুসার হাত ধরে টান মারল কিশোর। মুসা কোন রকম বাধা দেয়ার আগেই ছুটতে শুরু করল সে।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আর দ্রুত ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। কবরস্থানের কাছে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল।

চাঁদ নেই। কিন্তু সুমেরু প্রভা বিচিত্র রঙিন আলোর দীর্ঘ রেখা সৃষ্টি করেছে আকাশ জুড়ে। কবরস্থানের অন্য পাশে, এক কোণে দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি নজরে পড়ল ওদের।

'ওই লোকটাই সঙ্কেত দিল নাকি?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

ঝুঁকে নিচু হয়ে ভাঙা বেড়ার ফোকর দিয়ে কবরস্থানের ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। নিঃশব্দে এসে বসে পড়ল বড় একটা কবরফলকের আড়ালে। লোকটার আরও কাছে যেতে পারলে ভাল হত, ভাবছে কিশোর, কিন্তু আশেপাশে এ পাথরটা ছাড়া লুকানোর আর কোন জায়গা নেই।

গা গরম করার জন্যে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে লোকটা, মাটিতে পা ঠুকছে, কাঁধ নিচু করে রেখেছে। একটু পরে কবরস্থানের সামনের দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বড়সড় আরেকটা মূর্তি এগিয়ে গেল প্রথমজনের কাছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে টুপিটা কপালের নিচে নামিয়ে দিয়েছে লোকটা, মাফলার দিয়ে কান-মুখ সব ঢেকে দিয়েছে। গোয়েন্দাদের দিকে পেছন ফরে দাঁড়াল সে।

লম্বা লোকটা কথা বলতে লাগল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল গোয়েন্দারা। বাতাসের গর্জনে ভাল করে শোনার উপায় নেই। কিছু কথা শোনা যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে না।

'...বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ওরা, বস্,' বলল প্রথম লোকটা। তার পরের কথাগুলো হাওয়ায় ভেসে গেল।

'...ওরা কি করে, কোথায় যায়, সব জানাবে আমাকে...বেশি বাড়াবাড়ি করলে...স্লিপ গান...' বিশালদেহী লোকটা বলল।

মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হলো। পাক খেয়ে শব্দটার দিকে ঘুরে গেল লোক দু'জন। দম আটকে ফেলল তিন গোয়েন্দাও। আরও কেউ এল নাকি?

উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে গোয়েন্দাদের বুক। লোকগুলো আর বেশিক্ষণ থাকল না। আরও দু'চারটা কথা বলে—যার কোনটাই বুঝল না তিন গোয়েন্দা—দু'জন দু'দিকে রওনা হয়ে গেল লোকগুলো।

লম্বা লোকটা গেল গোয়েন্দাদের পাশ দিয়ে। বেড়ার ভাঙা জায়গাটা দিয়ে

ওপাশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। একটু পরেই ঘোড়ার ডাক কানে এল। পরক্ষণে পাথুরে ভূমিতে খুরের শব্দ তুলে সরে যেতে শুরু করল ঘোড়াটা।

'ঘোড়া ছাড়া ওর পিছু নিয়ে লাভ হবে না,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'নিতে পারলে ভাল হতো। ডাকাতদের গোপন আস্তানাটা চিনে আসতে পারতাম।'

দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। চুপ করে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। লোকটার গেটের কাছে পৌঁছানোর অপেক্ষা করছে।

'তবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'এ শহরে উলফ ক্রুপারের চরটা কে, সেটা বোধহয় জেনে আসা যায়।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে গেটের দিকে এগোল তিনজনে। সামনে শোনা যাচ্ছে লোকটার এগিয়ে চলার শব্দ। তুষারে ঢাকা পাথুরে ঢাল বেয়ে নামার সময় বার বার পিছলে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব কাছে থেকে ওকে অনুসরণের চেষ্টা করছে তিন গোয়েন্দা। লোকটার চোখের আড়ালে থাকার জন্যে বার বার সরে যাচ্ছে পাথরের চাঙড়, ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা। কিশোর আর রবিনের হাত চেপে ধরে থামাল ওদের। কান পাতল শোনার জন্যে। পেছনে শব্দ হয়েছে বলে মনে হলো তার। আচমকা থেমে দাঁড়াতে গিয়ে পিছলে গেল রবিন। পা লেগে ঝরঝর করে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গেল একরাশ পাথর।

অন্ধকার ঢালটায় এরপর স্তব্ধ নীরবতা। বাতাসের সোঁ-সোঁ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নিথর দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে রয়েছে তিনজনেই। ওদের মনে হলো, সামনের লোকটাও শুনছে। তারপর, ওদের পেছন থেকে গড়িয়ে নেমে আসতে শুরু করল একটা ছোট পাথর।

কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল মুসা। 'আমাদের পেছনেও কেউ লেগেছে!'

কে লাগল? ভাবছে কিশোর। বিশালদেহী লোকটা? ঘোড়া নিয়ে চলে যাওয়ার ভান করেছে, তারপর ঘোড়া রেখে পা টিপে টিপে আবার ফিরে এসে পিছু নিয়েছে? নাকি তৃতীয় আরেকজন সত্যিই এসেছে, প্রথমেই যেটা সন্দেহ হয়েছিল ওদের?

পাহাড়ের ওপরটায় খুঁজতে লাগল তিন জোড়া চোখ। কাউকে দেখা গেল না।

'পাথর কিংবা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

নিচে নড়াচড়ার শব্দ হলো। সেটা লক্ষ করে আবার নামতে শুরু করল ওরা। পেছন থেকে আক্রমণের আশঙ্কাটা উড়িয়ে না দিয়ে সতর্ক রইল।

পাহাড়ের গোড়ায় নেমে সামনের লোকটার আরও কাছাকাছি চলে এল। ভুতুড়ে শহরের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখল তাকে। পুরানো বাড়িগুলোকে আলিঙ্গন করে থাকা তুষারে ঢাকা কাঠের ফুটপাথ ধরে দ্রুত এগোল ওরা। সামনে শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। প্রায় ধসে পড়া একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা।

ছুটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। বাড়িটার কাছে এসে উঁকি দিতে শুরু করল চারপাশে। সময়মতই এসেছে। পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল লোকটাকে।

সামনের বাড়িটার দিকে দৌড় দিল সে।

পিছু নিয়ে দৌড়াতে লাগল তিন গোয়েন্দাও। বাড়ির পাশ ঘুরে রাস্তায় নামল লোকটা। তিন গোয়েন্দাও নামল। ছায়ার মত অনুসরণ করে চলল। রাস্তা ধরে শহরের অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে লোকটা।

'পিছু নিয়েছি যে বুঝে গেছে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমাদের খসানোর চেষ্টা করছে।'

'থেমো না,' কিশোর বলল। 'তাহলে সত্যি খসিয়ে ফেলবে।'

লোকটা যখন জেনেই ফেলেছে, লুকোছাপার মধ্যে গেল না আর ওরা। কাঠের ফুটপাথে পা পড়ে শব্দ হচ্ছে ভীষণ, কেয়ারই করল না। লোকটাও গতি বাড়িয়ে দিল। মুহূর্ত পরেই দুটো পুরানো বাড়ির মাঝখানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লোকটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেল গোয়েন্দারাও।

'এদিক দিয়ে এসো!' চাপা স্বরে বলল কিশোর। বাড়িগুলোর মাঝখানের সরু গলিটাতে ঢুকে পড়ল ওরাও।

ছুটতে ছুটতে চলে এল বাড়িগুলোর পেছন দিকে। ঘাস আর নানা রকম আগাছার জঙ্গল হয়ে আছে। জন্মাতে জন্মাতে ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে ওগুলো পাহাড় থেকে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। তার পায়ের শব্দ শোনার জন্যে কান পাতল ওরা। অন্ধকারে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকাতে লাগল দেখার জন্যে। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। পেছনের পাহাড়ে শৈলশিরার ওপর থেকে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে।

'মনে হয় পালিয়েই গেল,' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

টর্চ জ্বেলে খুঁজতে শুরু করল ওরা। লোকটার পায়ের ছাপও দেখতে পেল। কিন্তু রাস্তায় উঠে অন্যান্য ছাপের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে, আলাদা করে চেনা মুশকিল। হতাশ হয়ে আবার ভুতুড়ে শহরের ভেতর দিয়ে ক্লিনসনের কেবিনে ফিরে চলল ওরা।

'ইস, আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিলাম লোকটাকে,' আফসোস করতে লাগল রবিন।

'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'কি?'

'স্লিপ গানটা কি জিনিস?'

'কোনও ধরনের বন্দুক,' মুসা বলল।

'কারও ডাকনামও হতে পারে,' কিশোর বলল। 'স্লিপ গান ব্যবহার করতে পছন্দ করে বলেই ওরকম নাম হয়ে গেছে। বুনো পশ্চিমের কাউবয়দের মত। চলো, পিটার হয়তো বলতে পারবেন।'

হগ বাউরির বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালাটা অন্ধকার দেখা গেল। জানালায় কান পাতল কিশোর। ভেতর থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে।

'বুড়ো ঘুমোচ্ছে, ভাগ্যিস,' হেসে বলল সে। 'নইলে ভূত ভেবে বন্দুক নিয়ে তাড়া করত আমাদের। গুলিও করে বসতে পারত।'

চলার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। ড্যান্স হলটা পার হয়ে এসেই পাথরের মূর্তির

মত দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। পেছন থেকে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রবিন। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মুসার।

নির্জন, পরিত্যক্ত হলের ভেতর থেকে বাতাসের গোঙানির সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে পিয়ানোর শব্দ।

ভূতের বাজনা!

বারো

আচমকা থেমে গেল বাতাস। মরে গেছে যেন। ভুতুড়ে নীরবতার মাঝে আরও স্পষ্ট করে কানে আসছে পিয়ানোর শব্দ।

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'এই বাজনার রহস্যের সমাধান আজ করেই ছাড়ব!'

'তুমি গেলে যাও,' সাফ বলে দিল মুসা। 'আমি যাচ্ছি না ভেতরে!'

তার কথায় কান দিল না কিশোর। কাঠের ফুটপাথ ধরে এগোল বাড়িটার সামনের দরজার দিকে। রবিন চলল তার সঙ্গে। মুসাও দাঁড়িয়ে রইল না। থেমে গেছে অদ্ভুত বাজনার শব্দ।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে মানুষের সাড়া পেয়ে ভয়ে পালিয়েছে ভূতটা।'

যেন তার কথা শুনে রাগ হয়ে গেল ভূতের। সঙ্গে সঙ্গে বাজানো শুরু করে দিল আবার। এবার আরও জোরে।

পকেট থেকে টর্চ বের করে ভেতরে পা রাখল কিশোর। পেছনে রইল তার দুই সহকারী। টর্চের আলো ফেলে ঘরটায় খুঁজতে শুরু করল ওরা।

আবার বন্ধ হয়ে গেল বাজনা।

ঘরে আসবাব বলতে কয়েকটা নড়বড়ে চেয়ার-টেবিল। তাতে ধুলোর পুরু আস্তরণ। পুরানো আমলের তেলের ঝাড়বাতি। সেই সঙ্গে ছাত থেকে ঝুলছে অসংখ্য মাকড়সার জাল।

ঠিক এই সময় আবার বেজে উঠল পিয়ানো। বাইরে গর্জন করে উঠল বাতাস। দড়াম দড়াম করে বাড়ি খেতে লাগল জানালার পাল্লা।

'বাবাগো!' থরথর করে কেঁপে উঠল মুসা। 'এ বাড়িতে সত্যি সত্যি ভূত না থাকে তো কি বললাম!'

খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'ওই দেখো!'

ঘরের একপ্রান্তে একটা মঞ্চের ওপর আলোটা ধরে রেখেছে সে। তাতে একটা জরাজীর্ণ পিয়ানো।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। কেউ নেই। অথচ আপনাআপনি বেজে চলেছে পিয়ানোটা। পালানোর জন্যে ঘুরতে যাচ্ছিল মুসা, কিশোর ধরে রাখতে পারল না।

'বুঝে গেছি,' বলল কিশোর। 'এসো আমার সঙ্গে।' টানতে টানতে মুসাকে মঞ্চের কাছে নিয়ে চলল সে।

মঞ্চে উঠে পিয়ানোর ওপরের ডালাটা খুলল। আলো ফেলল ভেতরে। মুহূর্তে যেন পাগল হয়ে গেল পিয়ানোটা। সমানে টান পড়ছে তারগুলোতে।

'কি, বুঝলে তো?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওই দেখো তোমার ভূতেরা কেমন ছুটাছুটি করছে।'

আলো দেখে পিয়ানোর ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিল বড় বড় ইঁদুর।

হাসতে শুরু করল রবিনও। তারের ওপর ইঁদুরগুলো ওঠে। তারে টান লাগলেই বেজে ওঠে পিয়ানো। 'বাদক ইঁদুর,' বলল সে।

বিশ্বাস করতে এখনও কষ্ট হচ্ছে মুসার। তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার।

হঠাৎ দরজার দিকটায় মচমচ করে উঠল কাঠের ফুটপাথ। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল তিনজন।

পলকের জন্যে একটা হুড পরা মাথা দেখা গেল। মুখ ঢাকা ভুতুড়ে মুখোশে। চোখের সামনে দুটো বড় বড় ফুটো। বাতাসে আগুপিছু করতে থাকা দরজাটার জন্যে ভালমত দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। পা বাড়িয়ে দিয়ে দরজার নড়া বন্ধ করল লোকটা। দস্তানা পরা একটা হাত ঠেলে দিল ঘরের ভেতরে। হাতে একটা খাটো নলওয়ালা রিভলভার। বুড়ো আঙুলটা বাঁকা হলো। পেছনে টেনে দিল হ্যামারটা। আগুনের ঝিলিক দেখা গেল নলের মুখ দিয়ে।

বদ্ধ ঘরে বিকট শব্দ হলো গুলি ফোটার। পিয়ানোর গায়ে গিয়ে বিঁধল বুলেট। ঝাঁপ দিয়ে মঞ্চ থেকে মাটিতে পড়ল তিনজনেই। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। চেয়ার-টেবিল উল্টে নিয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল।

গুলির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই একটা চেয়ার তুলে নিয়ে দরজা সই করে ছুঁড়ে মারল মুসা।

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল বন্দুকবাজের মুখ থেকে। তারমানে চেয়ারটা লেগেছে তার গায়ে। মেঝেতে জুতো ঘষার শব্দ শুনে বোঝা গেল ঘরে ঢুকেছে সে।

মুহূর্তে তিনজন তিন দিকে সরে গেল। কিশোর গেল ডানে, রবিন বাঁয়ে। মুসা পেছন দিকে, একপাশে। সামনেই একটা জানালা দেখে সোজা ডাইভ দিয়ে বসল।

জানালায় কাঁচ নেই। কিন্তু পাল্লার ফ্রেমগুলো আছে। সেগুলো ভেঙে নিয়ে উড়ে বাইরে চলে গেল সে। পরমুহূর্তে গুলির আওয়াজ হলো আবার। তার গায়ে লাগল না। বরফের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল সে। পেছনে শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুখোশ পরা মূর্তিটা।

লোকটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে—ঝড়ের গতিতে ভাবনা খেলে যাচ্ছে মুসার মাথায়, তাহলে পালানোর সুযোগ পাবে কিশোর আর রবিন। লাফিয়ে উঠে বাড়িটার কোণের দিকে এঁকেবেঁকে দৌড় দিল সে, যাতে গুলি মিস হয়। সামনে পড়ল ভাঙা বেড়া। লোকটা বেরিয়ে এসেছে জানালা দিয়ে। পেছনে তার পদশব্দ

ছুটে আসছে। কোন দিকে না তাকিয়ে লাফ মারল মুসা। হাইজাম্প দিয়ে উঠে বেড়ার ওপরের অংশটায় ভর করে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল উল্টো পাশে।

মুহূর্ত পরেই লাফ দিয়ে এসে নামল লোকটাও। যে ভাবে ছিল, সে-ভাবেই পড়ে থাকল মুসা। দম আটকে ফেলল যাতে নিঃশ্বাসের শব্দও লোকটার কানে না যায়। আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ছায়ামূর্তিটাকে।

কিন্তু তার গায়ে হোঁচট খেল লোকটা। লুকানো আর হলো না। লাফিয়ে উঠে দৌড় মারল মুসা। লোকটার বিহ্বল ভাবটা কাটার আগেই এক ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল ড্যান্স হলের লাগোয়া একটা ভাঙা বাড়িতে। দেখে ফেলেছে লোকটা। তার দুপ্‌দাপ্‌ পা ফেলে ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এক দিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে এল সে। তুষারে পিচ্ছিল কাঠের ফুটপাতে উঠল।

লুকানোর কোন জায়গাই নেই এখানে। লোকটাও পিছু ছাড়ল না তার। মরিয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে খোলা রাস্তায় এসে নামল সে। দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে, কিশোর আর রবিন কি করছে?

এই প্রথমবারের মত ক্ষণিকের জন্যে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। দেখল রিভলভার ধরা হাতটা উঁচু করছে লোকটা। গুলির শব্দ হলো। কানের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা ধাতব সাইনবোর্ডে লেগে পিছলে চলে গেল বুলেট।

সামনে, বাঁ দিকে একটা বাড়ি। ভুতুড়ে শহরের হোটেল ছিল এক সময়। এখন পরিত্যক্ত। আড়াআড়ি ছুটে রাস্তা পার হয়ে হোটেলের এক পাশের সরু আঙিনায় ঢুকে পড়ল মুসা।

দেয়ালের বাইরে, দেয়ালের পাশ ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে পুরানো আমলের সিঁড়ি। একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকে ওপর উঠতে শুরু করল সে। নড়বড়ে একটা কাঠের ব্যালকনিতে উঠে এল। তার ভারে দুলে উঠে দেবে যেতে চাইল ওটা।

'এখন?' মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা। 'কি করব? কোথায় যাব? এককোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকব?' বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে লোকটার।

হোটেলের ছাতের একটা ধার বেরিয়ে এসেছে মাথার ওপর। নাগালের বাইরে। যাওয়ার আর কোন জায়গা না দেখে মস্ত ঝুঁকি নিয়ে বসল সে। লাফ দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল ছাতের কিনারটা।

ধরে ফেলল এক লাফেই। এক দোলা দিয়ে উঠে গেল বরফে পিচ্ছিল হয়ে থাকা ঢালু ছাতে। সিঁড়িতে উঠে আসছে পায়ের শব্দ। থামছে না লোকটাও। উঠে এল ব্যালকনিতে। উপুড় হয়ে পড়ে থেকে লোকটার বাড়িয়ে দেয়া একটা হাত নজরে পড়ল তার। ছাতের কিনার ধরে ফেলল হাতটা। বাকি হাতটাও কিনার চেপে ধরল। মুহূর্ত পরেই রাতের আকাশের পটভূমিতে দেখতে পেল তার মুখোশ পরা মাথাটা, উঠে এসেছে ছাতের কিনারার ওপরে। উঠে এসে ভালমত দেখে খুব কাছে থেকে গুলি করার ইচ্ছে।

আতঙ্ক চাপা দেয়ার চেষ্টা করল মুসা। মুচড়ে মুচড়ে বহু কায়দা-কৌশল করে

সরে গেল কয়েক ফুট। লোকটা আবার রিভলভার বের করার আগেই তাকে ঠেকাতে হবে।

আচমকা নিজেকে ছেড়ে দিল মুসা। বান মাছের মত শরীর মুচড়ে নামিয়ে আনতে শুরু করল নিজেকে। একটা পা-ও তুলে ফেলেছে ততক্ষণে লোকটা। পকেট থেকে রিভলভার বের করছে।

'সময়মত কিছুতেই পৌঁছতে পারব না ওর কাছে!' প্রচণ্ড আতঙ্কে অসাড় হয়ে আসতে চাইছে মুসার হাত-পা।

ঠিক এই সময় আবার শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। উঠে আসছে আরও কেউ।

লোকটাও শুনতে পেয়েছে সে-শব্দ। নিচের দিকে তাকাল। তবে রিভলভার ধরা হাতটা থেমে নেই। বের করে আনছে পকেট থেকে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল তার শরীরে। পতন ঠেকানোর জন্যে ছাতের কিনার খামচে ধরল সে।

বোঝা যাচ্ছে, নিচে যে-ই আছে, সে লোকটার ঝুলে থাকা পা ধরে টানছে। প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মারল লোকটা। ছাড়িয়ে নিল পা। সামনের দিকে টান থাকায় উপুড় হয়ে পড়ল এসে ছাতের ওপর। ততক্ষণে তার কাছে চলে এসেছে মুসা। কোটের হাতা ধরে ফেলল খামচি দিয়ে।

রিভলভার হাতে বেরিয়ে এসেছিল লোকটার। সেটা বাঁচানোর চেষ্টা করল। একসঙ্গে আর কত কি করবে। পারল না। রিভলভারটা ছুটে গিয়ে পড়ল ছাতের ওপর, দু'এক গড়ান দিয়ে পিছলে পড়তে লাগল নিচে। নিজের পতন ঠেকানোর চেষ্টা করল এরপর সে। ঢালু ছাতের কিনার ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। তা-ও পারল না। তবে হাল ছাড়ল না কোনমতে। পাশে থাবা মারল। ধরে ফেলল একটা পানির পাইপ। পাইপ ধরে পিছলে নেমে গেল নিচে। সরাসরি পড়ে হাত-পা ভাঙার হাত থেকে রক্ষা পেল।

'মুসা, তুমি ঠিক আছ?' ব্যালকনি থেকে শোনা গেল কিশোরের চিৎকার।

'আছি!' জবাব দিয়ে ছাতের কিনার ধরে ব্যালকনিতে নেমে এল মুসা। নিরাপদে। রবিনও তখন পৌঁছে গেছে সিঁড়ির মাথায়, ব্যালকনির কাছে।

রেলিঙের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচে তাকাল কিশোর। রিভলভারটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে লোকটা।

'এসো! এইবার আর ব্যাটাকে ছাড়ছি না!' সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল কিশোর।

ওদের নেমে আসার শব্দ পেয়ে রিভলভারের মায়া আর করল না লোকটা। ছুটতে শুরু করল। তাড়া করল তিন গোয়েন্দা। লাকি লোডের বসতিপূর্ণ এলাকাটায় যখন পৌঁছল, লোকটা তখনও সামনেই রয়ে গেছে। আলো নেই কোথাও। এখনও তাকে কালো ছায়ামূর্তির মতই দেখা যাচ্ছে, সাদা মুখোশটা বাদে।

জেনারেল স্টোরের কাছে এসে পুরোপুরি তাকে হারিয়ে ফেলল তিন গোয়েন্দা। বাড়ির মোড় ঘুরে অন্ধকার ছায়াতে হারিয়ে গেল সে। কিন্তু থামল না ওরা। আন্দাজে তেড়ে গেল।

জেনারেল স্টোরের দরজার সামনে এসেও কাউকে দেখতে পেল না আর।

পেছনে ছুটে এল। নেই কেউ এখানেও। যা অন্ধকার, থাকলেও বোধহয় দেখা যেত না।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কিশোর। 'শুনলে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'দরজা বন্ধ হলো।'

'এসো!'

আবার সামনের দরজার কাছে ফিরে এল ওরা। আলো নেই। দরজার নব চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর। খুলল না। তালা দেয়া।

জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করল সে। নির্জন নীরবতার মাঝে প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত থেমে অপেক্ষা করেও যখন কারও সাড়া পেল না, আবার থাবা মারতে শুরু করল সে। তারপর শুরু করল কিল।

সাড়া মিলল অবশেষে। জবাব এল ভেতর থেকে, 'কে রে বাবা! থামো, খুলছি!'

আলো জ্বলল। দরজা খুলে দিল অ্যাগনি। হাতে হ্যারিকেন। পরনের শোবার পোশাকের ওপর একটা বাথরোব চাপিয়ে দিয়েছে।

'কি ব্যাপার? এত রাতে?' তার চেহারার ভঙ্গি আর কণ্ঠই বলে দিচ্ছে গোয়েন্দাদের দেখে মোটেও খুশি হয়নি।

ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ঠাণ্ডা ঢোকে বলে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। কেন ডাকছে জানাল দোকানদারকে।

'উঁহু!' মাথা নাড়তে লাগল বিস্মিত অ্যাগনি। 'কাউকে দেখিনি আমি, কোন শব্দও শুনিনি, তোমাদের বাদে।'

'পেছনের দরজা দিয়ে আপনার দোকানে ঢোকেনি তো লোকটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'প্রশ্নই ওঠে না,' জবাব দিল অ্যাগনি। 'পেছনের ঘরেই ঘুমাই আমি। ঢুকলে শুনতে পেতাম।'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সামনের দরজা। ঝোড়ো অন্ধকারের ভেতর থেকে আলোয় এসে দাঁড়ালেন অ্যান্ডি টাওয়ার।

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। টাওয়ারের কাপড়-চোপড় তুষারে ভেজা। তবে যেটা লক্ষণীয়, তা হলো চোরকাঁটা। অসংখ্য। কোটের হাতা আর প্যান্টের পায়ে গেঁথে রয়েছে।

তেরো

মুহূর্তে নানা রকম ভাবনা খেলে গেল তিন গোয়েন্দার মনে। টাওয়ারের পোশাকে চোরকাঁটা! তারমানে কবরস্থানে গিয়েছিলেন। তিনি কি প্রথম দু'জনের একজন? না তৃতীয় লোকটি? ড্যান্স হলে ঢুকে তিনিই কি খুন করতে চেয়েছেন ওদের?

কিন্তু তাঁর চেহারায় অপরাধবোধের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কোট থেকে

তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'গোলাগুলি কিসের?'

এক ভুরু উঁচু করল অ্যাগনি, 'আপনি শুনেছেন?'

'শুনেছি,' জবাব দিলেন টাওয়ার। 'পাহাড়ের ওপর থেকে গুলির শব্দ শুনে দেখতে এসেছিলাম কে গুলি করল।'

'এত রাতে আপনি পাহাড়ে গিয়েছিলেন কেন, মিস্টার টাওয়ার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

প্রশ্নটা যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন টাওয়ার, জবাব দিলেন না।

'কাউকে দেখেছেন আপনি?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, চেহারা দেখিনি। তবে কয়েকজন লোককে এদিকে ছুটে আসতে দেখেছি। রাস্তায় নেমে আর কাউকে দেখতে পেলাম না।'

'এদেরকেই দেখেছেন বোধহয়,' গোয়েন্দাদের দেখাল স্টোরকীপার। 'আমাকে এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। বলছে, ভুতুড়ে শহর থেকে নাকি এক বন্দুকবাজ তাড়া করেছিল ওদের। গুলি করেছে। আমি কিন্তু কোন গুলির শব্দ শুনতে পাইনি।' বলে যোগ করল, 'নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

অ্যাগনিকে যা বলেছে, সেই গল্পটা আবার টাওয়ারকে শোনাল কিশোর। 'হগ বাউরি আমাদের বলেছিল, ভুতুড়ে শহরের ড্যান্স হলটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাদের গুলি শুরু করল একটা লোক। মুসা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তাকে তাড়া করল সে। আমরাও পিছু নিলাম লোকটার। পরিত্যক্ত হোটেলটার ছাতে গিয়ে উঠল মুসা। লোকটাও উঠল। আমি আর রবিন না গেলে মুসাকে মেরেই ফেলত। যখন দেখল পারল না, দৌড় দিয়ে এসে এই স্টোরের কাছের অন্ধকারে লুকাল। তারপর আর খুঁজে পেলাম না।'

উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করলেন টাওয়ার। 'বড় মুশকিলের কথা। তোমরা তো মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে শুরু করেছ। দেখো, আমার কেসের কিনারা হোক বা না হোক, তোমরা আর অকারণ ঝুঁকি নিতে যেও না।'

'না, নেব না,' কিশোর বলল। 'আজ রাতে অন্তত আর নয়।' দুই সহকারীকে ডাক দিল, 'অ্যাই, চলো।'

বেরোতে গিয়েও দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা। স্লিপ গান মানে কি, কেউ কি বলতে পারবেন?'

টাওয়ার আর অ্যাগনি, দু'জনেই অবাক। তবে চেহারায় অপরাধীর ছাপটাপ কিছু ফুটল না।

'স্লিপ গান হলো এক ধরনের অস্ত্র, যেটা হাতের তালুতে বসিয়ে শুধু বুড়ো আঙুলের সাহায্যে হ্যামার টেনেই গুলি করা যায়,' টাওয়ার বললেন।

'ফ্যানিঙের মত?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, ফ্যানিং করতে দুটো হাতই ব্যবহার করা হয়। এক হাতে পিস্তল ধরে অন্য হাতে বার বার হ্যামার টেনে গুলি করাকে বলে ফ্যানিং। কিন্তু স্লিপ গানের বেলায় যে হাতে পিস্তল ধরা থাকে সে-হাতেই হ্যামার টানতে হয়। এতে ফ্যানিঙের চেয়ে সময় সামান্য বেশি লাগে বটে, তবে নিশানা হয় অনেক বেশি

নিখুঁত।'

'বানানো হয় কি করে জিনিসটা?'

শ্রাগ করলেন টাওয়ার। 'সাধারণ পিস্তল কিংবা রিভলভারের ট্রিগারটাকে খুলে ফেলে, হ্যামার কেটে ছোট করে ফেলা হয়, বুড়ো আঙুল দিয়ে নাগাল পেতে তাতে সুবিধে হয়। স্লিপ শূটার অনেক সময় নলেরও খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দেয়, অস্ত্রটাকে ছোট বানিয়ে ফেলে পকেটে নিয়ে ঘোরার সুবিধের জন্যে।'

'একেবারে আসল বন্দুকবাজের কৌশল,' কিশোর বলল।

'ওরকম কিছু করার ইচ্ছে তোমাদেরও আছে নাকি?' হাসল অ্যাগনি।

'নাহ্,' জবাব দিল কিশোর। 'আমি বোঝাতে চাইলাম, এ ধরনের বেআইনী কাজ-কারবার করার লোক নিশ্চয় এ শহরে নেই।' অ্যাগনির দিকে ছুঁড়ে দিল হঠাৎ প্রশ্নটা, 'নাকি ওরকম কাউকে দেখেছেন এখানে?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল অ্যাগনি।

একটু যেন চমকে গেলেন মনে হলো টাওয়ার। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার কথা শুনে মনে হতে পারে, এ সব কাজে আমি ওস্তাদ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কোথা থেকে এ সব তথ্য জানলাম আমি, তা-ও মনে করতে পারছি না।'

'গুড-বাই' জানিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। আগের চেয়ে ঠাণ্ডা বেড়েছে। চামড়া ভেদ করে যেন হাড়ে গিয়ে কামড় বসাচ্ছে বাতাস।

'কোথায় যাচ্ছি?' জ্যাকেটের কলারটা তুলে দিতে দিতে বলল রবিন। 'পিটারের কেবিনে?'

'যাব। পরে,' জবাব দিল কিশোর। 'আগে গিয়ে খুঁজে দেখা দরকার, লোকটার ফেলে যাওয়া রিভলভারটা পাওয়া যায় কিনা।'

'ঠিক! তাই তো, ভুলে গিয়েছিলাম ওটার কথা!'

ভুতুড়ে শহরের দিকে ফিরে চলল আবার ওরা। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'দু'জন সন্দেহভাজনের নাম জমা হলো এখন আমাদের খাতায়।'

'কে কে?' মুসার প্রশ্ন। 'অ্যাগনি আর টাওয়ার? দু'জনের মধ্যে টাওয়ারকেই আমার বেশি সন্দেহ হয়। কাপড়ে কি রকম চোরকাঁটা লেগে ছিল দেখেছ!'

'হ্যাঁ, আমারও তাঁকেই বেশি সন্দেহ,' রবিনও মুসার সঙ্গে একমত। 'পাহাড়ের ওপর গিয়েছেন, অথচ কেন গিয়েছেন তার জবাব দিলেন না। কবরস্থানে যে দু'জনকে কথা বলতে দেখেছি আমরা, ওরা বাদে আরও একজনের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। টাওয়ারই সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি হতে পারেন।'

রবিন থামলে কিশোর বলল, 'আবার, অ্যাগনিকেও সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। দরজাটা খুলতে বহু সময় লাগিয়ে দিয়েছিল সে। মাথার হুড আর তুষারে ভেজা কাপড়-চোপড় খুলে শুকনো কাপড় পরে আসার জন্যে যথেষ্ট সময়। মনে করে দেখো, পাহাড়ে হুড পরা একটা লোকের পিছু নিয়েছিল ওমরভাই। আমার তো মনে হচ্ছে এখনই অ্যাগনির পেছনের ঘরে গিয়ে যদি খোঁজা যায়, সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে চোরকাঁটায় বোঝাই ভেজা কাপড়গুলো। হুডটাও।'

'আরও একটা ব্যাপার,' কিশোরের কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'লাকি

লোডে উলফ ক্রুপারের চরগিরি করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হলো ওই জেনারেল স্টোরটা।'

'সেটাই তো,' কিশোর বলল। 'শহরের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব ওই দোকানে বসে জানতে পারছে অ্যাগনি। উলফ ক্রুপার আর দলের লোকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারবে, টেলিগ্রাফে মেসেজ পাঠাতে পারবে। এমনকি ডাকে যদি চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে চায়, সেটাও সহজেই পারবে।'

'উলফ ক্রুপারকে দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়েও সাহায্য করতে পারবে,' রবিন বলল। 'এমনকি লাল রঙও।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর কিশোর বলল, 'টাওয়ারের বিরুদ্ধেও শক্ত কেস দাঁড় করানো যায়। তাঁর ব্যবসা হলো হেলেনায়, কিন্তু লাকি লোডে পড়ে আছেন কেন তিনি? কেন এখানে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করেন?'

'সত্যিই এটা অবাক করার মত ব্যাপার,' রবিন বলল। 'যদিও যুক্তি আছে, ওমরভাইয়ের তদন্তের অগ্রগতি দেখার জন্যে বসে তিনি থাকতেই পারেন। আবার ডাকাতের দলের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকেন, তাহলে ওদের ওপর নজর রেখে খবরদারি করার জন্যেও রয়ে যেতে পারেন। এমনকি হেলিকপ্টারে করে খাবার এনে গোপন ঘাঁটিতে সাপ্লাই দিয়েও আসতে পারেন।'

'বললাম না, আমার সন্দেহ তাঁকেই বেশি,' মুসা বলল। 'আমি শিওর, কপ্টারের মধ্যে ওই বন্দুকের ফাঁদটা টাওয়ারের হুকুমেই পেতে রাখা হয়েছিল। সে-জন্যেই নিজে টার্মিনালে মাল আনার ছুতোয় চলে গিয়ে আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন কপ্টারের কাছে। বাই চান্স গুলি ছুটে এসে যদি তাঁর গায়ে লাগে, তাই সে-সময় কাছাকাছি থাকতে চাননি।'

'কিন্তু,' যতই যুক্তি থাক, মেনে নিতে পারছে না রবিন, 'একজন কোম্পানি প্রেসিডেন্ট ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর নিজের ট্রাকেই বা ডাকাতি করাবেন কেন?'

'করাবেন না-ই বা কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'টাকাগুলো বীমা করানো আছে। তাঁর তো কোন ক্ষতি নেই। যার টাকা তাকে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য বীমা কোম্পানি। ওমরভাইকে তদন্ত করানোর জন্যে নিজেই ডেকে এনেছেন টাওয়ার, যাতে তাঁর ওপর কারও সন্দেহ না পড়ে।'

পুরানো, পরিত্যক্ত হোটেলটার কাছে যখন পৌঁছল ওরা, আকাশ জুড়ে তখন ছড়িয়ে পড়েছে সুমেরু প্রভার অদ্ভুত আলো।

'কিন্তু মুসা,' কিশোর বলল, 'একটা ব্যাপার।'

'কি?'

'মিস্টার টাওয়ারকে ওমরভাই পছন্দ করে।'

'তাই তো! সন্দেহজনক লোক হলে এতদিনে ওমরভাইও তাঁকে সন্দেহ না করে পারত না। কাল তাঁর সম্পর্কে যা বলল ওমরভাই, সবই তো ভাল ভাল কথা। তারমানে একটুও সন্দেহ করে না।'

কাঠের রাস্তা পার হয়ে হোটেলের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা। টর্চের আলোয় খুঁজতে শুরু করল রিভলভারটা।

অবশেষে শোনা গেল রবিনের উত্তেজিত কণ্ঠ, 'এই যে!' ছোট একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেল অস্ত্রটা। ট্রিগারগার্ডে আঙুল ঢুকিয়ে সাবধানে তুলে নিল সে, যাতে আঙুলের ছাপ থাকলে মুছে না যায়।

'স্লিপ গানই এটা, কোন সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল। 'ট্রিগার নেই। ব্যারেলটাও কেটে ছোট করে ফেলা হয়েছে। আমার অনুমানই ঠিক। এ জিনিস যে বয়ে নিয়ে এসেছিল, তার ছদ্মনাম কিংবা ডাকনাম স্লিপ গান। কবরস্থানে কথা বলেছিল উলফ ক্রুপারের সঙ্গে। বিশালদেহী লোকটা উলফ ক্রুপার। আর অন্য লোকটা তার চর। বাড়াবাড়ি করলে আমাদের খতম করে দিতে হুকুম দিয়ে দিয়েছিল উলফ। বাতাসের গর্জনে আমরা তা শুনতে পাইনি।'

'তারমানে টাওয়ারই উলফ ক্রুপারের চর?' মুসা বলল। 'নাকি সহকারী?'

'হলে সহকারীই হবেন, কিংবা পার্টনার,' কিশোর বলল। 'তবে শিওর হবার উপায় নেই। স্লিপ গান বেশ বড়সড় দেহের মানুষ। টাওয়ার আর অ্যাগনিও তাই। দেহের গঠন, আকারে-উচ্চতায় তিনজনের অনেক মিল।'

কেবিনে যখন ফিরল ওরা, ওমর আর পিটার দু'জনেই গভীর ঘুমে অচেতন। স্লিপ গানটাতে আঙুলের ছাপ খুঁজতে বসল কিশোর। তাকে সাহায্য করল দুই সহকারী। কিন্তু ছবি তুলে রাখার মত কোন ছাপ পাওয়া গেল না অস্ত্রটাতে। নিশ্চয় দস্তানা পরা ছিল লোকটার হাতে।

চোদ্দ

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে উলফ ক্রুপারের আস্তানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সঙ্গে খাবার আর পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর উপযোগী পোশাক ও টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিল। কি কি নিতে হবে, এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য করলেন পিটার।

পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করল রবিন, 'পিটারের এঁকে দেয়া খনির নকশাটা নিয়েছ?'

'নিয়েছি,' পকেট চাপড়াল কিশোর। 'তবে সবচেয়ে ভাল হত হ্যারি হ্যারিসনের ম্যাপটা থাকলে।'

'বেচারা হ্যারি,' লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে সামলাতে সামলাতে বলল মুসা। 'ওর খানিকটা সোনাও যদি আমরা উদ্ধার করে দিতে পারতাম, কাজের কাজ হত।'

'হ্যাঁ,' হাসল কিশোর। 'কিন্তু আমি ভাবছি মেরিচাচী আর মিস কোয়াডরুপলের পাল্লায় পড়ে নিশ্চয় ঘাম ছুটে যাচ্ছে বুড়োর। সেবা-যত্নের অত্যাচার সইতে না পেরে জখমী পা নিয়েই না পালায়!'

বুড়োর সেবা-যত্ন নিয়ে কি যে কাণ্ড ঘটছে এখন রকি বীচের স্যালভিজ ইয়ার্ডে, সেটা ভেবে রবিন আর মুসাও হাসতে লাগল।

পাহাড়ের মাথায় যখন চড়ল ওরা, দেখল সকালের রোদে ঝলমল করছে উইন্ডি পীকের চূড়া। ওখানে দাঁড়িয়ে পিটারের এঁকে দেয়া ম্যাপটা আরেকবার দেখল কিশোর।

প্রথম খনিটা সহজেই খুঁজে বের করে ফেলল ওরা। উত্তরে, খুব বেশি দূরে না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছল ওখানে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে টেনে নিয়ে সাবধানে ঢাল বেয়ে হেঁটে নামতে লাগল। পিঠে চড়ে নামলে দুর্ঘটনার ভয় বেশি। ওমরের মত অকেজো হয়ে যেতে চায় না।

পুরো এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজল ওদের চোখ। কাউকে নজরে পড়ল না। তবে তুষারের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের তাজা ছাপ চোখে পড়ল দুই জোড়া। মনে হলো, একজন আরেকজনকে অনুসরণ করে গেছে।

ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো কিশোরের কাছে। কিন্তু আপাতত সে-রহস্য ভেদ করার চিন্তা বাদ দিয়ে যে কাজে এসেছে, সেটা করতে লাগল।

খনির সামনে দাঁড়িয়ে রবিন বলল, 'ভেতরে ঢুকবে নাকি?'

'না ঢুকলে দেখব কি করে?' বলে খনিমুখের কাছেই একটা ঝোপের গোড়ায় নিয়ে গিয়ে ঘোড়াটা বাঁধল কিশোর। রবিন আর মুসাও তাদেরগুলো বাঁধল। কালো মুখটা যেন হাঁ করে রয়েছে। টর্চ হাতে খনিতে ঢুকল তিনজনে।

খুব সাবধানে এগোল ওরা। চওড়া সুড়ঙ্গ, ছাতও অনেক উঁচুতে। সোজা হয়ে হাঁটতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না। কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল কিশোর। কান পেতে শুনল কোন শব্দ আসে কিনা। আবার এগোল কয়েক পা। আবার থামল। এ ভাবে থেমে থেমে শুনতে শুনতে এগোল।

মেঝেতে ছড়িয়ে আছে নুড়ি পাথর, মরচে পড়া লোহার পাইপ, পরিত্যক্ত গাঁইতি, হাতল ভাঙা বেলচা।

মাটিতেও পায়ের ছাপটাপ তেমন দেখা গেল না।

'মনে হচ্ছে বহুকাল কেউ ঢোকেনি এখানে!' বলেই কুঁকড়ে গেল মুসা। অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলল তার কথাগুলো গুহার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে। আর কিছু বলতেই সাহস করল না।

ওই খনিটাতে কিছু পাওয়া গেল না। বেরিয়ে এসে পর পর আরও কয়েকটা খনি খুঁজে দেখল। কিছুই পাওয়া গেল না কোনটাতে। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি করব, কেবিনে ফিরে যাব নাকি?'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। তুষারে বসে যাওয়া ঘোড়ার পায়ের ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, এগুলো ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখব কোথায় গেছে। সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

'কি সন্দেহ?' জানতে চাইল মুসা।

'ছাপ দেখে মনে হচ্ছে সামনের লোকটা জানে না, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।'

'এর মানে কি?'

'সেটাই তো জানতে চাই। এসো।'

ছাপগুলোকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ওরা। চলেছে তো চলেছেই, শেষ আর হতে চায় না। যতই আগে বাড়ছে, ততই দুর্গম হচ্ছে পথ। কখনও চলে গেছে উঁচু শৈলশিরার ওপর দিয়ে। অতিরিক্ত সরু পথের একপাশে গভীর খাদ। কোথাও ঢাল এত খাড়া, নামার সময় প্রায় গোড়ার সমান্তরালে ঝুঁকে যেতে হচ্ছে।

দুপুরের দিকে হঠাৎ করেই কেবিনটা চোখে পড়ল ওদের। শৈলশিরার ওপরে ছোট একটা চূড়ার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'কেউ আছে ভেতরে!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঘোড়ার গতি বাড়ানোর জন্যে পেটে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারল।

'অত তাড়াহুড়া কোরো না!' সাবধান করল কিশোর। 'ওটা উলফ ক্রুপারের কেবিনও হতে পারে।'

কপালে হাত রেখে কি যেন দেখছে রবিন। দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো দেখো, গাছ!'

ঠিকই। কেবিনটা ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা অনেক পুরানো পাইন গাছ। একটাই। ধারে কাছে আর কোন গাছের চিহ্নও নেই।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'লোন ট্রী!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মনে হচ্ছে জায়গামতই চলে এসেছি আমরা। হ্যারি হ্যারিসনদের কেবিন। নিশ্চয় দখল করে নিয়েছে এখন উলফ ক্রুপার!'

পনেরো

দরজার পাল্লায় ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

ভেতরে উঁকি দিল তিন গোয়েন্দা। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে যে দৃশ্যটা দেখল, তাতে চমকে গেল। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ওরা।

একটা চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন মিস্টার টাওয়ার। মাথাটা ঝুলে আছে বুকের ওপর।

'মিস্টার টাওয়ার!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করলেন তিনি। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকালেন গোয়েন্দাদের দিকে।

'এখানে কি করছেন আপনি, মিস্টার টাওয়ার?' কাছে যেতে যেতে প্রশ্ন করল কিশোর।

অবাক হয়ে গেলেন তিনি। 'টাওয়ার! আমার নাম টাওয়ার নয়, গ্রেট। উফার গ্রেট। এখানে একটা ক্লেইম করেছিলাম আমি, হ্যারি হ্যারিসন আর হ্যাংসন ভাইদের সঙ্গে।'

বোকা হয়ে গেল যেন কিশোর।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিকই বলছি,' উফার বললেন। তাঁর আচরণ অদ্ভুত মনে হলো ওদের কাছে। 'আমার বাঁধন খুলে দাও। সব বলছি।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। তারপর ছুরি বের করে এগিয়ে গেল টাওয়ারের বাঁধন কেটে দিতে।

কেবিনের ভেতরটা দেখছে রবিন। খাবারের টিন আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা আছে তাকে। স্টোভের পাশে লাকড়ির স্তূপ। তারমানে লোক বাস করে এখানে।

বাঁধনমুক্ত হয়ে হাত ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলেন টাওয়ার। পা দুটো টান টান করে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আঙুল চালালেন সাদা চুলে। মাথার এক পাশে গোলআলুর মত ফুলে আছে। আনমনে আঙুল দিয়ে ডলতে গিয়ে ব্যথা লাগল। ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনলেন হাতটা।

আচমকা বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, কখনও যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখো বুড়ো হয়ে গেছ, অথচ ঘুমানোর আগে ছিলে জোয়ান—কেমন লাগবে? স্মৃতি যদি পুরোপুরি মুছে যায়?'

'পঁচিশ বছরের স্মৃতির কথা বলছেন তো?' কিশোর বলল।

অবাক হয়ে গেলেন উফার। 'কি করে আন্দাজ করলে বুঝতে পারছি না, তবে ঠিকই বলেছ তুমি। শেষ কথা যা মনে আছে, আমি ছিলাম একজন যুবক, লাল চুল, লাল দাড়ি। শরীরও ছিল অনেক রোগা। এখন দেখছি,' দেয়ালে ঝোলানো একটা ফাটা আয়নার ভেতরে তাকালেন তিনি, 'সাদা চুল, বুড়ো মানুষ, অনেক ভারী শরীর।'

'আমাদের চিনতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়লেন উফার। 'না। বরং ভেবে অবাক হচ্ছি, আমাকে টাওয়ার ডাকছ কেন তোমরা।'

'কারণ, এতদিন অ্যান্ডি টাওয়ার নামেই পরিচিত ছিলেন আপনি,' কিশোর বলল।

নতুন করে টাওয়ারের কাছে নিজেদের পরিচয় দিতে হলো কিশোরকে। তারপর বলল, 'নতুন করে জেগে ওঠার কথা বললেন। কোন্খানে জাগলেন?'

'মনে তো হচ্ছে এ ঘরেই,' জবাব দিলেন উফার। ফোলাটায় আঙুলের চাপ লাগতে ব্যথা পেয়ে আবার হাত সরিয়ে আনলেন তিনি।

'কি হয়েছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ব্যথা পেলেন কি করে?'

'বুঝতে পারছি না!' অবাক মনে হলো টাওয়ারকে।

'হয়তো পড়েটড়ে গিয়েছিলেন,' কিশোর বলল। 'কোনও কারণে বিস্মরণ ঘটেছিল আপনার। এখন এই দ্বিতীয় আঘাতটার কারণে স্মৃতি ফিরে এসেছে আপনার, মাঝখানের পঁচিশটা বছর হারিয়ে গেছে।'

'তা-ই হবে, তোমরা যখন বলছ...' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলেন উফার।

'কি হয়েছিল, খুলে বলুন তো? যতখানি মনে করতে পারেন। চেয়ারে এ ভাবে বেঁধেই বা রাখল কে? বাইরে কাউকে দেখলাম না, ঘরেও কেউ নেই...'

'যদ্দূর মনে পড়ে, আমার নাম ছিল উফার গ্রেট,' বললেন তিনি। 'যখন আমি যুবক ছিলাম। ইদানীংকার কোন কথাই আর মনে করতে পারছি না।' গলা ধরে

এল তাঁর। দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন। 'আমার সম্পর্কে যা যা জানো তোমরা, যদি বলো, কৃতজ্ঞ থাকব। শুনলে হয়তো কিছু মনেও পড়ে যেতে পারে।'

জানাল ওরা। দশ বছর ধরে হেলেনায় একটা আর্মার্ড-কারের ব্যবসা করছেন তিনি। তার আগে তিনি কোথায় ছিলেন, জানে না ওরা। আর্মার্ড-কারে ডাকাতির তদন্ত করতে ওমর শরীফকে নিয়োগ করেছিলেন তিনি। ওমর জখম হয়ে যাওয়ায় ওদেরকে সাহায্য করতে ডেকে আনা হয়েছে। তারপর যা যা ঘটেছে, সেগুলোও বলল ওরা।

নিরাশ ভঙ্গিতে সাদা চুলে ভরা মাথাটা নাড়তে নাড়তে হতাশ কণ্ঠে বললেন উফার, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। কিন্তু আমি একটা কথাও মনে করতে পারছি না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'পঁচিশ বছর আগের শেষ কোন্ কোন্ কথা আপনার মনে আছে, বলুন তো?'

ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন উফার। তিনি আর তাঁর পার্টনাররা কি ভাবে এই কেবিনটাতে ব্ল্যাক পেপারের বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

'হ্যারি হ্যারিসনের কাছে সেটা শুনেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'সে এখন ট্র্যাপারের পেশা বেছে নিয়েছে। আর হ্যাংসনরা দুই ভাইই মারা গেছে।'

ঢোক গিললেন উফার। 'তাই নাকি? সত্যি খারাপ লাগছে আমার।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। 'যাই হোক, আমার মনে আছে প্লেন নিয়ে আকাশে উড়াল দিয়েছিলাম আমি। তিন-চার মিনিট পরেই প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে প্লেন ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়।'

'তিন-চার মিনিটে তো বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব না,' হিসেব করে বলল মুসা। 'যত জোরেই উড়ুক।'

'তা ঠিক,' ভ্রূকুটি করলেন উফার। 'আমার ধারণা লোন ট্রী রিজের ওপাশের বিশাল উপত্যকায় নামতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর।

চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি শুরু করলেন উফার। 'প্রচণ্ড জোরে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল প্লেন, উপত্যকার ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে গিয়ে পড়েছিল সম্ভবত একটা গিরিখাদে। নিশ্চয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। জ্ঞান ফিরল মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে।'

'প্লেনটার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ। আমার ভয় ছিল ব্ল্যাক পেপারের দল সোনাগুলো পেয়ে যাবে, এত বিশ্বাস করে যেগুলো আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিল হ্যারি আর হ্যাংসনরা দুই ভাই। সোনার বস্তাগুলো ঠিকই সরিয়ে ফেলেছিলাম প্লেন থেকে। ওরকম জখম অবস্থায় কাজটা কিভাবে করতে পেরেছিলাম জানি না।'

'কোনখানে, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মনের ভুলে মাথার জখমটায় হাত দিয়ে ফেলে উহ্ করে উঠলেন উফার। 'নেই। প্লেনটা ক্র্যাশ করার পরের কোন কথাই মনে করতে পারছি না। এত ভারী বস্তা দূরে কোথাও বয়ে নিয়ে যাবার অবস্থা ছিল না আমার তখন। তবে নিশ্চয়

নিরাপদ জায়গায় লুকাতে চেয়েছিলাম ওগুলো, যেখানে ডাকাতেরা খুঁজে পাবে না। উপত্যকায় হয়তো কোন চিহ্নও রেখেছিলাম, যেটা চোখে পড়লে পরে চিনতে পারব। বের করে আনতে পারব সোনাগুলো। অস্পষ্ট ভাবে বার বার একটা খনির চেহারা দেখতে পাচ্ছি কেবল।'

'আর কিছু?' আগ্রহে সামনে মুখ বাড়িয়ে দিল কিশোর। পারলে উফারের মাথায় ঝাঁকি দিয়ে মগজে লুকানো কথাগুলো বের করে আনে।

'সুড়ঙ্গ মুখ, সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় বেশ বড় একটা গুহা, দেয়ালের মাটি নীলচে রঙের,' উফার বললেন, 'ওরকম একটা জায়গাতেই লুকিয়েছিলাম সোনাগুলো।'

'কোথায় হতে পারে জায়গাটা, বলুন তো?'

'ব্র্যাডি'স মাইনের কাছে। আমি শিওর না। বার বার ওটার কথাই মনে পড়ছে তো, সে-জন্যে বললাম।'

'আর কিছু মনে পড়ে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'মনে পড়ে, সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এত ঠাণ্ডা আর বরফ পড়ছিল, কাউকে দেখতে পাইনি। নিশ্চয় পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। বহু পথ হাঁটতেও হয়েছিল নিশ্চয়। হাঁটছিলাম, পড়ে যাচ্ছিলাম, উঠছিলাম, অন্ধের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলেছিলাম। তারপর এক সময় সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' মাথা দোলাল কিশোর, 'অ্যাক্সিডেন্টের পর মাথায় বাড়ি খেয়ে, তারপর অমানুষিক পরিশ্রম করে অ্যামনেশিয়া হয়ে গিয়েছিল আপনার।'

'তারপর আজ আবার মাথায় আঘাত লাগাতে অতীতের স্মৃতি ফিরে আসে,' মুসা বলল। 'একেবারে সিনেমার মত। প্রথম আঘাতে আউট, দ্বিতীয় আঘাতে ইন···কিন্তু মাঝখানটা? পঁচিশ বছর যে গায়েব!' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'আরেকটা বাড়ি দিলে কেমন হয়?'

অন্য সময় হলে হেসে ফেলত রবিন। কিন্তু এখন উফারের এই যন্ত্রণার মুহূর্তে হাসতে পারল না।

'আমার ধারণা,' মুসার কথায় কান নেই কিশোরের, আনমনে বিড়বিড় করল, 'ব্ল্যাক পেপার আর উলফ ক্রুপার একই লোক।'

উফার বললেন, 'একটু আগে তুমি বললে হেলেনাতে একটা ব্যবসা আছে আমার। তাহলে এখানে এলাম কেন?'

'সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন!' কিশোর বলল। 'স্মৃতি হাতড়াতে থাকুন। চেষ্টা করুন। হয়তো আরও কিছু মনে পড়বে···'

হঠাৎ ঘোড়ার ডাকে চমকে উঠল সবাই। চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটল কিশোর।

ষোলো

বাকি তিনজনও পেছনে ছুটল। একটা পাথরের চাঙড়ের ওপাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একজন অশ্বারোহীকে। ছুটে চলল শৈলশিরাটার দিকে।

'উলফ ক্রুপার!' বিশালদেহী লোকটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

লোকটার পিছু নেবে কিনা ভাবতে ভাবতেই পাহাড়ের বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেল লোকটা।

কেবিনের পাশে তাজা পায়ের ছাপ দেখতে পেল সে। ছাপগুলো অনুসরণ করে দেখল, পেছনের ছাউনিটার কাছে চলে গেছে।

ছাউনিতে ঢুকল সে। সঙ্গে উফার আর মুসা ও রবিন।

ফীড বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে খড় চিবুচ্ছে একটা ঘোড়া। নিশ্চয় টাওয়ারের।

আবার কেবিনের পাশে ফিরে এল কিশোর। কেবিনের কাঠের দেয়ালের একেবারে কাছে এক জায়গায় পায়ের দুটো ছাপ বেশ গভীর।

'এখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও!' কিশোর বলল। 'আড়ি পেতে আমাদের কথা সব শুনেছে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে নিশ্চয় এখন সোনাগুলো খুঁজতে গেল সে! ব্র্যাডি'স মাইনে!'

পাথরের চাঙড়টার কাছে দৌড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ঘোড়া আর মানুষের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না ওখানে। কোন সূত্র নেই।

কেবিনে ফিরে এল আবার ওরা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন উফার। কিশোর বলল, 'অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন আমার কাছে। আপনি আজ এখানে এসেছিলেন হয় সোনার খোঁজে, নয়তো উলফ ক্রুপারের খোঁজে। আপনাকে চিনতে পেরেছিল উলফ। নজর রেখেছিল। লাকি লোডের পর থেকেই আপনার পিছু নিয়েছিল সে। এখানে এসে আপনার পেছন পেছন কেবিনে ঢোকে। মাথায় বাড়ি মেরে আপনাকে বেহুঁশ করে ফেলে। তারপর চেয়ারের সঙ্গে বাঁধে। ঠিক এ সময় এসে হাজির হই আমরা। আমাদের সাড়া পেয়ে ছাউনিতে গিয়ে লুকায় সে। আমরা কেবিনে ঢুকলে চুপচাপ এসে আড়ি পেতে সব কথা শোনে। আপনার মুখ থেকে শোনা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সোনাগুলো কোথায় আছে অনুমান করে নিয়েছে। সেখানেই গেছে এখন।'

'ওর পিছু নেয়া দরকার!' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওর আগেই সোনাগুলো খুঁজে বের করে

ফেলতে পারি যদি, ভাল হয়।'

ওদের সঙ্গে যেতে চাইলেন উফার। কিন্তু সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে বরং এখানে কি ঘটছে সে-খবরটা ওমরের কাছে পৌঁছে দেয়াটা জরুরী মনে হলো কিশোরের কাছে। উফারকে সেই অনুরোধই করল। লাকি লোডে ফিরে যেতে বলল। যদি অবশ্য ফিরে যাওয়ার রাস্তাটা চিনতে পারেন তিনি। তবে এক রাস্তা। না চিনলেও ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে দেখে চলে যাওয়াটা অসম্ভব হবে না।

'মাথার আঘাতটার জন্যে ডাক্তারও দেখানো উচিত আপনার,' কিশোর বলল।

কিন্তু উফার ওদের সঙ্গে সোনা খুঁজতে যেতেই বেশি আগ্রহী। খানিকক্ষণ চাপাচাপির পর অবশেষে রাজি হলেন তিনি লাকি লোডে যেতে। আকাশের অবস্থা ভাল না। ধূসর হয়ে আছে। যে কোন সময় তুষারপাত শুরু হতে পারে। ঝড় এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কতটা সময় লাগবে বলা যায় না। তাই কেবিন থেকে কিছু খাবার নিতে গেল তিন গোয়েন্দা। তখনই চোখে পড়ল টর্চটা। নীল কাঁচ। কবরস্থানে সঙ্কেত দেয়া হত এটার সাহায্যে, বুঝতে পারল কিশোর। ছোট একটা নোটবুকও পাওয়া গেল। তাতে কতগুলো নাম ঠিকানা। দলের লোকের। শিকাগোর আরলিংসদের নামও পাওয়া গেল ওটাতে।

এ থেকে বোঝা গেল, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এই কেবিনটাতেই ঠাঁই নিয়েছিল উলফ।

'নিয়ে যান,' উফারকে নোটবুকটা দিয়ে বলল কিশোর। 'পুলিশের হাতে এটা তুলে দিলেই যা করার করবে ওরা। আমাদেরকে আর ভাবতে হবে না।'

বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ওরা। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উফার রওনা হয়ে গেলেন লাকি লোডের দিকে, তিন গোয়েন্দা চলল গুহাটা খুঁজে বের করতে।

তুষারে দ্রুত ঢেকে দিচ্ছে উলফ ক্রুপারের ঘোড়ার পায়ের ছাপ। শৈলশিরায় চড়ে ওপাশের উপত্যকায় যখন নামা শুরু করল ওরা, পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে তখন ছাপগুলো।

'ঠিক কোথায় গেছে বোঝা যাবে না আর,' কিশোর বলল। 'তবে কোন্ দিকে গেছে অনুমান করা যাবে।'

ঘণ্টাখানেক পর সমতল জায়গায় পৌঁছল ওরা। আকাশের অবস্থা আরও খারাপ এখন। উপত্যকা বেয়ে গর্জন করতে করতে ধেয়ে আসা বাতাস এখন ঝড়ের রূপ নিয়েছে। মুখে এসে আঘাত হানছে তুষারকণা। বাতাস আর তুষারের কবল থেকে বাঁচার জন্যে জিনের ওপর নুয়ে পড়েছে গোয়েন্দারা।

আগে আগে চলেছে কিশোর। খুব সাবধানে, উপত্যকায় বোঝাই হয়ে থাকা পাথর আর ঝোপঝাড়ের আশপাশ দিয়ে প্রায় টিপে টিপে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। যেখানেই খালি জায়গা পেয়েছে, তুষারের আস্তর জমেছে পুরু হয়ে। ঘোড়ার পা দেবে যাচ্ছে সেগুলোতে। বাতাসের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে শুরু করল তুষারকণা। এতটাই ঘন হয়ে গেল, কয়েক গজের বেশি আর দৃষ্টি চলে না। এই

ঝড়ের মধ্যে একনাগাড়ে শুধু সোজা এগোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

'আসল তুষার ঝড়ে পড়েছি মনে হচ্ছে,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'কোথাও আশ্রয় নেয়া দরকার।'

মুসার সাড়া পাওয়া গেল কেবল।

ফিরে তাকাল কিশোর। রবিনকে দেখতে পেল না। মুসার পেছন পেছন আসছিল সে।

. বেশি পেছনে পড়ে গেছে হয়তো, সে-জন্যে অপেক্ষা করল ওরা। কিন্তু রবিনের দেখা নেই।

অনেক ডাকাডাকি করা হলো তার নাম ধরে।

বৃথা চেষ্টা। কোন সাড়াই পাওয়া গেল না রবিনের কাছ থেকে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। আবার চিৎকার করে ডাক দিল রবিনের নাম ধরে। চাপা পড়ে গেল সেটা বাতাসের গর্জনে।

বাতাসের কামড় থেকে বাঁচার জন্যে কোটের কলার উঁচু করে দিয়ে তার ভেতরে চিবুক লুকাল। জিনের ওপর মাথা নিচু করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জনে। গড়িয়ে যেতে লাগল সময়। মিনিটের পর মিনিট। আবার চিৎকার করে ডাকতে লাগল দু'জনে। দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার। তুষার মেশানো প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় ইতিমধ্যেই অর্ধেক অবশ হয়ে গেছে দেহ। প্রতিটি মুহূর্ত যাচ্ছে, আর পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে আরও।

'নাহ্, এ ভাবে বসে থাকা যাবে না আর,' কিশোর বলল। 'জমে বরফ হয়ে যাব। চলো, এগোই। কোথাও গিয়ে ঠাঁই নিই আগে, তারপর ভাবব কি করা যায়।'

পর্বতে ছাড়া আশ্রয় মিলবে না। খোলা জায়গা ছেড়ে সেদিকেই এগোল ওরা।

তুষারের ঘূর্ণিপাকের মাঝে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল একটা আকৃতিহীন বিশাল পাথুরে অবয়ব। পাহাড়কে একপাশে রেখে পাহাড়ের গোড়া ধরে এগোল ওরা, তাতে বাতাসের ঝাপটা সামান্য হলেও কম লাগে। কয়েক মিনিট এ ভাবে এগোনোর পর একটা ঝুলে থাকা পাথর পাওয়া গেল। নিচের পাহাড়ের দেয়ালে বেশ বড়সড় একটা খাঁজ। তাতে ঢুকলে ওপরের পাথরটা ছাতের কাজ করে। এখানে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। সোঁ-সোঁ শব্দে একনাগাড়ে বয়ে চলেছে তুষারঝড়।

টর্চ জ্বেলে জায়গাটা ভালমত দেখল কিশোর। দেয়ালের গায়ে এক ধরনের বাদামী রঙের ছোট ছোট গাছের ঝোপ। শুকনো। চাপ দিলে মট করে ভেঙে যায়।

'আগুন জ্বালানো যাবে,' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'ভাঙো এগুলো। আগুনও জ্বলবে, রবিনকেও সঙ্কেত দেয়া যাবে।'

'কিন্তু কোথায় আছে ও?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না। হয়তো আটকে পড়েছে কোনখানে। এখানে এসে আগুন দেখলে বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।'

সতেরো

শুকনো ঝোপ ভেঙে এক জায়গায় জড় করল ওরা। পানি নিরোধক বাক্স থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল কিশোর। জ্বলেই নিভে গেল বাতাসের ঝাপটায়। দ্বিতীয়টাও জ্বেলে রাখতে পারল না। তৃতীয়টা জ্বালানোর সময় হাত দুটোকে এক করে আড়াল তৈরি করল। এবার আর নিভল না। ঝোপের ওপর ধরতেই ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ডালগুলোকে ওপর-নিচ করে দিতে লাগল মুসা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

'বেশিক্ষণ থাকবে না,' হাত-মুখ গরম করতে করতে বলল কিশোর। 'সহসাই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।'

আগুনের আলোয় কয়েক ফুট দূরে একটা গাছ পড়ে থাকতে দেখা গেল। ডাল ভেঙে আনা গেলে অগ্নিকুণ্ডটাকে টেকানো যেত। সেই চেষ্টাই করল ওরা। ভেঙে নিয়ে এসে আগুনের ওপর ফেলল। ছ্যাৎ ছ্যাৎ করে ওপরে লেগে থাকা তুষার গলে গিয়ে গরম হতে শুরু করল ডালের বাকল আর কাঠ। জ্বলে উঠতে সময় লাগল বটে, তবে জ্বলল।

'ইস্, রবিন এখন এখানে থাকলে আর কোন চিন্তা ছিল না,' কিশোর বলল।

কেঁপে উঠে বাইরের অন্ধকারের দিকে ঘুরে বসল মুসা। চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল রবিনের নাম ধরে।

হঠাৎ ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। একটা চিৎকার শুনেছে বলে মনে হলো।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। তার কানেও গেছে চিৎকারটা।

পাগলের মত চিৎকার শুরু করল দু'জনে। কয়েক মুহূর্ত পর তুষার মেশানো অন্ধকারের মধ্য থেকে ফুটে উঠতে লাগল একজন অশ্বারোহীর অবয়ব। তাকে এগিয়ে আনতে ছুটে গেল দু'জনেই। ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে নিয়ে এল খাঁজের ভেতরে। লাল হাসি হেসে রবিনকে স্বাগত জানাল যেন আগুনের আলো।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুষারে সাদা হয়ে গেছে রবিন। ক্লান্ত ভঙ্গিতে নেমে এল জিন থেকে। গা থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে গিয়ে দাঁড়াল আগুনের কাছে। তার ঘোড়াটার সেবা করার ভার নিল মুসা।

'হাউফ!' করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আগুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল রবিন। ডলে ডলে স্বাভাবিক করতে লাগল জমে যাওয়া আঙুলগুলোর রক্ত চলাচল। 'ভাগ্যিস, আগুন জ্বেলে রেখেছিলে তোমরা। আমি তো আরেকটু হলেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'আমার মনেই হচ্ছিল, আগুনের আলো চোখে পড়বে তোমার,' কিশোর বলল। 'এত পেছনে পড়লে কি করে?'

'আমার অসাবধানতার কারণে,' নিজের ওপর ক্ষোভ ঝাড়ল রবিন। 'আক্কেলও তাতে কম হয়নি। আগুনটা জ্বেলে দিয়ে খুব ভাল করেছ। আমি তো হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর বোধহয় বাঁচতেই পারলাম না!'

'আমারও মনে হচ্ছিল আগুনটা তোমার চোখে পড়বেই,' কিশোর বলল। 'মুসাকে বলেওছি সে-কথা। কিন্তু তুমি এত পেছনে পড়লে কি করে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'খানিকটা আমার অসাবধানতাই বলা যায়,' রবিন বলল। 'উলফ ক্রুপারের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে আসছিলাম। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম তার মত করে চলার জন্যে। ভেবেছি তোমাদের পেছন পেছনই তো যাচ্ছে। ওটা যে আরেক দিকে চলে যাবে কে জানত। যখন খেয়াল করলাম, কোথাও দেখতে পেলাম না তোমাদের।'

ঘোড়াগুলোকে খাবার দিল ওরা। টিন থেকে বীন আর সুপ বের করে গরম করে খেয়ে নিল।

মুসা বলল, 'পিকনিকটা কিন্তু মন্দ জমল না। বাইরে তুষার ঝড়, ভেতরে আগুন, গরম গরম খাবার···আর কি চাই।'

'উলফ ক্রুপার বন্দুক নিয়ে এসে এখন খাড়া হলেই আর কি চাই বুঝতে পারবে,' রবিন বলল। 'ঝড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়নি তো সে?'

'যেতেও পারে,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে তাকে অত আনাড়ি ভাবার কোন কারণ নেই। আশ্রয় একটা বের করে নিতে পারবেই।'

'বলা যায় না, সেই সুড়ঙ্গ আর গুহাটাই হয়তো বের করে ফেলল, যেটাতে সোনা লুকিয়েছেন উফার,' রবিন বলল।

'আল্লাহ্, না পাক, না পাক!' বলে উঠল মুসা। 'এত কষ্ট করে আসা তাহলে আমাদের মাঠে মারা যাবে।'

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব। আগুনের সামনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ঢুলুঢুলু হয়ে এল ওদের চোখ। বুকের ওপর ঝুলে পড়ল মাথা। আরাম করে শোয়ার উপায় নেই। ওই ভঙ্গিতেই কখনও ঢুলল, কখনও চমকে চমকে জেগে উঠল। খাওয়ার সময়টা মোটামুটি জমলেও, ঘুমের ব্যাপারটা হলো বড় অস্বস্তিকর। তারপর যখন আগুন নিভে গেল, এক এক করে জেগে উঠল ওরা। ডাল ভেঙে এনে আবার জ্বালানোর ব্যবস্থা করল।

ভোরের আলো স্পষ্ট হতেই জেগে গেল ওরা আবার। রওনা দেয়া দরকার। ভোরের দিকে কোন এক সময় বন্ধ হয়ে গেছে তুষারপাত। পুরো উপত্যকাটা ছেয়ে আছে সাদা তুষারে। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে। ভুতুড়ে লাগছে।

'এরপর কি করব?' খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হারানো প্লেনটা আগে খুঁজে বের করতে পারলে কাজ হত,' কিশোর বলল। 'ওটার কাছাকাছিই থাকবে সুড়ঙ্গমুখটা।'

'কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও এতকাল যখন পায়নি উলফ ক্রুপারের দল,' রবিন বলল, 'পাওয়াটা কি এত সহজ হবে আমাদের জন্যে?'

'ওদের হাতে কোন সূত্র ছিল না, অন্ধের মত খোঁজাখুঁজি করেছে। তা ছাড়া

খাদের মধ্যে পড়েছে প্লেনটা। কোথায় পড়েছে জানা না থাকলে ওপর থেকে দেখা যাবে না সহজে।'

'তা ঠিক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রবিন। 'কোথায় পড়েছে আমরাও তো জানি না।'

'একটা সূত্রই আছে,' কিশোর বলল। 'উফার বলেছেন, উত্তরে রওনা হয়েছিলেন তিনি। তিন-চার মিনিট আকাশে উড়েছেন। পুরানো আমলের ইঞ্জিনের স্পীড হিসেব করে তিন-চার মিনিটে কতখানি যেতে পারেন, মোটামুটি আন্দাজ করে নেয়া যেতে পারে।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। সঙ্গে কম্পাস আছে। সেটা ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করল সঠিক ভাবে। লোন পাইন ট্রী, অর্থাৎ শৈলশিরার ওপরের নিঃসঙ্গ পাইন গাছটা থেকে দূরত্ব হিসেব করে এগিয়ে চলল, যেখানে ওদের ধারণা প্লেনটা ক্র্যাশ করেছে।

তুষারে গভীর ভাবে বসে যাচ্ছে ঘোড়ার পা। শূন্যের নিচে তাপমাত্রায় নিঃশ্বাস বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জমে যাচ্ছে গতি এত ধীর ধৈর্য রাখাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

কয়েক ঘণ্টা ধরে খুঁজল ওরা। হতাশ হয়ে পড়ল। সকাল শেষ হয়ে আসছে। ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল কিশোর।

'নাহ্, কোন আশা দেখছি না,' জিনের ওপর ঘুরে বসে সহকারীদের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'হিসেবেই কি ভুল করলাম...'

কথা শেষ হলো না তার। বাধা দিল মুসা। 'কিশোর!'

বিচিত্র একটা জিনিস চোখে পড়েছে তার। আশপাশের প্রকৃতির সঙ্গে বেমানান। বেশ কিছুটা দূরে বরফের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা, পরিষ্কার বাতাসে দৃষ্টি এখন বহুদূরে যায়।

কি দেখেছে দেখার জন্যে রবিন আর কিশোর দু'জনেই ঘুরে তাকাল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'চলো তো দেখে আসি!'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল ওরা। একেবারে কাছে না পৌঁছেও বুঝে গেল, জিনিসটা কি। বরফে ঢাকা খাদের মধ্যে তুষারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে কঙ্কালসার একটা ভাঙা বিমানের ডানা।

'প্লেনটাই!' উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'কেন এতদিন খুঁজে পায়নি উলফ ক্রুপারের দল, এখন বোঝা যাচ্ছে। খাদের পারে দেখো, কি ভাবে গাছ জন্মে আছে। ওপর থেকে ডাল-পাতা দিয়ে এমন ঢেকে রেখেছে, খাদের নিচেটা চোখেই পড়বে না ওপর থেকে। নিচে নেমে না খুঁজলে আমরাও দেখতাম না।'

আর এগোনোর প্রয়োজন মনে করল না ওরা। এরপর কি করবে আলোচনা করতে লাগল।

'পর্বতের গায়ে কোথাও আছে সুড়ঙ্গমুখটা,' কিশোর বলল। 'এবং সেটা উপত্যকার এ পাশটাতেই হবে। ওই পাশটা বহু মাইল দূরে। আহত অবস্থায় এত সোনা ওদিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না উফারের পক্ষে।'

'এ পাশটাও তো কম দূরে না,' মুসা বলল।

উপত্যকার কিনারের ঢালটা যেখান থেকে উঁচু হতে শুরু করেছে সেদিকে রওনা হলো ওরা। বেশ খাড়া ঢাল।

কাছে এসে কিশোর বলল, 'বেশি দূরে যেমন যেতে পারেনি উফার, বেশি ওপরেও উঠতে পারেনি। কাজেই নিচের দিকটাতে খোঁজাই ভাল।'

বাঁ দিকে ঘুরে মাইল দুয়েক দেখতে দেখতে এগিয়ে যাবে ঠিক করল ওরা। যদি কিছু পাওয়া না যায়, এখানে ফিরে এসে আবার উল্টো দিকে এগোবে দুই মাইল।

পুরু হয়ে জমা তুষার তো আছেই, পর্বতের গোড়ায় ঝোপঝাড়ও বেশি। খোলা উপত্যকা দিয়ে এগোনোর চেয়ে এখানে এগোনো অনেক বেশি কঠিন হলো। কয়েক বার হাল ছেড়ে দিয়ে থেমে যেতে যেতেও থামল না। পর্বতের দেয়ালে গুহা বা গর্ত বা কোন ধরনের কোন ফোকরের চিহ্নও নেই। একটানা এগিয়ে গেছে গাছপালা আর ছোট-বড় পাথরের স্তূপ।

তবে এর মধ্যেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা, 'ওটা কি! খাঁজ, না ফাটল?'

কাছে এসে দেখা গেল, গোল একটা কালো বড় গর্ত। অর্ধেক ঢেকে রয়েছে ঝোপঝাড়ে। ঘোড়া থেকে নেমে ওগুলোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে গর্তটার দিকে এগোল। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। তুষারে সাদা হয়ে আছে ঝোপগুলোও। ডাল ধরে দু'দিক থেকে টেনে রাখল মুসা আর রবিন। ভেতরে টর্চের আলো ফেলল কিশোর।

অন্ধকার চিরে দিয়ে ঢুকে গেল হলদে আলো। দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'সাধারণ গুহাই তো মনে হচ্ছে। খনির সুড়ঙ্গ না।'

'কিন্তু সুড়ঙ্গ একটা আছে, ওই দেখো,' মাথা নুইয়ে দেখে বলল মুসা।

মুখের কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ ফুট মত দূরে, পেছনের দেয়ালে আরেকটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। পর্বতের গভীরে চলে গেছে মনে হলো ওটা।

'চলো, ঢুকে পড়া যাক,' রবিন বলল। পাহাড়, পাহাড়ের গুহা এ সব তার বিশেষ পছন্দ। এ সবকে তেমন ভয়ও পায় না। বহুবার পাহাড়ে চড়তে গিয়ে পা ভেঙেছে সে।

ঢুকে পড়ল ওরা। যে কোন ধরনের বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক রইল। কিছুদূর এগিয়ে বাঁ পাশে মৃদু খসখস শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'এই, থামো তো!'

ফিরে তাকাল তিনজনেই। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে দেখল এক জোড়া চোখ।

সেদিকে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। দেখা গেল বিশাল এক ধূসর নেকড়ের মুখ। ঘাড়ের রোম খাড়া করে ফেলেছে ওটা। হাঁ করা মুখে বেরিয়ে পড়েছে বিকট দাঁত। চাপা গর্জন করে উঠল।

একই ধরনের আরও গর্জন কানে এল ওদের। টর্চের আলো এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল কিশোর। আরও ডজনখানেক কয়লার মত জ্বলন্ত চোখ নজরে এল তার।

'সর্বনাশ হয়েছে!' ফিসফিস করে বলল সে, 'নেকড়ের গুহায় এসে ঢুকে পড়েছি আমরা!'

আঠারো

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আতঙ্কে অবশ হয়ে রইল যেন তিনজনে।

ঢোক গিলল মুসা। চাপা খসখসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'বাঁচার উপায় কি?'

'ভাবছি,' জবাব দিল কিশোর।

সবচেয়ে সামনের নেকড়েটা, যেটাকে দলপতি মনে হচ্ছে, গর্জন করে উঠল আবার। কলজে কাঁপিয়ে দেয়া শব্দ। ঘাড়ের রোম পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেছে।

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে কিশোর বলল, 'একটা ভুল কদম ফেলব, অমনি এসে ঘাড়ে পড়বে ওটা। ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে এগুলোকে।'

অন্ধকারে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে জ্বলন্ত চোখগুলো। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে বাইরে বেরোনোর পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

ঠাণ্ডা ঘামের ফোঁটা চামড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে, টের পাচ্ছে কিশোর। 'তোমাদের টর্চগুলোও জ্বালাও। বেশি আলো দেখলে পিছিয়ে যেতে পারে।'

টর্চ জ্বেলে নেকড়েগুলোর ওপর ঘোরাতে শুরু করল তিনজনে।

অস্থির ভঙ্গিতে জায়গা পরিবর্তন শুরু করল নেকড়েগুলো, কিন্তু চলে গেল না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দেহটাকে পেছনে বাঁকা করে ফেলল কোন কোনটা। ঝুলে পড়া লাল জিভ দেখে মনে হতে লাগল শয়তানের হাসি। তবে আলোকে যে ভয় পাচ্ছে, এটা বোঝা গেল। হঠাৎ করে কোনটার গায়ে আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে ছায়ায়।

তবে এই আলো বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ওগুলোকে। অস্থির ভঙ্গিতে পদচারণা করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছে না একটাও, বরং এগিয়ে এসে চক্রটাকে ছোট করে আনছে।

'খাইছে!' বলে উঠল হঠাৎ মুসা। 'চলেই তো আসছে দেখছি!'

সোজা ওদের দিকে এগোনো শুরু করেছে সর্দারটা। টর্চ ঘোরাল কিশোর। টর্চের আলো খাড়া পড়ল নেকড়েটার চোখে-মুখে। সঙ্গে সঙ্গে দেহটাকে পেছনে কুঁকড়ে ফেলল ওটা। কান দুটো পেছনে লেপ্টে গেল মাথার সঙ্গে। গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর এক গর্জন।

নিজের অজান্তেই ঝট করে পেছনে সরে গেল কিশোর। মুসা আর রবিনের মাঝেও প্রতিক্রিয়া হলো। ওদের এই ভয় পাওয়াটা আঁচ করে ফেলল নেকড়েগুলো। এগিয়ে আসতে লাগল আরও। দেয়ালের দিকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে কোণঠাসা করে ফেলতে চাইছে ওদের।

'সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ো!' কিশোর বলল।

'ওপাশে বেরোনোর মুখ যদি না থাকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। আর কোন পথ নেই।'

ইঞ্চি ইঞ্চি করে দেয়ালের সুড়ঙ্গমুখটার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল ওরা।

'দু'জন একসঙ্গে ঢোকা যাবে না,' চট করে একবার সুড়ঙ্গমুখে আলো ফেলে দেখে নিয়ে বলল মুসা।

'তাহলে একজন একজন করেই ঢুকতে হবে,' কিশোর বলল। 'রবিন, তুমি আগে যাও। মুসা যাও এরপর।'

'কিন্তু তুমি…' বলতে গেল মুসা।

'আহ্, তর্ক কোরো না, যাও! সময় নেই!'

সুড়ঙ্গমুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে ওরা। এক সারি করে ফেলেছে। সবার আগে কিশোর, মাঝখানে মুসা, পেছনে রবিন। নেকড়েগুলোও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সাহস বেড়ে গেছে। বুঝে গেছে, ওদের শিকার পালিয়ে বাঁচতে চায়।

আচমকা ভয়ঙ্কর আরেক গর্জন করে উঠে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল সর্দার-নেকড়েটা। মুহূর্তে মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করে চলে এল একেবারে কাছে। আবার সরাসরি ওটার মুখে আলো ফেলল কিশোর। কিন্তু এবার চোখে আলো পড়া সত্ত্বেও আর শরীর পেছনে কুঁকড়ে ফেলল না নেকড়েটা। হাঁ করা মুখের মারাত্মক দাঁত আর লালা ঝরা জিভটার দিকে তাকিয়ে বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল কিশোরের। যে কোন মুহূর্তে এখন আক্রমণ করে বসবে।

'জলদি! একটা পাথর তুলে নাও!' বলল সে।

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা আর রবিন। বড় একটা পাথর চোখে পড়ল। তুলে নিল মুসা। নড়াচড়া দেখে নেকড়েটা বোধহয় ভাবল, শিকার পালাচ্ছে। কিংবা কি ভাবল সে-ই জানে, লাফ দিয়ে একেবারে দুই হাতের মধ্যে চলে এল। ছুঁড়ে না মেরে পাথর দিয়ে ধাঁ করে তার মাথায় বাড়ি মারল মুসা। বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল নেকড়েটা। ওঠার আগেই মাথাটা ছেঁচে ভর্তা করে দিল মুসা। কান দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করল নেকড়েটার।

সম্মিলিত চাপা গর্জন করে উঠল পুরো দলটা। নেতার পতন দেখে ভড়কে গেল। কিন্তু রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে ওগুলো। বেপরোয়া হয়ে উঠবে আরও।

'জলদি ঢোকো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

ঘুরে দৌড় মারল রবিন। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গিয়ে সরু সুড়ঙ্গটাতে। তার পেছনে মুসা। সবার শেষে কিশোর। তবে সে ওদের মত পেছন ফিরে দৌড় দিল না, নেকড়েগুলোর দিকে মুখ করে রেখে পিছিয়ে এসে ঢুকল।

ভূপাতিত নেতার কাছে এসে ওটাকে ঘিরে দাঁড়াল নেকড়েরা। নাক নিচু করে শুঁকছে আর প্রাণ-কাঁপানো হাঁক ছাড়ছে। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল তিনজনে।

হঠাৎ সামনে একটা চিৎকার শোনা গেল। দ্রুত মিলিয়ে গেল চিৎকারটা। রবিনের কণ্ঠ। তার পর পরই শোনা গেল মুসার চিৎকার। প্রায় একই ধরনের।

অদ্ভুত কাণ্ড!

কি ঘটল ওদের?

'রবিন! মুসা! তোমরা ঠিক আছ?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ওদের কাছ থেকে কোন জবাব আসার আগেই পেছনে আবার শোনা গেল নেকড়ের গর্জন। ফিরে তাকিয়ে দেখে, সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ছে নেকড়েগুলো। সাহস ফিরে পেয়েছে আবার। আক্রমণ করতে আসছে। নতুন নেতা দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে নিশ্চয় ইতিমধ্যে। আবার ঘুরে দাঁড়াতে হলো কিশোরকে। ওগুলোর মুখে আলো ফেলার জন্যে। ওই অবস্থায়ই পিছিয়ে যেতে লাগল যতটা দ্রুত পারল।

হঠাৎ কি যেন কি হলো, পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ওর।

পরক্ষণে সরু একটা গর্ত দিয়ে নিচে পড়তে শুরু করল। ধুপুস করে এসে পড়ল আলগা বালি আর মাটিতে বোঝাই মেঝেতে।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দম আটকে গেল ওর। হাত থেকে টর্চ ছাড়েনি। পতনের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আলো ফেলে দেখতে লাগল কোথায় পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একটু দূরে বসে বসে হাঁপাচ্ছে মুসা আর রবিন।

আলো জ্বালতে দেখে কিশোরকে বলল রবিন, 'দম নিতে পারছ এখন? আমার তো মনে হচ্ছিল জীবনে আর কোনদিন শ্বাস টানতে পারব না।'

'নেকড়েগুলোর কি খবর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এত নিচে আর মনে হয় আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না,' ওপর দিকে আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। খাড়া একটা চিমনির মত গর্ত। যত খিদেই থাকুক, ওপর থেকে খাড়া এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস হবে না কোন নেকড়ের।

মাটিতে পড়ে থাকা যার যার টর্চ তুলে নিল মুসা আর রবিন। কোথায় পড়েছে, ভালমত দেখতে শুরু করল। একটা গলিপথে পড়েছে মনে হলো ওদের, চলাচলের পথ। ওপরের যে সুড়ঙ্গটা থেকে পড়েছে, তার চেয়ে চওড়া।

'কিশোর, দেখো!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'কি?'

'গাছের খুঁটি! তক্তা!' রবিনের টর্চের আলোয় ফুটে উঠেছে অনেকগুলো খুঁটি আর তক্তা। বাড়ির ছাত ঢালাই করার মত করে ধরে রাখা হয়েছে সুড়ঙ্গের ছাত। এতকালে পুরানো, জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তক্তাগুলো, কিন্তু গাছের খুঁটি মোটামুটি আস্তই আছে সবগুলো। 'খনির সুড়ঙ্গ এটা!'

'ঠিক বলেছ!' উত্তেজনায় গলা কাঁপতে শুরু করল কিশোরের। 'এটাই নিশ্চয় ব্র্যাডি'স মাইন, যে খনিটার কথা বলেছিলেন আমাদেরকে উফার!'

'ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কোন্‌খান থেকে?' চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা। 'টের পাচ্ছ না? গালে লাগছে।'

ডানে চোখ পড়ল রবিনের। দশ গজ দূরে বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গটা। যার কারণে ওপাশটা দেখা যাচ্ছে না। 'ওদিক থেকে বাতাস আসছে। খনিতে ঢোকার প্রবেশ পথটা নিশ্চয় ওদিকে।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তারমানে নীল মাটিওয়ালা গুহার দেয়ালও ওদিকেই রয়েছে। এসো! দেখে আসি!'

সামনের দিকে টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে চলল ওরা। সুড়ঙ্গটা এতখানিই চওড়া, তিনজনের পাশাপাশি চলতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝেই

মাথা নিচু করে ফেলতে হচ্ছে আড়াআড়ি পোঁতা খুঁটি আর ছাত থেকে ঝুলে পড়া পাথরে বাড়ি লাগা থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে। উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকল ওদের, যখন গুহার দেয়ালে নীলচে-ধূসর মাটির স্তর চোখে পড়ল।

'ওই যে ওটা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

অনেকটা সামনে, টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে, সুড়ঙ্গটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গুহার মধ্যে। কি আছে দেখার জন্যে তর সইছে না আর ওদের। ছুটতে শুরু করল। গুহার মধ্যে ঢুকে দেয়ালের দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়াল রবিন।

গুহার দেয়ালে জায়গায় জায়গায় নীল মাটির শিরা!

'এটাই সেই জায়গা! এটাই! কোন সন্দেহ নেই আর!' চেঁচানো শুরু করল মুসা।

আলো ফেলে গুহাটার মধ্যে খুঁজতে শুরু করল ওরা। মরচে পড়া বেশ কিছু গাঁইতি, বেলচা ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। বহু, বহু বছর আগে কাজ করত যে সব খনি শ্রমিকরা, তারা ফেলে গেছে। গুহার মেঝের মাটি ভীষণ শক্ত। খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে মনে হলো, বহুদিন আগে মাটি খোঁড়া হয়েছিল এখানটায়।

'একটা বেলচা তুলে নিয়ে এসো! জলদি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি শিওর, এখানেই সোনাগুলো লুকিয়ে রেখে গেছেন উফার। এখনও আছে কিনা দেখা যাক।'

বেলচা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল ওরা। মাটি এখানে পাথুরে নয়, তারপরেও খোঁড়ার কাজটা সহজ হলো না। পালা করে একজন টর্চ ধরে থাকছে, বাকি দু'জন খুঁড়ছে। গাঁইতি দিয়ে কুপিয়ে প্রথমে আলগা করে নিচ্ছে মাটির স্তর, তারপর বেলচা দিয়ে খুঁচিয়ে তুলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘেমে নেয়ে গেল ওরা।

'বাপরে বাপ! কি কষ্ট! এ জন্যেই ডিনামাইট ব্যবহার করে ওরা!' গায়ের ভারী জ্যাকেটটা খুলে ফেলল মুসা।

শীঘ্রি কিশোর আর রবিনও জ্যাকেট খুলতে বাধ্য হলো।

ধীরে ধীরে মাটির নিচ থেকে ফুটে উঠতে লাগল হলদে-বাদামী রঙ। পাগলের মত মাটি সরাতে শুরু করল ওরা।

বেরিয়ে এল অবশেষে চারটে পেটমোটা বস্তা। আলো ধরে রেখেছে কিশোর। বস্তার এক কোনা ধরে টান মারল মুসা। ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল পুরানো চামড়া। লাফ দিয়ে বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়ল এক মুঠো সোনার মোহর। ঝকঝক করতে লাগল টর্চের আলোয়। এত বছর মাটির নিচে পড়ে থেকেও মলিন হয়নি রঙ। আরেকটা বস্তা থেকে বেরোল সোনার তাল।

হাঁটু গেড়ে বসে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে। পঁচিশ বছর আগে সোনাগুলো পাওয়ার মুহূর্তে কি অবস্থা হয়েছিল হ্যারিসনদের সহজেই কল্পনা করতে পারল। একেই বলে সোনার নেশা। সেই কোন প্রাচীন কাল থেকেই এই নেশায় ভুগে আসছে মানুষ। খুনখারাবি থেকে শুরু করে কত রকম অঘটন ঘটাচ্ছে।

'খবরটা শুনলে কি রকম করবে হ্যারিসন, সেটাই ভাবছি!' মুসা বলল।

'তা আর করার সুযোগ পাবে না ও কোনদিন!' ওদের পেছন থেকে বলে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

ঝট করে ঘুরে গেল তিন তিনটা টর্চ। দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশালদেহী মানুষ।

'উলফ ক্রুপার!' বিড়বিড় করল রবিন।

'হ্যাঁ,' কুৎসিত হাসি হেসে উঠল লোকটা। 'সোনাগুলো খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, এগুলো ভোগ করার জন্যে বেঁচে থাকছ না তোমরা।'

উনিশ

'আপনার উদ্দেশ্যটা কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি মনে হয় তোমার?' ভুরু নাচাল ক্রুপার। 'তোমাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়াটাই সব দিক থেকে ভাল নয় কি?'

'সে-চেষ্টা আগেও করেছেন। পারেননি।'

'তা পারিনি,' কঠিন হয়ে উঠল ক্রুপারের মুখ, 'কারণ, সে-সব সময়ে আমি সামনে ছিলাম না। কতগুলো গাধাকে দিয়ে চেষ্টা করিয়েছিলাম। এবার আমি নিজে সামনে এসেছি।'

শীতল দৃষ্টিতে দস্যুসর্দারের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'তার মানে?'

'মানে তো সহজ। সোনাগুলো নিয়ে যাব আমি। তোমরা কোনদিন বেঁচে ফিরতে পারবে না এ গুহা থেকে।' কোমরে ঝোলানো রিভলভারের খাপের দিকে হাত চলে গেল ক্রুপারের।

'আলো নেভাও!' বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। পটাপট নিভে গেল মুসা আর রবিনের টর্চ দুটোও।

উলফ ক্রুপার তার রিভলভার বের করার আগেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল গুহাটা। আলো নিভিয়েই এক গড়ান দিয়ে সরে গেছে কিশোর। গুলি করে যাতে ওকে জায়গামত না পায় ক্রুপার। হাতে তুলে নিল একটা বেলচা।

মুসা আর রবিনও নির্বোধ নয়। ওরাও সরে গেছে।

গর্জে উঠল ক্রুপারের রিভলভার। নল থেকে বেরোনো আলোর ঝিলিক লক্ষ্য করে বেলচা ছুঁড়ে মারল কিশোর। থ্যাপ করে একটা শব্দের পর পরই যন্ত্রণাকাতর চিৎকার। ক্রুপারের গায়ে লেগেছে বেলচাটা।

লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে গেল কিশোর। অন্ধকারেই চেপে ধরল ক্রুপারের রিভলভার ধরা হাত। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে ডাকল দুই সহকারীকে। মুচড়ে হাতটা পেছনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে।

মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল ক্রুপার। কিন্তু তিনজনের সঙ্গে একা সুবিধে করতে পারছে না। রিভলভার ধরা হাতটা শেষ পর্যন্ত ক্রুপারের পিঠের ওপর নিয়েই

ছাড়ল কিশোর। রবিন আটকে ফেলেছে তার অন্য হাতটা। মুসা বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। ওর হাতের চাপেই বেশি কাবু হলো ক্রুপার, কারণ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। অবশ হয়ে আসা আঙুলের ফাঁক থেকে খসে পড়ল রিভলভারটা। লাথি মেরে ওটা সরিয়ে দিল কিশোর।

রিভলভার পড়ে যাওয়াতে চাপ সামান্য ঢিল করল কিশোর। এবং ভুলটা করল। হাতের চাপ ঢিল হতেই ঝাড়া দিয়ে হাতটা মুক্ত করে ফেলল ক্রুপার। পেছন দিকে কনুই চালিয়ে দিল মুসার পেটে। গলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো মুসা। প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁসফাঁস করছে।

পাশে ঘুরে গলা ধরে ধাক্কা মেরে পেছনে ছুঁড়ে দিল রবিনকে। পাথুরে দেয়ালে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল রবিন। হুঁক শব্দ করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল।

গণ্ডারের জোর লোকটার দেহে। ষাঁড়ের মত গর্জন করে উঠল, 'এবার দেখাব মজা!'

ক্রুপারের বিরুদ্ধে একা আর কিছুই করে উঠতে পারল না কিশোর। মুখে ঘুষি খেয়ে পেছনে বাঁকা হয়ে গেল দেহটা। পায়ে পাথর বেধে উল্টে পড়ে গেল মেঝেতে।

এই সুযোগে রিভলভারটার জন্যে মাটি হাতড়াতে শুরু করল ক্রুপার। আঘাতটা সামলে নিয়েছে ততক্ষণে মুসা। সে-ও মাটি হাতড়াতে লাগল। আঙুল ঠেকল একটা বেলচার হাতলে। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ওটা নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ক্রুপারের মাটি হাতড়ানোর শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে বাড়ি মারল।

গলা ফাটিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল ক্রুপার। সময় দিল না মুসা। চিৎকার লক্ষ্য করে আবার মারল বাড়ি। এবার নিশ্চয় মাথায় লাগল। গাঁক্ করে একটা শব্দ বেরোল কেবল ক্রুপারের মুখ থেকে। ভারী দেহ কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো।

'গেছে মনে হচ্ছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'অ্যাই, তোমরা ঠিকঠাক আছ?'

'আছি,' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বেরোল রবিনের মুখ থেকে। কিশোরও সাড়া দিল। টর্চটা খুঁজে বের করল সে। মুহূর্ত পরেই আলো জ্বলে উঠল। মাটিতে পড়ে আছে ক্রুপার। দ্বিতীয় বাড়িটা মাথায় নয়, ওর ঘাড়ে লেগেছে।

মরে গেল নাকি! ভয় পেয়ে গেল মুসা।

না, মরেনি। নাড়ি ধরে বোঝা গেল। অজ্ঞান হয়েছে কেবল।

'দারুণ দেখালে, মুসা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ। দৈত্যটাকে বেঁধে ফেলা দরকার। জেগে উঠলে আর রক্ষা নেই।'

কোমর থেকে ক্রুপারের বেল্ট খুলে নিয়ে তার হাত বাঁধা হলো। রবিন আর কিশোরের বেল্টটা দিয়ে বাঁধা হলো পা। তারপর দু'দিক থেকে ধরে তাকে বয়ে নিয়ে চলল ওরা খনিমুখের দিকে। বাইরে এসে খানিক দূরে দেখা গেল ক্রুপারের ঘোড়াটা, একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ক্রুপারের রিভলভারটা রবিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'পাহারা

দাও। আমরা সোনাগুলো বের করে নিয়ে আসি।'

বস্তাগুলো বাইরে বের করে আনল মুসা আর কিশোর মিলে। তারপর নিজেদের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসতে গেল মুসা।

যেখানে বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেখানে পাওয়া গেল না ওগুলোকে। পাহাড়ের গোড়ায় বরফের মধ্যে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। নেকড়ের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে। ওগুলোকে আবার ধরতে বহুত কায়দা-কসরৎ করতে হলো ওকে। তুষারের মধ্যে ওগুলোর পা দেবে না গেলে ধরাটা আরও অনেক বেশি কঠিন হত।

ঘোড়াগুলোকে নিয়ে ফিরে এসে দেখে তখনও জ্ঞান ফেরেনি ক্রুপারের। তাকে তার ঘোড়ার ওপর তুলে দিয়েছে কিশোর আর রবিন মিলে। জিনের সঙ্গে বাঁধছে এখন। ঘোড়ার পিঠের একপাশে ঝুলছে তার মাথা আর হাত, অন্যপাশে পা।

'ওর স্যাড্‌ল্‌ব্যাগে দড়ি পেয়েছি,' কিশোর জানাল।

নিজেদের স্যাড্‌ল্‌ব্যাগে সোনাগুলো ভরে নিতে লাগল ওরা। তারপর নিজের ঘোড়ার সঙ্গে ক্রুপারের ঘোড়ার দড়িটা বাঁধল মুসা।

জ্ঞান ফেরার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল ক্রুপারের মাঝে। তার মুখে তুষার ঘষে দিতে শুরু করল কিশোর, যাতে হুঁশটা আরও তাড়াতাড়ি ফেরে। চোখ মেলেই ভয়ানক ভাবে গজরানো শুরু করল ডাকাতটা। হাতের বাঁধন খোলার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু বুঝল, বড় শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। আর যে ভাবে বেকায়দা ভঙ্গিতে ফেলে রাখা হয়েছে ওকে, কোনমতেই বাঁধন খোলা সম্ভব নয়।

গুহার সর্দার-নেকড়েটার চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার মুখ। অসহায় আক্রোশে ফুঁসে উঠে অভিশাপ দিতে শুরু করল, 'আমার যা দুরবস্থা হয়েছে, তার শতগুণ বেশি হোক তোমাদের! আমার কাছ থেকে সোনাগুলো ছিনিয়ে নিলে! পঁচিশ বছর আগেই আমার হাতে এসে যাওয়ার কথা ছিল ওগুলো।'

'যখন আপনি ব্ল্যাক পেপার ছিলেন, দলবল নিয়ে ডাকাতি করতেন, চারজন খনি শ্রমিকের কাছ থেকে সোনাগুলো ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, তখনকার কথা বলছেন তো?' কিশোর বলল।

'অ, সবই জানো দেখছি!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল ক্রুপার। 'অস্বীকার করব না, আমিই ছিলাম ব্ল্যাক পেপার। ওই ছুঁচো উফারটা যদি আমাকে না ঠকাত, তাহলে আর সোনাগুলো হাত ছাড়া হত না আমার।'

'আপনাকে ঠকিয়েছে!' অবাক হলো কিশোর।

'তা নয়তো কি? আমাকে পেতে দিল না, এটাই তো ঠকানো। চালাকি করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্লেন নিয়ে পালাল। প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে পিছুও নিতে পারিনি, খুঁজেও পাইনি আর পরে।'

উল্টো হয়ে ঝুলে থেকে তুষারে থুতু ফেলল ক্রুপার। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'আগে থেকেই লেগে ছিল, ওই ঘটনার পর মরিয়া হয়ে আমার পেছনে লাগল আইনের লোকগুলো। ওদের অত্যাচারে এই এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলাম। তবে সোনার কথা ভুলিনি আমি। বহু বছর পর একদিন আবার ফিরে এলাম এই এলাকায়

এসেই উফারের টাকার ট্রাক লুট করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, টাকা তো পেয়েইছি, সোনাগুলোও হাতিয়ে নিয়ে চিরকালের জন্যে চলে যাব এই এলাকা থেকে, কিন্তু…'

'এটাই তাহলে আপনার জরুরী কাজ–টাকাও চাই, সোনাও চাই!' ফোড়ন কাটল মুসা, 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট!'

'তোমাকে যদি কখনও ধরতে পারি আমি!' দাঁতে দাঁত চাপল ক্রুপার।

'থাক্ থাক্, ওর কথা বাদ দিন,' হাত নেড়ে হালকা সুরে বলল কিশোর। 'সোনাগুলো যে হাতিয়ে নিয়ে যাবেন ভাবলেন, এবারেও তো পেতেন না, উফারের কেবিনে আড়ি পেতে আমাদের কথাবার্তা যদি শুনে না ফেলতেন।'

'শুনে ফেলাতে সহজ হলো, নইলে কঠিন হত আর কি,' ক্রুপার বলল। 'তবে এবার আমি ওর মুখ থেকে কথা আদায় করেই ছাড়তাম। তক্কে তক্কেই ছিলাম। সে-রাতে কবরস্থানেই ধরতাম ওকে, কিন্তু তোমরা বাধালে গোল। কাল ওর পিছু নিয়ে গিয়েছিলাম ওর কেবিনে। কাবুও করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এই সময় তোমরা গিয়ে হাজির হলে। লুকিয়ে পড়লাম ছাউনিতে। ওর সঙ্গে কথা বলে তোমরা আমার কাজ সহজ করে দিলে।'

'কিন্তু লাভ হলো না কিছু!' আবার ফোড়ন কাটল মুসা।

জ্বলে উঠল ক্রুপারের চোখ। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'যত নষ্টের মূলই হলে তোমরা! প্রতিশোধ আমি নেব, তৈরি থেকো! যতদিন পরেই হোক!'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'আচ্ছা, একটা কৌতূহল পূরণ করবেন? আজ কি ভাবে খনিটা খুঁজে বের করলেন? ঝড়ের সময় কোথায় ছিলেন?'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, খোকা, আমি এই এলাকারই লোক। রাত কাটানোর জন্যে একটা গুহা খুঁজে বের করতে কি খুব অসুবিধে হওয়ার কথা আমার? সকালে বেরিয়ে তোমাদের ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। অনুসরণ করে এসে দেখি, নেকড়ের গুহায় ঢুকে পড়েছ তোমরা। ওটা দিয়ে আর ঢুকলাম না। খুঁজতে খুঁজতে বের করে ফেললাম খনির মুখটা।'

'হুঁ,' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'সবই শোনা হলো। চলো, রওনা হওয়া যাক।'

লাকি লোডের পথ অতি দুর্গম। তার ওপর রয়েছে ভারী সোনার বোঝা। তা ছাড়া সঙ্গী হয়েছে ভয়ানক বিপজ্জনক লোক উলফ ক্রুপার। তার দিক থেকে সামান্য সময়ের জন্যে চোখ সরালেও অঘটন ঘটিয়ে বসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলে এখানে বসে থাকলে তো আর বাড়ি ফেরা হবে না। রওনা হলো ওরা। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল ঘোড়ায় চেপে আরেকটা দল এদিকেই এগিয়ে আসছে। পিটার ক্লিনসন, উফার গ্রেট আর সঙ্গে এই এলাকার শেরিফকে দলবল সহ আসতে দেখে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওদের। আনন্দে দুলে উঠল মন।

ওদের দেখে তুষারের ওপর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারলেন ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন পিটার। দূর থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাই, কেমন আছ তোমরা সব?'

উলফ ক্রুপারের দায়িত্ব শেরিফের হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল তিন গোয়েন্দা। ওদের অভিযানের বর্ণনা কখনও বিস্মিত, কখনও আতঙ্কিত করল পিটারকে।

'সত্যি, গোয়েন্দা বটে তোমরা!' না বলে আর পারলেন না তিনি। 'আমরা তো তোমাদেরকে ফিরে পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছি, তুষার ঝড়ে পড়ে মারা গেছ। অথচ নিজেরা তো বহাল তবিয়তে আছই, সোনাগুলো উদ্ধার করেছ, ব্ল্যাক পেপারের মত ভয়ানক ডাকাতকে বন্দি করে নিয়ে এসেছ। সেই সঙ্গে উফার গ্রেটের উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্যটাও ভেদ করে ফেলেছ। কি কাণ্ড!' একটু থেমে বললেন, 'ওমর খুব খুশি হবে শুনলে।'

'ওমরভাই কেমন আছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আপনারাই বা এখানে এলেন কি করে?'

পিটার জানালেন, ওদের ফিরতে দেরি দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিল ওমর। ধরেই নিয়েছিল সাংঘাতিক কোন বিপদে পড়েছে তিন গোয়েন্দা। নিজে তো উঠতে পারছে না, তাই চাপাচাপি করে শেরিফকে খবর দিতে বাধ্য করেছে পিটারকে।

'শেরিফ এসে সমস্ত শুনে গিয়ে প্রথমেই চেপে ধরেছে অ্যাগনিকে,' পিটার জানালেন। 'চাপে পড়ে সব স্বীকার করেছে সে। লাকি লোডে উলফ ক্রুপারের চরগিরি করেছে সে। তার নির্দেশে রাতের বেলা কবরস্থানে তোমাদের খুন করতে চেয়েছে। তোমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত না পেরে রিভলভার হারিয়ে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে নিজের ঘরে। শোবার পোশাক পরে এসে দরজা খুলে দিয়ে তোমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে। অ্যাগনিকে উফারও সন্দেহ করেছিল। পিছু নিয়ে কবরস্থানে গিয়েছিল, ও সত্যি উলফের চর কিনা জানার জন্যে।'

'মনে করতে পেরেছেন তিনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' পিটার জানালেন। 'ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছে। বলেছে, সবটা না হলেও, অনেক কথাই মনে পড়ে যাবে উফারের। যেগুলো বিশেষ করে মনে দাগ কেটেছে তার।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'সোনাগুলো লুকানোর পর কিভাবে হেলেনায় গেলেন তিনি, ব্যবসা শুরু করলেন, জানার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে আমার। যাকগে, সময় হলেই সব জানতে পারব।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওমরভাই কেমন আছে, বললেন না তো।'

'ভালই, তবে ওঠার অবস্থা নেই। আসলে অত সহজে সারবে বলে মনে হচ্ছে না। হাসপাতালে নিতে হবে। ডাক্তার এসে দেখেটেখে নতুন করে ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে অবশ্য, যাতে ইনফেকশন হয়ে না যায়। তোমরা ফিরলেই তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।'

অনেক রাতে সেদিন লাকি লোডের আলো চোখে পড়ল ওদের। মাঝরাতে ঢুকল শহরে।

তিন গোয়েন্দাকে সুস্থ দেহে ফিরতে দেখে আনন্দে চোখে পানি এসে গেল ওমরের।

সব শোনার পর ওমর বলল, 'ও ভাল কথা, শিকাগো থেকে একটা ফোন পেয়েছি আমি। শিকাগো পুলিশ সেই ভুয়া ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ধরে ফেলেছে। তার দোস্তদেরও ধরেছে। উলফ ক্রুপারের লোকই ওরা। সব স্বীকার করেছে। তোমাদের যেদিন ধরে নিয়ে গেল, সেদিন বিকেলে ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল ওরা। তোমরা পালানোতে গেল সব কেঁচে। হ্যারিসনের আঁকা নকশাটা তার বস্ উলফ ক্রুপারের কাছে পাঠানোর সুযোগই হয়নি আরলিংসের।'

'হ্যারিসনের কথা যখন উঠলই,' মুসা বলল, 'ভাবছি, সোনা পাওয়ার খবর শুনে তার চেহারাটা কেমন হবে?'

হাসল রবিন, 'কাল সকালেই ফোন করে জানাব তাকে।'

'কিন্তু ফোনে তো আর চেহারা দেখতে পাব না!'

'তাহলে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও, চেহারাটা কেমন হয়েছে।'

***

ভলিউম ৪৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০